# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

( ১৯১৯—১৯৬১ )

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, এম.এ., এল.-এল.বি., ডি.ফিল্.

কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# ভূমিকা

ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের তৃতীয় পত্রে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' ( ১৯১৯ হইতে বর্তমান কাল ) পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পড়িবার কোন ব্যবস্থা এই পাঠ্যসূচীতে করা হয় নাই। বিভিন্ন দেশের বর্তমান যুগের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস না জানিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পড়িবার ব্যবস্থা কতটা সুযৌক্তিক হইয়াছে, তাহা আমার আলোচনা-বহির্ভূত।

যাহা হউক বর্তমানে স্নাতক পরীক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর করিয়া থাকে। সেজন্য এই পুস্তকখানি রচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে তাহাদের কাজে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তকখানির ক্ষেত্রেও আমার সম-কর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহানুভূতি পাইব ভরসা করি। পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। ইতি

কলিকাতা,
২১শে জুলাই, ১৯৬১

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

2140

# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

## ( ১৯১৯—১৯৬১ )

## সূচনা

## ( Introduction )

**আন্তর্জাতিকতা ( Internationalism ) ঃ** বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পৃথিবী—পৃথিবী কেন, সমগ্র সৌরজগৎটাই স্বল্প-পরিসর হইয়া গিয়াছে। মহাশূন্যে মানুষ আজ কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতি আজ মানুষের দাসানুদাসে পরিণত। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক্ দিয়া পরস্পর পরস্পর কর্তৃক প্রভাবিত। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য, সহযোগ ও সহৃদয়তার মাধ্যমে এক বৃহত্তর মানব-সভ্যতা গড়িয়া তোলাই যদি সভ্য জগতের আদর্শ হয় তাহা হইলে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী আজ সভ্যতার চরম আদর্শের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। সংঘর্ষ আর সমন্বয়ের পথেই অগ্রগতি সম্ভব। রুদ্ধ জলাশয়ে যেমন স্রোত নাই, জোয়ার-ভাটা খেলে না সংঘর্ষ-বিহীন মানব-ইতিহাসের ধারায়ও তেমনি কোন প্রবাহ বা অগ্রগতি থাকিবে না। ভাবজগৎ, বস্তুজগৎ, সর্বক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তথাপি সংশয় জাগে, মানব জাতি হয়ত বা এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিছক যুক্তিবাদের দিক্ দিয়া বা ভাববাদী কল্পনাপ্রবণদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে সর্বজাগতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নততম, শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ, বিবাদ-বিদ্বেষহীন

পৃথিবীর বিভিন্নাংশের পরস্পর নির্ভরশীলতা

সংঘর্ষ আর সমন্বয়—অগ্রগতির পন্থা

ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠী রচনা তথা 'ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী' গড়িয়া তোলাই আন্তর্জাতিকতার চরম আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে এই ভাববাদ বারবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আদর্শ তথা যুক্তিবাদীদের রচিত চিত্র বাস্তবের চিত্র অপেক্ষা ভিন্নরূপ, এজন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা নানা সংঘাত লাগিয়াই আছে। বাস্তবজগতে কল্পনাজগৎ ( Utopia ) রচনা হয়ত কোনদিনই সম্ভব হইবে না। তাই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কল্পনা ও বাস্তবের যথাসম্ভব কার্যকরী সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। যুক্তিবাদকে বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত করিয়া এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ইহাই হইল প্রকৃত পন্থা।

আদর্শ ও বাস্তব

আদর্শ ও বাস্তবের সামঞ্জস্য—আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

**ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিকতা ( Individual and Internationalism ):** কিছুকাল পূর্বাবধি আন্তর্জাতিকতা তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা যে-কোন সাধারণ মানুষের চিন্তা বা জিজ্ঞাসার বহির্ভূত ছিল। প্রতি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিবর্গ ছিলেন এবিষয়ের একমাত্র কর্ণধার। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাইবার বা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ছিল প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রীয় বিভাগের হস্তে, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে উহা চালাইয়া যাইবার দায়িত্ব দেশের ব্যক্তিমাত্রকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহন করিতে হইত। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ভাবিবার বা সমাধানের উপায় চিন্তা করিবার একমাত্র অধিকার ছিল পেশাদারী কূটনৈতিকগণের ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের, কিন্তু বর্তমান জগতে এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ একজন সাধারণ মানুষও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক সমস্যার জটিলতা বা ফলাফল তাহার দৈনন্দিন জীবনের গতিকেও নানাভাবে প্রভাবিত ও ব্যাহত করিতে পারে। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতীয়

পররাষ্ট্র বিভাগ ও কূটনীতিকগণের দায়িত্বের ধারণার পরিবর্তন

আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক

জনসাধারণকে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির কুফল ভোগ করিতে হইয়াছে। আণবিক বোমার সর্বনাশাত্মক ফলাফলের ভীতি পৃথিবীর সকল অংশের লোককেই ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি, ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা জগৎবাসীর ঘৃণা ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতেছে। ইংলণ্ড কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ পৃথিবীর জনসাধারণের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজনৈতিক ভিন্ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব পৃথিবীব্যাপী প্রতিফলিত হইতেছে। ব্যক্তি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড বা ভারত—যে-কোন দেশেরই হউক না কেন, আজ সে স্পষ্টভাবেই হউক আর অস্পষ্টভাবেই হউক, একথা জানে যে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার পতন, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন, ইন্দোচীনে কমিউনিজমের জয়, কমিউনিস্ট চীন ও ভারতের সৌহার্দ্য নাশ প্রভৃতি তাহার নিজস্ব এবং নিজের পারিবারিক জীবন, শান্তি, সমৃদ্ধি সব কিছুকেই প্রভাবিত করিতে সমর্থ। আজ পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার, সংবাদপত্র, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে সংবাদ বিতরণ ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে জনসাধারণের মূকত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে সবাক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান ব্যাপারে ব্যক্তি আজ আর অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর স্বার্থ, সমৃদ্ধি, ধনপ্রাণের নিরাপত্তা যে-সকল কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে সেগুলির যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিমাত্রেই আজ অল্প-বিস্তর সচেতন। এই সচেতনতার উপরই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের জনকল্যাণমূলক সমাধান নির্ভরশীল।

ব্যক্তি অসহায় দর্শক নহে—সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব

**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations)ঃ** বাঁধা-ধরা সংজ্ঞা দ্বারা কোন শাস্ত্রেরই প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বলিতে যে কি বুঝায় তাহাও কোন সংজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝাইয়া বলা সহজসাধ্য নহে। তবে মোটামুটি এবং কতকটা ব্যাপক অর্থে জাতীয় স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহার পদ্ধতিকে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বলা যাইতে পারে। জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতির

সংজ্ঞা

বাহ্যিক প্রতিফলনই হইল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। এইরূপ স্বার্থ বা আদর্শ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার কার্যকলাপই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কার্যকলাপ তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আবার শক্তি (Power), আদর্শ (Ideology) প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে।

শক্তি দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণীত হইয়া থাকে এই মতবাদে যাহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে শক্তি ব্যক্তি, জাতি, বিভিন্ন ধরণের সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। মধ্য-যুগের ইওরোপীয় ইতিহাসে পোপ ও সম্রাটের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য, হিটলার-মুসোলিনির একক অধিনায়কত্ব প্রভৃতি ব্যক্তিগত শক্তির প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান জাতির মধ্যে যে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহাকে জাতীয় শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। খনিজ তৈল, কয়লা, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় সমর্থন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, দৈহিক শক্তি যথা গোলা-বারুদ ও নানাপ্রকার মারণাস্ত্রের প্রাচুর্য হেতু অর্থাৎ এই ধরণের শক্তি অর্জনের ফলে অপরাপর অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তিবর্গের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়া যে ক্ষমতা অর্জন করা হয় তাহাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'শক্তি' (Power)-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা হইল দৈহিক শক্তির (Force) উপর নির্ভরশীল প্রাধান্য। আবার অপরাপর দেশের এবং নিজের দেশের জন-সমাজকে কোন নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী চলিতে বা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারিলে যে ক্ষমতা অর্জন করা যায় তাহাও 'শক্তির' (Power) পর্যায়ভুক্ত। নানাপ্রকার কূটচালে অপরাপর রাষ্ট্রের কার্যকলাপ অর্থাৎ পররাষ্ট্রীয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা অর্জন করা যাইতে পারে তাহাও এক ধরণের শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির (Power) প্রকাশ যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা যুদ্ধের ভীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।*

শক্তি
(Power)

* Vide Friedmann: *An Introduction to World Politics*, chapter I.

কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি বা ক্ষমতার দিক দিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বিবাদ-বিসংবাদ বিশ্লেষণ করা যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শক্তি এবং আদর্শ এই দুইয়ের সংমিশ্রণের ফলে ঘটিয়া থাকে।* বস্তুত, শক্তি হইল রাষ্ট্রের আদর্শকে কার্যকরী করিবার উপায় মাত্র। এই উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রমাত্রেই নিজ নিজ আদর্শ কার্যকরী করিয়া থাকে। মধ্যযুগের ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধের আদর্শ ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য স্থাপন ও যীশুখ্রীষ্টের কবর মুসলমানদের অধিকার হইতে জয় করিয়া লওয়া। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক প্রাধান্য স্থাপন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইওরোপে প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন, নিজ নিজ রাজবংশের একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন প্রভৃতি যুদ্ধের আদর্শস্বরূপ ছিল। ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের দ্বন্দ্ব আদর্শগত দ্বন্দ্বেরই উদাহরণ মাত্র। শ্রেণীবৈষম্যহীন এক সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন হইল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আদর্শ। এই আদর্শ সিদ্ধির জন্য আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সব কিছুই অনুসরণীয়। সাম্যবাদী আদর্শের পাশাপাশি পাশ্চাত্ত্য দেশীয় গণতন্ত্রভিত্তিক ধনতান্ত্রিকতা বা উদার ধনতন্ত্র (Liberal Capitalism) এবং প্রাচ্যাঞ্চলের গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) আধুনিক জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আদর্শেরই প্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির নাৎসিবাদ ও ইতালির ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি একক প্রাধান্যের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতনের পর হইতে আধুনিক জগতের আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের তথা সমস্যার অন্যতম প্রধান-ই হইল গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব। এই আদর্শগত বিভেদ সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; স্বভাবতই শক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে পৃথিবীর বর্তমান

আদর্শ (Ideology)

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব

আধুনিক কালের সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব—গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের দ্বন্দ্ব

* "Most international conflicts show a mixture of power politics and ideological factors." *Idem.*

আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে 'আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব মাত্রেই শক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে উদ্ভূত'—ফ্রিড্ম্যান্ (Friedmann)-এর এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের পশ্চাতে ভাল বা মন্দ, নৈতিক বা অনৈতিক—কোন-না-কোন প্রকার উদ্দেশ্য তথা আদর্শ থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সকল উদ্দেশ্য বা আদর্শ রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পূর্বেকার আদর্শ বর্তমানে স্বার্থপর, নৈতিকতা বর্জিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের যে বিবর্তন তাহাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের নূতন নূতন আদর্শ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ চলিবেই। মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত না হইলে এই ধরণের বিবাদ-বিসংবাদের অবসান আশা করা দুরাশা মাত্র। আর যতদিন এই সমস্যা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন আদর্শ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োগ থাকিবে এবং শক্তির প্রয়োগে নৈতিকতা গৌণ স্থান অধিকার করিবে। বাস্তব জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানসিক ক্ষমতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিছক আদর্শবাদকে কতকটা বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়া পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার মধ্যেই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের উপায় নিহিত আছে। অপরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নিজ আদর্শকে বলপূর্বক অপরের উপর চাপাইবার মনোবৃত্তি দূরীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটান সম্ভব।

উপসংহার

**বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার স্বরূপ ( Nature of the present International Problems ) :** সভ্যতার আদিকাল হইতেই যুদ্ধ মানুষের সর্বাধিক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন যুগের নীতিবাদীরা যুদ্ধকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পাপাত্মক কার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কূটনীতিকেরা যুদ্ধ সর্বনাশাত্মক একথা স্বীকার করিলেও স্বাধীনতা, জাতীয় সম্মান, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র পন্থা বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। দেশপ্রেমিকগণ যুদ্ধ দেশপ্রেম প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করিয়াছেন, কবি আদর্শ বা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাকে মনুষ্যত্বব্যঞ্জক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

জনসাধারণের কোন কোন অংশ যুদ্ধকালীন সহজলভ্য চাকরি, মুনাফা প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা ভোগের উপায় হিসাবে যুদ্ধকে সমর্থন করিয়াছে। সৈনিকগণের নিকট যুদ্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তেজনাপূর্ণ আকর্ষণ বলিয়া মনে হইলেও প্রধানত তাহাদের নিকটই যুদ্ধের বীভৎসতা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধজয়ের আনন্দলাভের মনোবৃত্তি যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ নর-নারীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ-সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও যুদ্ধের ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সকলেই উহা পরিত্যাজ্য বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। যুদ্ধ অনুচিত জানিয়া বা উপলব্ধি করিয়াও যুদ্ধনীতি সমর্থন করিবার উপরি-উক্ত বিভিন্ন যুক্তি রহিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ সভ্য জগতের সর্বাধিক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গিয়া সামরিক শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতিই যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখিবার একমাত্র পন্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সামরিক শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখিয়া অর্থাৎ position of strength হইতে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা যায়। আদর্শবাদীরা অবশ্য যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধরোধ করিবার নীতির পক্ষপাতী নহেন। বিশ্বরাষ্ট্র অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং মানুষমাত্রকেই সম-অধিকারে স্থাপন করিলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সমস্যার সমাধান হইবে একথা আদর্শবাদীরা মনে করেন। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর, আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ (United Nations) ইহারই এক অতি দুর্বল পদক্ষেপ। এই আদর্শের সহিত বাস্তব জগতের পার্থক্য অনেক, এজন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান এবং মৌলিক সমস্যাই হইল যুদ্ধরোধের সমস্যা।*

বর্তমান জগতের সর্বপ্রধান ও মৌলিক আন্তর্জাতিক সমস্যা—যুদ্ধরোধ করিবার সমস্যা

যুদ্ধরোধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ

বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ

* Vide G. Hardy: *A short History of the International Affairs*, p. 1.

বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম রূপ হইল আদর্শগত দ্বন্দ্ব—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের তথা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব প্রধানত পাশ্চাত্ত্য দেশীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথা, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি এবং সাম্যবাদী রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে। বস্তুত, পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ আজ দুইটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর সামরিক মারণাস্ত্রের ধ্বংসকারী ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অনুগত মিত্রশক্তি লাভ প্রভৃতি অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় রূপ লাভ করিয়াছে।

আদর্শগত সমস্যা—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র

ইদানীং উপরি-উক্ত আদর্শগত দ্বন্দ্ব-প্রসূত পরস্পর-বিদ্বেষী দুইটি দল ভিন্ন নিরপেক্ষ দল (uncommitted nations) নামে অপর একটি দলের উদ্ভব হইয়াছে। বিবদমান দল দুইটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ও সেগুলির মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা এই তৃতীয় দলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরস্পর-বিরোধী শিবিরে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অপর সমস্যা হইল জাতিগত প্রাধান্য ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের অবসান ঘটাইয়া মানুষ ও জাতিমাত্রেরই সম-অধিকার স্থাপন করা। শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কৃত্রিম ধারণা দূর করা এবং কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহাদের এক পর্যায়ে স্থাপন করাও বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম আদর্শ হিসাবে বিবেচ্য।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের সমতার সমস্যা

আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের অন্যতম প্রধান হইল পরস্পর-বিদ্বেষ প্রসূত যুদ্ধাত্মক পরিস্থিতি ও প্রভাবের চাপ (war tensions) হইতে পৃথিবীকে মুক্ত রাখা। কূটনৈতিক কার্যনীতিতে এই ধরণের চাপ বা tension বজায় রাখিয়া জাতিকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত রাখিবার ব্যবস্থা স্বীকৃত বটে, কিন্তু জাগতিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা এক অতি কৃত্রিম অবস্থা সন্দেহ নাই। এইরূপ পরিস্থিতি ও প্রভাবের কল্পনা যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিবে, বলা বাহুল্য। যুদ্ধের সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হইলে যুদ্ধের করাল ছায়া হইতে পৃথিবী মুক্ত হইতে পারিবে না। এজন্য স্থায়ী শান্তি স্থাপনের একমাত্র পন্থা হইল

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আধুনিক বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম প্রধান জটিল সমস্যা একথা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য, আদর্শগত পার্থক্য, জাতিগত বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া লইয়া জগতের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নয়নের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান হয়ত সম্ভব হইতে পারে, অন্যথায় নহে।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ( World after the First World War ):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—'১৮) আন্তর্জাতিক ইতিহাস তথা মানব-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বস্তুত, ইহাই ছিল সর্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রতি পাঁচজনের একজন যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল আর আহত হইয়াছিল প্রতি তিনজনের একজন। যুদ্ধাহতদের মোট সত্তর লক্ষ লোক চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত সংখ্যক লোক যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক প্রাণ হারাইয়াছিল একমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এই হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল মিত্রপক্ষের—অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি জার্মানি-বিরোধী দেশগুলির। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ও হতাহতের স্থান পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বৃত্তি গ্রহণের নীতি চালু করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে বহু উদীয়মান বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি উইলফ্রিড আওয়েন ও রবার্ট ব্রুকের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বেসামরিক জনসাধারণও এই যুদ্ধের সরাসরি কুফল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিমান আক্রমণ, খাদ্যাভাব, মহামারী প্রভৃতির ফলে বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে মোট হতাহতের সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের মোট সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কোন কোন দেশে—যেমন ফ্রান্সে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সুস্থ, সবল পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস পাইয়াছিল যে, পরবর্তী যুগে সেই সকল দেশের জনসংখ্যা

যুগান্তকারী ঘটনা

বিশাল হতাহতের সংখ্যা

বেসামরিক জনসংখ্যার প্রাণনাশ

বৃদ্ধির হার অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। মোট ব্যয়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশালতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে মোট ব্যয় হইয়াছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। মানুষের প্রাণনাশে কি পরিমাণ সামগ্রী ও সম্পত্তি ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ের বিরাট অঙ্ক দৃষ্টে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War)। জাতীয় শিল্প, জাতীয় সম্পত্তি সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইবার ফলে উহা পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

মোট ব্যয়ের পরিমাণ

সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (First Total War)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বরাজনীতির এক আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ইওরোপীয় রাজনীতি-ই আন্তর্জাতিক যথা বিশ্বরাজনীতি বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিল। এই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে 'লীগ অব্ ন্যাশনস্' (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইল। ইহার পূর্বেও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত ছিল। 'কন্‌সার্ট অব্‌ ইওরোপ' (Concert of Europe)-এর দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু লীগ অব্‌ ন্যাশনস্-এর অভিনবত্ব ছিল এই যে, ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিগণকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না।

ইওরোপীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রূপান্তরিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংকীর্ণ এবং স্বার্থপর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মানির পরাজয় গণতন্ত্রের সাফল্যেরই নির্দেশক, সন্দেহ নাই। গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রধানত গণতান্ত্রিক দেশ ও জাতিসমূহের জয়লাভহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির চরম বিজয়-

সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়লাভে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রের মৃত্যুর পূর্ব-ছায়া পতিত হইয়াছিল।* বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির সাফল্যের পর-ই গণতন্ত্রের স্থলে সমাজতন্ত্রবাদ এবং ক্রমে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি একনায়কত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা যতই অদ্ভুত, স্বয়ং-বিরোধী বলিয়া মনে হউক না কেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গণতন্ত্র ও উদারনীতির চরম জয় এবং পতনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। মধ্যাহ্নের পরই অস্ত শুরু হয়, গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির মধ্যাহ্ন যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভে পরিলক্ষিত হয়, তেমনই উহার পরবর্তী অবস্থাই হইল গণতন্ত্রের অস্তকাল। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এই একই নীতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে ফরাসী বিপ্লবের অবদান উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ উপেক্ষা করিয়া প্রতিক্রিয়ার চরম বিজয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়া জয়লাভ করিলেও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা উনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্টাংশে এই প্রতিক্রিয়াকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অনুরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে স্বৈরতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল উহা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তিচুক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিহত হইলেও এবং গণতন্ত্র তথা উদারনীতির

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—সমাজতন্ত্রবাদ, নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান

ইতিহাসের নজির

* "To all appearance, the peace settlement of 1920 marked the decisive victory of those liberal principles which had dominated the preceding epoch. Yet in fact, as was soon to be demonstrated, liberalism was on its deathbed. ...There was a large transfer of allegiance to Socialism; alternatively or simultaneously there was a widespread repudiation of democracy. But Liberalism, the force which had won the war and made the peace, was completely out of fashion." Hardy: *A short History of the International Affairs*, p. 4.

জয়লাভ ঘটিয়াছে মনে হইলেও ইহার অল্পকাল পরেই পুনরায় যুদ্ধের পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী ধারা ইওরোপে প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি হইতে শেষ পর্যন্ত একথাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন জাতিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করিয়া তোলা সম্ভব নহে। জার্মানিকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছা মিত্রপক্ষের যত বেশিই থাকুক না কেন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি জার্মানবাসীর শ্রদ্ধা টলান সম্ভব হয় নাই।†

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কারণ সম্পর্কে মতানৈক্য

বিজয়ের মুহূর্তে গণতন্ত্রের এইরূপ অপমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে লেখকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। E. H. Carr-এর মতে বড় বড় যুদ্ধ মাত্রই কতকটা বিপ্লবাত্মক। সেগুলি পূর্বতন জরাগ্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করিয়া থাকে। ক্রমে বিশ্বযুদ্ধের ফলেও পূর্বতন জরাগ্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নূতন ব্যবস্থার সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু Gathorne Hardy ও Sir Norman Angell-এর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে উদারনীতির উপর গঠিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল একথা বলা চলে না। গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর কারণ হইল এই যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিতে গিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা, পর-মত-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে—যুদ্ধজয়ের সুবিধার জন্য—সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তোলা হইয়াছিল। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিগত মূল্যায়নের যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল উহার অনভিপ্রেত ফল হিসাবেই একক অধিনায়কত্ব ( Dictatorship ) ও দলগত একক অধিনায়কত্ব ( Party Dictatorship )

* *Ibid.* p. 4.

† "It became apparent soon after the conclusion of the peace settlement that democracy could not successfully be imposed merely by threats······Germany as events showed could not be converted from an autocratic monarchy into a well functioning democratic republic simply by the desire of the Allies to make it so." Langsam : *The World Since 1919*, p. 34.

প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, উপসংহারে একথা বলা চলে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে গণতন্ত্রের পতনের সূচনা হইয়াছিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপরাপর উল্লেখযোগ্য ফলাফল হইল নিম্নলিখিত রূপের :

(১) এই যুদ্ধ ইওরোপের চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া ইওরোপে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত চারিটি সাম্রাজ্য ছিল—জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও তুরস্ক। প্রথম যুদ্ধাবসানের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপ-মহাদেশে মোট ১৮টি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থাও যে দেখা দিয়াছিল উহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অংশ-গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবার ফলে এবং জাতি মাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের ( self-determination ) অধিকার থাকা চাই—এই নীতির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে জটিল আকার ধারণ করিল।

জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও তুরস্ক—চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অবসান—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির জটিলতা বৃদ্ধি

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিচুক্তির মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। ফলে এই সকল নীতি পরাধীন দেশমাত্রেই ক্রমশ, বিস্তারলাভ করিলে সেই সকল দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। মিশর, ভারত, কোরিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্নাঞ্চলে এই ধরণের আন্দোলন শুরু হয়।

পরাধীন দেশমাত্রেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা

---

* Gathorne Hardy : pp. 4-5, Carr : *Conditions of Peace*, p. 3 ; Sir Norman Angell, *Preface to Peace* p. 56.

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পৃথিবীর জনসাধারণ একথা স্বভাবতই মনে করিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে হয়ত আর যুদ্ধ ঘটিবে না। লীগ অব্ ন্যাশন্স্-এর প্রতিষ্ঠায় তাহাদের সেই আশা ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে যে সকল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেগুলি নূতন নূতন ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে। করভারে জর্জরিত জনসাধারণের চির-শান্তির আশা ধূলিসাৎ হয়। ইহা ভিন্ন, লীগ অব্ ন্যাশন্স্ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পশ্চাতে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের কার্যকরী সমর্থনের অভাব পৃথিবীর জনসাধারণের মনে হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক চির-শান্তি সম্পর্কে জন-সাধারণের আশাভঙ্গ

(৪) যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য দেশের উৎপাদন ক্ষমতা স্বভাবতই বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রতি দেশেরই শ্রমিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাধিক মাত্রায় অবহেলিত হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর-কালে পৃথিবীর—বিশেষত ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে এই ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছিল যে, দেশের যুবক সম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে হয়ত বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় সর্বনাশাত্মক যুদ্ধের অবসান ঘটান সম্ভব হইবে। ফলে, যুব-সম্প্রদায় ও শিশু-শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র যুবসম্প্রদায় রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠে। জার্মানি, ইতালি, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুব-আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যুদ্ধ-নিরোধের উপায় হিসাবে প্রায় সকল দেশের যুবসম্প্রদায়কেই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়।

শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ : যুব-আন্দোলন

যুদ্ধ-নিরোধের উপায় হিসাবে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা

(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে সমবায়ের ( co-operation ) গুরুত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ যে শিক্ষালাভ করিয়াছিল তাহা যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন দেশের বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছিল।

সমবায় (Co-operation) ব্যবস্থার গুরুত্ব

(৭) যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে যে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুদ্ধকালে করা হইয়াছিল সেগুলিকে শিল্পোন্নয়ন, চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত, পরিবহন প্রভৃতিতে খাটাইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে বহু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—উহার সুফল

(৮) সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাধিক সচ্ছল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল। এই যুদ্ধের পর হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে থাকে। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ক্রমেই বিশ্বরাজনীতিতে আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন এবং লীগ অব ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য পদ-লাভের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব ক্রমেই অনুভূত হইতে থাকে। প্রাচ্যাঞ্চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের সাম্রাজ্য-বাদী স্পৃহা ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি : ল্যাটিন আমেরিকার অস্তিত্ব অনুভূত

অর্থনৈতিকক্ষেত্রে

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এক নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবী ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সহিত যুদ্ধোত্তর নূতন পৃথিবীর নানা বিষয়েই পার্থক্য ছিল।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর তুলনামূলক আলোচনা ( Comparison between the Pre-War World with the Post-War World ):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন

পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই জাতীয়তাবাদ, শিল্পোন্নতি, ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় ও শক্তি-সাম্য এই কয়টি মূলনীতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মেটারনিক্ ব্যবস্থা (Metternich System) সাময়িক কালের জন্য জাতীয়তাবাদকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিতে সমর্থ হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদের সাফল্য শুরু হয়। ইতালির জাতীয় ঐক্য, জার্মানির জাতীয় ঐক্য, বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী অগ্রগতি এই সাফল্যের উদাহরণস্বরূপ। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প-শ্রমিক (Industrial proletariat) সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ঘটাইয়াছিল এবং শ্রমিক কল্যাণ আইন-কানুনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া ও ইতালি, ইওরোপ তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মন্‌রো-নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ ঔপনিবেশিক ও নৌ-শক্তি ব্রিটেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বভাবতই ব্রিটেন অংশ গ্রহণ না করিলে কোন যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধ নামে অভিহিত হইবার দাবি করিতে পারিত না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বাবধি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কতকটা এইরূপই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি এইরূপ থাকিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তি-সমূহের প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। প্রাচ্যাঞ্চলে জাপানের অভ্যুত্থান, আমেরিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ-ভুক্ত অংশসমূহে আত্মনির্ভরশীলতা ও জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি আপাতদৃষ্টির অন্তরালে পৃথিবীর রাজনীতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। যাহা হউক, এই পরিবর্তন চলিতে থাকিলেও বিশ্বরাজনীতি বলিতে তখনও

জাতীয়তাবাদ

শিল্পোন্নতি

রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রধান শক্তিসমূহ

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান

ইওরোপীয় রাজনীতিকেই বুঝাইত। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ—এক কথায় ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়-ই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ কিছুকাল অন্তর অন্তর সম্মেলনে সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান তথা যুদ্ধ হইতে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মূলত, এই সকল রাষ্ট্রের স্বার্থে যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকা স্থিরীকৃত হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় থাকিলেও ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে উহা দ্বারা সাতটি ইওরোপীয় যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল।* যাহা হউক, এই ব্যবস্থাও আবার পরস্পর সন্দেহ-বিদ্বেষ হইতে মুক্ত ছিল না। কারণ, যখনই কোন একটি রাষ্ট্র ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ব্যাহত করিতে উদ্যত হইত তখনই অপরাপর শক্তিবর্গ যুগ্মভাবে অত্যধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দমন করিতে অগ্রসর হইত। এই শক্তি-সাম্য বা Balance of Power হইতে সন্দেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতির সৃষ্টি হইলেও একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থা দ্বারা শান্তি রক্ষা সম্ভব ছিল। Gathorne Hardy-র মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই শক্তি-সাম্য নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছিল।† বিস্‌মার্কের অধীনে জার্মানির একে একে তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ শক্তি-সাম্য নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, অথচ তদানীন্তন ইওরোপীয় শক্তিসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অন্তর্মুখী থাকিয়া পরবর্তী যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।††

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের সাময়িক সম্মেলন

শক্তি-সাম্য নীতি—উহার দোষগুণ

শক্তি-সাম্য নীতি পরিত্যক্ত—জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপরিহার্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবীকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

---

* Vide : Mowat : *The European State System*, p. 80. Also Gathorne Hardy : *A short History of International Affairs*, p. 10.

† Gathorne Hardy, p. 11.

†† "What the First World War discredits is not the Balance of Power, but short-sightedness of isolationism." *Ibid*, p.10.

শিল্পোন্নতি—অর্থনৈতিকক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

প্রথমত, শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি পৃথিবীর বিভিন্নাংশকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল করিয়া পৃথিবীকে ক্ষুদ্র-পরিসর করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় মহাদেশের বাহিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উত্থানে ইওরোপ-মহাদেশের রাজনৈতিক তথা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব ক্ষমতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থানের ফলে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে পূর্বেকার রাষ্ট্রবর্গের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি স্বভাবতই কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে সকল ইওরোপীয় রাষ্ট্র ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির—যেমন জার্মান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্য—পতনের ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইওরোপের মানচিত্রে যুদ্ধোত্তর যুগে নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের নামাঙ্কিত হইয়াছিল। একমাত্র পূর্ব-ইওরোপে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বুল্‌গেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস—এই সাতটি রাষ্ট্রের স্থলে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আল্‌বানিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস—এই চৌদ্দটি রাষ্ট্রের নাম যুদ্ধোত্তর যুগের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।* ইওরোপীয় মহাদেশ ও ইওরোপীয় কন্‌সার্ট-এর প্রতিপত্তির অবসান ঘটিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সর্বজাগতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই স্বীকৃত হয়। পূর্বেকার পাঁচ অথবা ছয়টি ইওরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের স্থলে এখন উহার দশগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের উপর সেই ক্ষমতা ন্যস্ত হয়।

ইওরোপীয় মহাদেশ ও শক্তিবর্গের প্রাধান্য হ্রাস

নূতন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

সর্বজাগতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা

---

* Gathorne Hardy, p. 13, p. 13 *fn.*

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ
যুদ্ধের পূর্বে জার্মানির সীমারেখা
নূতন সীমারেখা
জার্মানি কর্তৃক হস্তান্তরিত স্থান
গণভোট সাপেক্ষ অঞ্চল
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
এস্তোনিয়া
লাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
রা শি য়া
গ্রেট ব্রিটেন
ডেনমার্ক
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
জা র্মা নি
পোল্যাণ্ড
ফ্রা ন্স
চেকোস্লোভাকিয়া
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
সুইটজারল্যাণ্ড
যুগোস্লাভিয়া
ইতালি
আলবেনিয়া
বুলগেরিয়া
গ্রীস
কৃষ্ণসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
পোর্টুগাল
স্পেন
সিসিলি
আ ফ্রি কা

তৃতীয়ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন্‌-এর সনির্বন্ধতায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণের ফলে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র এবং জাতি আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব্-ন্যাশ্‌ন্‌স্‌-এ যেমন স্থান পাইয়াছিল, তেমনি এই গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিশেষভাবে পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের অদম্য প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার (Internationalism and Nationalism) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়।*

গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তাবাদ

নূতন সমস্যা

চতুর্থত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের মনে এক নূতন মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহাদি একপ্রকার জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ এবং চরম পন্থা হিসাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা বলিয়াই বিবেচিত হইত। কন্‌সার্ট-অব্-ইওরোপ প্রভৃতি ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ লইয়া গঠিত ছিল এবং এই সকল রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরেই কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়াছিল। যুদ্ধ করা-না-করার মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয়, জগতের শান্তি বা জগৎবাসীর নিরাপত্তা তাহাদের নিকট ছিল অবান্তর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা এবং অভাবনীয় লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় যুদ্ধের প্রতি ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের ও জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভীতির ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি 'যুদ্ধের জনপ্রিয়তা'

* "Simultaneously with the adoption of this world-wide democratic Internationalism, the war, with the deliberate encouragement of the American President, had resulted in the complete and apparently final triumph of nationalism. The problem was to harmonize these two inconsistent principles." *Ibid*, p. 14.

ফলে যুদ্ধের সর্বনাশাত্মক ক্ষমতা সহস্রগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে সকলের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আমরা দেখিতে পাই লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রতিষ্ঠায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তের উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর সন্ধির সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্স্ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট্ উইল্সনের যে চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া উহা গঠিত হইয়াছিল সেগুলিতে আন্তর্জাতিক 'শান্তি' ( peace ) কথাটির কোনও উল্লেখ ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার ফলে যুদ্ধের প্রতি পরিবর্তিত মনোভাব : লীগ-অব-ন্যাশন্স-এর প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষা করাই ছিল এই শর্তাবলীর প্রধান এবং মূল উদ্দেশ্য। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেসিডেন্ট উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তের উপর নির্ভরশীল লীগ-অব-ন্যাশন্স্ জাতীয়তার উপরই অধিকতর জোর দিয়াছিল। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার যাবতীয় চেষ্টার স্থলে রাষ্ট্রবর্গ পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতি রাষ্ট্রের রাজ্যসীমা ও সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা বিধান করিবে এই ব্যবস্থা করিয়া আন্তর্জাতিকতার স্থলে জাতীয়তার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। তদুপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র ( Covenant ) প্রত্যাখ্যান করার ফলে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক রূপ কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল।

জাতীয়তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে আন্তর্জাতিকতা ব্যাহত

সর্বশেষে লীগ-অব-ন্যাশন্স্ সম্পর্কে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, উহার প্রকৃত ক্ষমতা কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের হস্তে সীমাবদ্ধ থাকিবার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর গুরুত্ব স্বভাবতই হ্রাস পাইয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ লীগ-অব-ন্যাশন্স্কে 'কন্সার্ট-অব-ইওরোপ'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের চুক্তিপত্র প্রত্যাখ্যানের ফলে লীগ-অব-ন্যাশন্স-এর আন্তর্জাতিক রূপ ব্যাহত

(Concert of Europe)-এরই এক নূতন সংস্করণে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তথাপি লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব যে জাগিয়াছিল তাহার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই, এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত প্রতীকে পরিণত হইবার আশা যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উপসংহার : গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

---

# প্রথম অধ্যায়

## প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন : শান্তি-চুক্তি

## (Paris Peace Conference : Peace Settlement)

**শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for the Peace) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে মিত্রশক্তিবর্গ (The Allies) যখন যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত সেই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ল্যয়েড জর্জ মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য (war aims) আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের জন্য দায়ী শক্তিবর্গকে—প্রধানত জার্মানিকে, উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর মনে যুদ্ধ সৃষ্টিকারী জার্মানির প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপজাত হইয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জার্মানিকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ল্যয়েড জর্জের এই বক্তৃতায় জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের এক বক্তৃতায় আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মার্কিন আইনসভা 'কংগ্রেসের' নিকট বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' নীতির (Fourteen Points) বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ দফা পরিকল্পনা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

ল্যয়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্ কর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

(১) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা চলিবে না। গোপন কূটনীতি ( Secret diplomacy ) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন সমুদ্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্য বিষয়ে শুল্ক প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন যথাসম্ভব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধাদির সরঞ্জাম হ্রাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিক সামরিক শক্তি রাখা চলিবে না। (৫) উদার ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি লইয়া ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা করা হইবে—অর্থাৎ কে কোন্ স্থানের অধিকারে স্থাপিত হইবে তাহা বিবেচনা করা হইবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং রাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে সেই সুযোগ দিতে হইবে। (৭) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত করিতে হইবে এবং বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সের আল্‌সেস্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৯) জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতালির রাজ্য-সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হইবে। (১১) জাতীয়তার ভিত্তিতে বলকান দেশগুলির পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১২) দার্দানেলিজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিক-ভাবে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুর্কী সুলতানের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১৩) পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পৌঁছিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও রাজ্য-সীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত

প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা শর্ত সম্বলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্য না করিলেও উহা গ্রহণও করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইল্‌সন ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

**প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন (Paris Peace Conference):** ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্‌জারল্যাণ্ডেই এই সভার অধিবেশন আহূত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ বৎসর পূর্বে সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিস নগরীতেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। ফ্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। একমাত্র ফ্রান্সের মন রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্যারিস নগরীতে আহূত হইল।

প্যারিস নগরী শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত

৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উড্রো উইল্‌সন্, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ডেভিড্ ল্যয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্‌শো, ইতালির প্রধান মন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দেশ-বিদেশ হইতে এই শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four)-এর হস্তেই ছিল। ইঁহারা হইলেন: উইল্‌সন্, ল্যয়েড্ জর্জ, ক্লিমেন্‌শো এবং ওর্লাণ্ডো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেন্‌শো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

প্রধান চারিজন (*Big-Four*)

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্যবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কার্যত সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শবাদের মৌখিক প্রকাশে কোন ত্রুটি করিলেন না। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেক্‌জাণ্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে সেইরূপ

ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়

ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন্। তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বন্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের মর্যাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। "জনমতের ভিত্তিতে আইনসম্মত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য" —এই কথা উইল্‌সন্ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ব্যক্ত করিলেন* এবং এই আদর্শ কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'-সম্বলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উথাপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইল না, কারণ যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন বিভিন্ন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন দেশের ছিল।

প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের আদর্শবাদ

ইওরোপের দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

এইভাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হইল। একদিকে ন্যায় ও সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাহাতে বিনষ্ট না করিতে পারে সেজন্য জার্মানিকে দুর্বল করিবার, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা।† এই দুই

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত

* "What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind." *Wilson*, Vide Ketelbey, p. 430.

† "At the peace conference two ideas were struggling for mastery ; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice ; on the other were notions more familiar to the peace conferences, of the Balance of Power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors " Ketelbey, p. 431.

আদর্শের দ্বন্দ্বে পদানত জার্মানিকে হীনবল করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে ন্যায় ও সততার আংশিক প্রয়োগ যে না করা হইল এমন নহে, তথাপি প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির কূটকৌশল ও জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন্, ল্যয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো, ওর্লাণ্ডো প্রমুখ কূটনীতিকগণের কূটচালে সহজেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার 'চৌদ্দ দফা শর্ত' ( Fourteen Points ) নামেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকরী হইল না।

উইল্‌সনের আদর্শ-বাদের পরাজয়

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন জার্মানির সহিত ভার্সাই ( Versailles )-এর সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট্ জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-এর সন্ধি, এবং তুরস্কের সহিত সেভ্রে (Sevres)-এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুঝিলেন না, তেমনি ইওরোপের পুনর্গঠনে ন্যায় বা সততার ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

ভার্সাই, সেণ্ট্-জার্মেইন, ট্রিয়ানন, নিউলি ও সেভ্রে—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ প্রচারিত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্বলিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) জার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং জার্মান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ট্রিয়েস্ট্ ( Triest ) ও ট্রেন্টিনো ( Trentino ) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি, এবং পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা, এবং (৫) জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সমস্যা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিষ্ঠান

স্থাপনের শর্তগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না সে বিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২৮শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নূতন শর্ত সংযোজনার দ্বারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্য মূলক চুক্তি বা মন্‌রো-নীতির (Monroe Doctrine) ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং প্রত্যেক দেশের প্রজাই সমমর্যাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব প্যারিস সম্মেলনের নিকট জাপান উত্থাপিত করিলে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর কৃত্রিম বৈষম্য সম্পূর্ণভাবেই বজায় রহিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তি গৃহীত

জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্স দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদারল্যাণ্ডের অন্তর্বর্তী দশ হাজার বর্গমাইল স্থান একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous buffer state) বলিয়া ঘোষিত হউক। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আল্‌সেস্-লোরেনের ন্যায় অপর একটি সমস্যাসঙ্কুল স্থানের সৃষ্টি হইত। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতে নিজ নিরাপত্তার দাবি ত্যাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে ফরাসী মন্ত্রী ক্লিমেন্‌শো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে আরও দুইটি চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

রাইন অঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য ফরাসী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার দায়িত্ব গ্রহণ

ভার্সাই-এর সন্ধির খসড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি লিখিত মন্তব্য পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০টি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর সন্ধির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ ৪৪৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখিয়া পেশ করিলেন। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করিয়া এই সকল মন্তব্যের অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। এই সামান্য পরিবর্তনও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জের বিশেষ সনির্বন্ধতায় সম্ভব হইয়াছিল। ল্যয়েড জর্জ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় যে প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা সামান্য পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পরিবর্তিত সন্ধির শর্তানুসারেও জার্মানির ভাগ্য-বিড়ম্বনার অবধি ছিল না।

জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের বিদ্বেষ

**ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles)ঃ** ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। (২) বেলজিয়ামকে মরেস্‌নেট্, ইউপেন ও মামেডি (Moresnet, Eupen and Malmedi) দিতে বাধ্য হইল। (৩) পোল্যাণ্ডকে পোজেন-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে হইল, এবং যদি উত্তর-সাইলেশিয়া ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যাণ্ডকে দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। (৪) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। কিয়দকাল পরে এই বন্দরটি লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। (৫) জার্মানিকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হইল। চীনদেশস্থ জার্মান অধিকারসমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mandatories'-এ পরিণত করা হইল।

পুনর্বণ্টনের শর্তাদি

জার্মানির সামরিক শক্তির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষে আনা হইল। (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি

জার্মানিকে ত্যাগ করিতে হইল। (৩) যে সামান্য সৈন্যসংখ্যা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং জার্মানির সীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল। (৪) জার্মানির নৌবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, হেলিগো-ল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রাইন নদীর বাম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে যে সকল জার্মান দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলাবারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—এই সকল শর্তও জার্মানির উপর চাপান হইল। (৫) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেজন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল। (৬) জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সকল যুদ্ধজাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাড্‌মিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa flow) নামক জলভাগে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বেই ডুবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

সামরিক শর্তাদি

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির বাণিজ্যপোতের অধিকাংশই ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সার ( Saar ) অঞ্চল নামক একটি জার্মান জেলা পনর বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হইল। এই দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফরাসী কয়লার খনিগুলি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পনর বৎসর অতিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন স্থির করা হইবে, বলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকেও জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। (৩) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধ জার্মানির উপর আরোপ করিয়া জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবী করা হইল। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পরিমাণ অর্থ জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবে তাহা স্থির করা

অর্থনৈতিক শর্তাদি : ক্ষতিপূরণ

সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিসাব অনুযায়ী এই দাবী মোট ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারের মধ্যে দাঁড়াইল। কি পরিমাণ অর্থ দাবি করিলে ঠিক হইবে তাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ সোনা বা অপর কোন জিনিস দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানিকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন আর জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

**ভার্সাই-এর সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles) :** প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং ইওরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, উপযুক্ত মর্যাদা, ন্যায় বা সততা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা, দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল।

মিত্রপক্ষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

ভার্সাই-এর সন্ধিতে* আমরা দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, যথা : (১) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিষ্যতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই দুই নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিকগণ পরাজিত শত্রুর কৃতজ্ঞতার

দুইটি প্রধান নীতি : (১) জার্মানিকে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দান, (২) ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তি-সঞ্চয়ের পথ রোধ

* "The treaty represented two main ideas : a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." *A short History of Modern Europe*, Riker, p. 396.

মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায্যবিচার, দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপর ও সংকীর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

(১) মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া শান্তির প্রতিকূল

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের কালে পরাজিত শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি অন্যায্য ও অপমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ স্বভাবতই থাকে না, ফলে শান্তি-চুক্তির বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুরু হয়।* এই বিরোধ ও বিদ্বেষ ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও এইরূপ হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই-এর চুক্তির খসড়ার উপর কেবলমাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত করিয়া এবং অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় যতটুকুই থাকুক না কেন, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান জাতি, এমন কি ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated Peace' বা বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তিচুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই,

জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবহার

'Dictated Peace'

*"It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, p. 322.

জার্মান জাতি এই সন্ধির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ( ১৯৩৯—'৪৫ ) বীজ এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর সন্ধি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর পত্তন করিয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্সাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শর্তাদি কোন উদার, বা ন্যায্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করা হইয়াছিল, কিন্তু জার্মানি হইতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার প্রতিদানে জার্মানিকে কোন সুবিধাদানের মনোবৃত্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর শর্তানুসারে* উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য-নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

(২) অর্থ নৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অনুদারতা ও অবিচার—লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর নীতিবিরোধী

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী ( Fourteen Points )। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তানুযায়ী† স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্বৃত্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানির উপরই মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থ-

সামরিক শক্তি-হ্রাস-নীতি অবহেলিত

*"A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." *League of Nations Covenant*, vide Langsam, p. 69.

†"Adequate guarantees that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.' Wilson's *Fourteen Points*, Langsam, p. 69.

পরতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও হ্রাস করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

চতুর্থত, জার্মানি হইতে আল্‌সেস্-লোরেন ফ্রান্সকে দান করা, পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া, পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দিয়াছিল বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডকে যেসকল স্থান জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির লোকসংখ্যা অধিক ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল।* পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার অধীনে জার্মান জাতির বহুলোককে বসবাসে বাধ্য করিয়া এবং দক্ষিণ-টাইরল ইতালির সহিত সংযুক্ত করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তি সংখ্যালঘু সমস্যার (Minority Problem) সৃষ্টি করিয়াছিল। ডেভিড্ টম্‌সনের মতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান তথা উইল্‌সনীয় জাতীয়তাবাদী নীতির পূর্ণপ্রয়োগ সম্ভব ছিল না। কারণ এইরূপ পূর্ণপ্রয়োগ একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই হইত বেশি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের জন্য মিত্রশক্তিবর্গ বিভিন্ন শক্তির সহিত পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই যুক্তির দ্বারা মিত্রশক্তিবর্গের কার্যকলাপ সমর্থন করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইবে, বলা কঠিন। কারণ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছামূলক

জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি

*"It was perhaps open to question whether the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations." E. H. Carr; *International Relations between the two World Wars.* pp. 5-6.

সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহা হইতে পরাজিত শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসার মনো-বৃত্তিই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সকল কারণে জার্মান জাতির মনে ভার্সাই চুক্তি মানিয়া চলিবার কোন নৈতিক দায়িত্ববোধ স্বভাবতই জন্মায় নাই।

পঞ্চমত, জার্মানিকে যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির সর্বনাশসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। জার্মানিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির দিক দিয়া দুর্বল করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে বিচার করিলে পরাজিত শত্রুর এইরূপ অবমাননা এবং নির্যাতন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তিগুলির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি : রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

ঐতিহাসিক রাইকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিত তাহা হইলে জার্মানিও যে মিত্রশক্তিগুলির উপর অনুরূপ শর্তাদি চাপাইত না, তাহা বলা যায় না। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেস্ট্-লিট্ভস্কের সন্ধি এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমত সমর্থন করিবার জন্য ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুকে শত্রুতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে—এইরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে রহিয়াছে। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) পর অস্ট্রিয়ার প্রতি জার্মানির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিস্‌মার্কের উদারতারই ফল ইহা অনস্বীকার্য। মানবতা এবং নৈতিকতার দিক ভিন্ন প্রকৃতক্ষেত্রেও ভার্সাই-এর সন্ধি যে অদূরদর্শিতার

ঐতিহাসিক রাইকারের অভিমত

পরিচায়ক সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই।* (১) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইতে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে এইভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-হীন করিবার মধ্যেই ভার্সাই-এর সন্ধি ভঙ্গ করিবার দৃঢ়সংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। অপর একটি যুদ্ধের দ্বারা নিজ মর্যাদা এবং হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল : সন্ধিভঙ্গ করিবার জন্য জার্মানির সংকল্প

(২) পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া ফিরাইয়া দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিবার ফলে জার্মান জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপত্তারও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সুযোগ পাইলেই উহার পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিষ্যতে জার্মানির উত্থানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জার্মানি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথম হইতেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। (৩) তদুপরি জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অভাবনীয় পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের যে বিরাট বোঝা চাপাইয়াছিল তাহার মধ্যেই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছিল। কাল্পনিক যে কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করিবার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বা শত্রুকে দুর্বল করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ মিত্রশক্তিদের স্বার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট

জার্মানির অপমান : সন্ধিভঙ্গের সংকল্প

অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ দাবি—অদূরদর্শিতার পরিচায়ক

*"But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। হাঁসকে উপবাসী রাখিয়া সোনার ডিম আশা করা দুরাশা মাত্র। জার্মানিকে অর্থ নৈতিকভাবে পঙ্গু করিয়া ক্ষতিপূরণের আশা করা ঐরূপ সোনার ডিমের ন্যায়ই দুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শাস্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকরী রহিয়া গিয়াছিল।

কাহারো কাহারো মতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করিবার কালে সেগুলির কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কাইজারের বিচার করা হয় নাই। মাত্র কয়েকজন জার্মান সামরিক কর্মচারীকে জার্মান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারালয় কর্তৃক বিচার করিয়া অতি সামান্য দণ্ড দান করা হইয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী শান্তি-চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৫ বৎসর জার্মানিতে মোতায়েন থাকিবার কথা সত্ত্বেও ১১ বৎসর পরই উহা জার্মানি হইতে অপসারণ করা হইয়াছিল। সর্বোপরি, একথাও কেহ কেহ, যেমন F. L. Benns বলিয়া থাকেন যে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদির অধিকাংশই ছিল সাময়িক শর্ত। এই চুক্তির ত্রুটিপ্রসূত যাহা কিছু অসুবিধা দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি দূর করিবার জন্য লীগ-অব-ন্যাশন্স্ নামক স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি দ্বারা ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির দোষ-ত্রুটি স্খালন করা সম্ভব কি? পরবর্তী কালে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির কঠোরতা দূর হইয়াছিল বা পনর বৎসরের স্থলে এগার বৎসর পর মিত্রপক্ষীয় সেনা-বাহিনী জার্মানি হইতে অপসারিত হইয়াছিল ইহাতে মিত্রপক্ষের উদারতা এবং যুদ্ধোত্তর জার্মানির যুদ্ধং দেহি মনোভাবের পরিবর্তন পরিস্ফুট হইলেও ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তির শর্তাদির মৌলিক ত্রুটির লাঘব হইতে পারে না।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমর্থনে যুক্তি

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানত, জার্মানি কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নর-নারীর যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধাত্মক জনমত গঠিত হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধির সংগঠকগণ এই শক্তিশালী জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

উপসংহার:

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংকীর্ণ, স্বার্থপর জাতীয়তাবোধ, জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রভৃতি কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশকে পূর্বে কখনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্বভাবতই এই সন্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই যে বপন করা হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(১) ইওরোপীয় জনমতের চাপ, (২) মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর চুক্তি

সংকীর্ণ স্বার্থপরতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ

**ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে অসামঞ্জস্য (Deviations of the Treaty of Versailles from Wilsonian Principles) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্‌ উইল্‌সন মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এবং অন্যত্র কয়েকটি বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের (The Allies) যুদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন। এই সকল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি স্থাপন ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করাই ছিল উইল্‌সনের উদ্দেশ্য। উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের পরিকল্পনায় জেনারেল স্মাট্‌স্‌ ও ফিলিমোর-এর দানও নেহাৎ কম ছিল না। উইল্‌সনীয় নীতিগুলি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট তাঁহার ভাষণে বিবৃত চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points), ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসের নিকট অপর এক বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি নীতি' (Four Principles) মাউন্ট ভার্নন নামক স্থানে ৪ঠা জুলাই তারিখের বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) এবং নিউইয়র্কে বক্তৃতায় বিবৃত 'পাঁচটি ব্যাখ্যা'* (Five

উইল্‌সনীয় নীতি : 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points), 'চারিটি নীতি' (Four Principles), 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) ও 'চারিটি ব্যাখ্যা' (Four Particulars)

---

***Fourteen Points :**

1. "Open covenants of peace openly arrived at, after which there shall be no private international undertakings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. (Contd.)

Particulars )—এই সকল বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লিখিত ও বিবৃত নীতির সমষ্টিমাত্র। এই সকল নীতির ব্যাখ্যা ও ঘোষণা সাধারণ্যে বিশেষত জার্মান জাতির মনে এই ধারণা স্বভাবতই জাগিয়াছিল যে, মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানির প্রতি ব্যবহারে এগুলির প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে এই সকল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির প্রতি যেরূপ আচরণ করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ইহাই ছিল প্রধান অভিযোগ। তাহাদের নিকট ভার্সাই-এর সন্ধি ছিল জাতীয় অপমানের প্রতীকস্বরূপ।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির অভিযোগ

---

2. Absolute freedom of navigation upon the seas outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of the international covenants.

3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.

4. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

5. A free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the Government whose title is to be determined.

6. The evacuation of all Russian territory, and as such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest co-operation of other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own

(Contd.)

সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইওরোপীয় লেখক মাত্রেই ভার্সাই-এর সন্ধি বিজিত শক্তি জার্মানির উপর বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের আক্রোশ ও প্রতিশোধ-পরায়ণতার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত তথা উইল্‌সনীয় নীতির প্রয়োগে জার্মানির প্রতি অবিচার অর্থাৎ উইল্‌সনীয় নীতি ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির প্রয়োগে অসামঞ্জস্যের মধ্যেই জার্মানির পুনরুত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ উপ্ত ছিল। ইদানীং কোন কোন লেখক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির প্রতি অবিচারের বিশেষ কোন পরিচয় পান না। তাঁহাদের মতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তগুলির প্রয়োগে উইল্‌সনীয় নীতিগুলির অন্ধ অনুসরণই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ, এই দুইয়ের অসামঞ্জস্য নহে।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে মতানৈক্য

---

choosing ; and more than welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded to Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of her good will, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.

7. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single Act will serve as this will serve to restore confidence among nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of International Laws is for ever impaired.

8. All French territory should be freed, and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matters of Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all.

9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognisable lines of nationality. (Contd.)

গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে যদিও জার্মানি উইল্‌সনীয় নীতির ভিত্তিতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং যদিও বা প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের বক্তৃতায় বিবৃত নীতিগুলির প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল তথাপি জার্মানির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উদার ব্যবহার আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তিনি টেম্‌পারলির (H. W. V. Temperley) সহিত একমত যে, উইল্‌সনীয় নীতি রাজনৈতিক বক্তৃতা ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না! এই বক্তৃতাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া বা কূটনৈতিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োগ করা যেমন ছিল অসম্ভব তেমনি উহার পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা ছিল অযৌক্তিক।* ইহা ভিন্ন, একথাও বলা হইয়া থাকে যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখ জার্মানি রাশিয়ার উপর ব্রেস্ট্-লিটভ্‌স্ক-এর এবং রুমানিয়ার উপর বুকারেস্ট্-এর যে সন্ধি চাপাইয়াছিল তাহা হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি জয়লাভ করিলে মিত্র-শক্তিবর্গের যে কি অবস্থা হইত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ভার্সাই-এর চুক্তির সমর্থন

স্থতরাং জার্মান জাতির উইল্‌সনীয় নীতির প্রয়োগে ত্রুটির বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার নৈতিক অধিকার ছিল না। বস্তুত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বাল্টিমোর নামক স্থানে এক বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সন জার্মানি কর্তৃক রাশিয়ার উপর যে শান্তি-চুক্তি চাপান হইয়াছিল উহার ফলে যুদ্ধের পর শান্তিচুক্তি সম্পর্কে তাঁহার পূর্বধারণা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—একথা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন। স্থতরাং উইল্‌সনীয় নীতি জার্মানির সহিত শান্তি স্থাপনের ভিত্তি ছিল একথা বলা যায় না।†

---

10. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safe-guarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.

11. Rumania, Serbia and Montenegro should be evacuated; (Contd.)

---

* Temperley: *A History of the Peace Conference of Paris*, Vol VI, p. 540.

Gathorne Hardy: *A short History of the International Affairs*, p. 20.

† President Wilson's Baltimore Speech, April 16, 1918.

গ্যাথোর্ণ হার্ডি একথাও বলিয়াছেন যে, উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তের অধিকাংশগুলিই ছিল সার্বজনীন শর্ত। কেবলমাত্র ৫,৭,৮ ও ১৩—এই চারিটি শর্ত ছিল জার্মানির স্বার্থসম্পর্কিত। পঞ্চম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, উপনিবেশের উপর কোন দেশের দাবি স্বীকার করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ন্যায়-পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্য ভাবে বিচার করিতে গেলে জার্মানিকে সর্বাবস্থায়ই নিজ উপনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে একথা জার্মান নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।* সপ্তম ও অষ্টম শর্তে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হইতে জার্মান সৈন্যাপসরণ এবং বেলজিয়ামকে মামেডি, মরেস্নেট, ফ্রান্সকে আল্সেস্-লোরেন প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, উইল্সনের 'চারিটি নীতি'তে ( Four Principles )

গ্যাথোর্ণ হার্ডির যুক্তি

---

occupied territories restored ; Serbia accorded free access to the sea ; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality, and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

12. The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured, a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured of an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardenelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

13. An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. (Contd.)

---

* Gathorne Hardy, pp. 18-19.

বিবৃত স্বাধিকার ( Self-determination ) নীতির প্রয়োগে জার্মানি ডেনমার্ককে গণভোট সাপেক্ষভাবে উত্তর শ্লেজভিগ্ নামক স্থানটি অর্পণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শর্তে পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন ও সমুদ্রের সহিত সেই পুনর্গঠিত রাষ্ট্রের সংযোগের সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালের এক অন্যায় দূরীভূত হইয়াছিল। এই সকল যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাথোর্ণ হার্ডি বলেন যে, ভার্সাই-এর সন্ধি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। সার অঞ্চল ও রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকার ছিল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উইল্‌সনীয় নীতি ও এই সকল ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী ছিল না। জার্মানি যাহাতে ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পালন করিয়া চলে সেজন্য এই সকল ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছিল। কেবলমাত্র যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে জার্মান সম্রাট কাইজারের বিচারের শর্তটি উইল্‌সনীয়

---

14. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike."

**Four Principles :**

1. That each part of the final settlement must be based upon essential justice of that particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that will be permanent.

2. That peoples and provinces are not to be bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, even the great game, now for ever discredited, of the Balance of Power but,

3. That even, territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment or compromise of claims amongst rival states.

4. That all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction that can be accorded to them without introducing new or perpetuating old elements of discord and antagonism that would be likely in time to break the peace of Europe, and consequently of the world. (Contd.)

নীতি বহির্ভূত ছিল। এক্ষেত্রেও গ্যাথোর্ন হার্ডি বলেন যে, কাইজারের বিচারের শর্তটির বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের কিছু থাকে তাহা একমাত্র কাইজারের ব্যক্তিগত অভিযোগ হইতে পারে, ইহা জার্মানির জাতীয় অভিযোগ হইতে পারে না।

নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি যে উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত ও অপরাপর নীতি-বিরোধী ছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইদানীং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির যুক্তিবাদী সমর্থনের প্রবণতা বিশেষভাবে ইংরাজ লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইলেও নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল।

উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টনের শর্তটির অবমাননা

প্রথমত, উইলসনীয় নীতির সাধারণ শর্তগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র যেগুলি সরাসরিভাবে জার্মানির স্বার্থ-সম্পর্কিত ছিল সেগুলির বিচার করিলেও জার্মানির অভিযোগের ন্যায্যতা প্রমাণিত হইবে। উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের পঞ্চম শর্তে উপনিবেশ-সম্পর্কে যে নীতি বর্ণিত আছে তাহা কেবলমাত্র জার্মানির উপরই প্রযুক্ত হইয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিচার করিয়া দেখা দূরের

---

**Four Ends :**

1. The destruction of every arbitrary power any where that can separately, secretly, and of single choice disturb the peace of the world ; or if it cannot be presently destroyed, at least its reduction to virtual impotence.

2. The settlement of every question, whether of territory, sovereignty, of economic arrangements or of political relationship, upon the basis of free acceptance of that settlement by the people immediately concerned and not upon the basis of material interest or advantage of any other nation or people which may desire a different settlement for the sake of its own exterior influence or mastery. (Contd.)

কথা, জার্মানির উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনসমাজের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনও তাহারা উপলব্ধি করে নাই। সার অঞ্চল, শাণ্টুং, সিরিয়া প্রভৃতির জনসাধারণের মতামতের প্রতি কোনপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কথা তাহারা মনেও আনে নাই।

সামরিক উপকরণ হ্রাসের প্রশ্ন

দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শর্তানুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন উহার অধিক সামরিক শক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রও হ্রাস করিবে। এই নীতি পরাজিত জার্মানির উপরই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। জার্মানির আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন ছিল তাহা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হয় নাই।

---

3. The consent of all nations to be governed in their conduct towards each other by the same principles of honour and respect for the common law of civilized society that govern the individual citizens of all modern states in their relations with one another, to the end that all promises and covenants may be sacredly observed, no private plots or conspiracies hatched, no selfish injuries wrought with impunity, and a mutual trust established upon the handsome foundation of a mutual respect for right.

4. The establishment of an organisation of peace which shall make it certain that the combined power of free nations will check every invasion of right and serve to make peace and justice the more secure by affording a definite tribunal of opinion to which all must submit and by which every international readjustment that cannot be amicably agreed upon by the peoples concerned shall be sanctioned.

**Five Particulars :**

1. The impartial justice meted out must involve no discrimination between those to whom we wish to be just and those to whom we do not wish to be just. It must be justice that knows no favourites and knows no standards but the equal rights of the several peoples concerned. (Contd.)

তৃতীয়ত, উইল্‌সনের নীতির অন্যতম প্রধান ছিল স্বাধিকার বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ( Self-determination )। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগে কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় নাই। পুনর্গঠিত পোল্যাণ্ডকে যে সকল স্থান দেওয়া হইয়াছিল সেগুলির কয়েকটিতে জার্মান জাতির লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত পোল্যাণ্ডে জার্মান জাতির লোকের ঐ একই অধিকার উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইতালির রাজ্যসীমাও জাতীয়তা-নীতির ভিত্তিতে করা হয় নাই। যে আশা লইয়া ইতালি প্রথম যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহা ব্যাহত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানির সহিত জার্মান জাতির লোক-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছাধীনভাবে ঐক্য-বদ্ধ হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি উইল্‌সনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অবমাননা করিয়াছিল বলা বাহুল্য। অস্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্য

---

2. No special or separate interest of any single nation or any group of nations can be made the basis of any part of the settlement which is not consistent with the common interest of all.

3. There can be no leagues or alliances or special covenants and understandings within the general and common family of the League of Nations.

4. And more specifically, there can be no special, selfish economic combinations within the League and no employment of any form of economic boycott or exclusion, except as the power of economic penalty, by exclusion from the markets of the world, may be vested in the League of Nations itself as a means of discipline and control.

5. All international agreements and treaties of every kind must be made known in their entirety to the rest of the world. Special alliances and economic rivalries and hostilities have been the prolific source in the modern world of the plans and passions that produce war. It would be an insincere as well as an insecure peace that did not exclude them in definite and binding terms.

পরাজিত জার্মানিকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে এই যুক্তির ভিত্তিতে মিত্রশক্তিবর্গের কার্য সমর্থন করা সুযৌক্তিক হইবে না। পরাজিত শত্রুকে পদানত রাখিবার মনোবৃত্তি বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসেও ফ্রান্সকে পদানত ও হীনবল করিয়া রাখিবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্যের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হইবার যে আশঙ্কা ছিল, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে ন্যায় ও উদারতা প্রদর্শনে ত্রুটি সেই আশঙ্কা কোন অংশে হ্রাস করিয়াছিল বলা চলে না। পরাজিত শত্রুকে উদার নীতির মাধ্যমে মিত্রতে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা বা দূরদর্শিতা মিত্র-শক্তিবর্গ উপলব্ধি করে নাই। মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে জার্মানি কোন ন্যায্য ব্যবহার পায় নাই এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি পরাজিত জার্মানির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্বভাবতই জার্মান জাতিকে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়া ও জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হইবার সম্ভাব্য ফল হিসাবে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইতে পারে এই যুক্তিতে জার্মানিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে পরাজিত ও অপমানিত জার্মান জাতির মনে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে স্থানান্তরিত না করিয়া সম্ভব হইত না এজন্য জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগের প্রশ্ন বাদ দিয়া মিত্রশক্তিবর্গ দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ডেভিড্ টম্‌সনের ( David Thomson ) এই যুক্তির বিরুদ্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরণের সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও এই দুই দেশের ঐক্যের পথ রুদ্ধ করিয়া জার্মানিকে দুর্বল রাখা গেলেও উইল্‌সনীয় নীতির অবমাননা ইহাতে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির অবমাননা

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা : সংখ্যালঘু সমস্যা

ডেভিড্ টম্‌সনের যুক্তি : উহার প্রত্যুত্তর

গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে জার্মান সম্রাট কাইজারের উপর যুদ্ধ-অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর কয়েকজন যুদ্ধ অপরাধী জার্মানকে বিচার করিবার

শর্তটি শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হইলেও * ইহা জার্মান জাতির অভিযোগের কারণ হইতে পারে না, ইহা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উহা কাইজারের এবং অপরাপর কয়েকজন জার্মান সেনানায়কের ব্যক্তিগত অভিযোগ ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু উইল্‌সনের বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে সকল নীতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির সম্রাটের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যে অবিচার এবং জার্মান জাতির মর্যাদায় যে আঘাত করা হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, জার্মানির উপর এক বিশাল ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপাইয়া দিয়া উইল্‌সনের 'চারিটি নীতি' ( Four Principles ) সংক্রান্ত বক্তৃতায় ( ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ ) উল্লিখিত "There shall be no annexations, no contributions, no punitive damages"—এই কথাগুলির অবমাননা করা হইয়াছিল।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে মিত্রশক্তিবর্গ চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। পরাজিত শত্রুর পক্ষে ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইবার পথ বন্ধ করা এবং শক্তিসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতিই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম হইতেই 'Thy head or my head' নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। সুতরাং মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত হইলে জার্মানি যে ব্যবহার করিত পরাজিত জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গও অনুরূপ আচরণই করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোন ব্যাপক যুদ্ধের পর মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিয়া শত্রুর প্রতি চরম উদারতা প্রদর্শন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে কোন কালেই ঘটে নাই। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিস্‌মার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার প্রতি উদার ব্যবহারের পশ্চাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার

উপসংহার

---

* "Less clearly perhaps within the agreed frame work were the provisions for the trial of the Kaiser and of war criminals, but if these constituted a grievance, it was personal rather than national". Hardy : p. 19.

সাহায্যলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল বলবতী। এই উদাহরণ বাদ দিলে ইওরোপীয় ইতিহাসে বিজিতের প্রতি চরম উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কূটনৈতিক চাল, বিভিন্ন দেশের সরকারের পরিবর্তন, যুদ্ধের গতির পরিবর্তন-শীলতা, ব্রেস্ট্-লিট্ভস্ক সন্ধির কঠোরতা, মিত্রশক্তিবর্গের গোপন-চুক্তি প্রভৃতি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। এমতাবস্থায় উইল্‌সনের আদর্শবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা বৃথা ছিল। এই সকল যুক্তির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির ত্রুটিসমূহ কতকটা মার্জনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

**সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of Saint Germain):** মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি তথা অপরাপর সন্ধিগুলিও ভার্সাই-এর সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা হইল। জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তার ভিত্তিতে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত এমন কোন চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীয় রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার উপর চাপাইলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, সেইজন্য অস্ট্রিয়ার জার্মান অধিবাসী-দিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তার দোহাই দিয়াই সমবেত রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া-সুদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটি একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্লাভ্-অধ্যুষিত বোস্‌নিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল যুগোস্লাভিয়া (Yugo-

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়া: সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তিতে বাধাদান

জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

Slavia) জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল। দক্ষিণ-টাইরল (South Tirol), ট্রেন্টিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট্ (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria) এবং ডালম্যাশিয়া (Dalmatia)'র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ-টাইরলের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হইয়াছিল। জার্মানির ন্যায় অস্ট্রিয়াও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিতেছিল তাহা মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়াকে সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে জার্মানির উপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অনুরূপ ব্যবস্থা অস্ট্রিয়াকেও মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলোপ

অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস : ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

উপরোক্ত আলোচনা হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভার্সাই-এর সন্ধির যেসকল দোষ-ত্রুটি ছিল ঠিক সেই সকল দোষ-ত্রুটি সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধিতেও বিদ্যমান ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধেও ঠিক একই প্রকার অভিযোগ করা যাইতে পারে।

**নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) :** নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্বর ২৭, ১৯১৯)। এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ৩৩ হাজারের বেশি হইবে না স্থির হইল।

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি

ক্ষতিপূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ খুব বেশি হ্রাস না পাইলেও এই সকল শর্তের ফলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের দুর্বলতম দেশে পরিণত হইল।

**ট্রিয়াননএর সন্ধি (Treaty of Trianon):** ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যস্থ ম্যাগিয়ার জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্ভারের অবশিষ্টাংশ, ক্রোশিয়া-স্লাভোনিয়া যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোস্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যাণ্ড বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজার সৈন্যের অধিক সৈন্য হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌবাহিনীরও কোন অস্তিত্ব রাখা হইল না, সমুদ্র অঞ্চলে পাহারার জন্য সামান্য কয়েকটি জাহাজ তাহাদের রহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের ন্যায় হাঙ্গেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপূরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননএর সন্ধি

**সেভ্রেএর সন্ধি (Treaty of Sevres):** ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সেভ্রেএর সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টুনিস প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া ও সিরিয়ার উপর হইতেও তুর্কী অধিকার বিলোপ করা হইল। স্মার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীসকে ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেওয়া হইল। রোড্স্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির অধিকার স্বীকৃত হইল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দার্দানেলিজ ও

তুরস্কের সহিত সেভ্রেএর সন্ধি

বোস্‌ফোরাস্‌ প্রণালীদ্বয় আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং উহার তীরস্থ সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইল। একদা বিশাল ওটোমান সাম্রাজ্য কন্‌স্টান্‌টিনোপল এবং এ্যানাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

তুরস্ক এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত

তুর্কী স্থলতান ষষ্ঠ মোহম্মদের প্রতিনিধি সেভ্‌রে-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইল তখন মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা দান করিল। শেষ পর্যন্ত ল্যুসেনের (Lausanne) সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সেভ্‌রে-এর সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদী দলের বাধা দান

**ম্যাণ্ডেট্‌স্‌ (Mandates) :** জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং তুরস্কের আরব উপদ্বীপস্থ সাম্রাজ্যের শাসনভার লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের দায়িত্বাধীনে গ্রহণ করা হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। যে সকল দেশের অধীনে এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল সেগুলিকে Mandatory Powers এবং সেগুলির অধীনে স্থাপিত দেশগুলির Mandates নামকরণ করা হইল।

এই সকল Mandates-এর অধিবাসীদের উন্নতিবিধান করাই ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর Mandatory Powerগুলিকে তাহাদের অধীন Mandates-এর অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট দাখিল করিতে হইত।

Mandates তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণী। তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত যেসকল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নিজ শাসন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহাদিগকে Mandatory Powerগুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিবে। যখনই এই সকল স্থানের অধিবাসীরা নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিবে, তখনই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandateগুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা

হইল। এই সকল স্থানে Mandatory Power-কে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না। 'গ' পর্যায়ে রাখা হইল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে। এগুলি নিকটবর্তী Mandatory Powers-এর রাজ্যাংশ হিসাবে বিবেচনা করা হইল, তবে এই সকল স্থানের জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

'ক' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক্, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে দেওয়া হইল, সিরিয়া লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'খ' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেরুনস্-এর একাংশ, টোগোল্যাণ্ডের একাংশ এবং ট্যাঙ্গানিকা (জার্মান ইস্ট্-আফ্রিকা) ব্রিটেনের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনস্-এর অবশিষ্টাংশ ফ্রান্সের অধীনে স্থাপন করা হইল। বেলজিয়ামকে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির শাসনভার দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে দেওয়া হইল, জার্মান স্যামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাণ্ডকে, নাউরু দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলণ্ডকে। বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অপরাপর যাবতীয় জার্মান উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরস্থ সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানকে দেওয়া হইল।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ( Historical importance of the World War I ):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, সেগুলির প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা বা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত হইবে না।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব : ব্যাপক ও বিভিন্ন

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই এই যুদ্ধের প্রভাব-মুক্ত ছিল না। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপকতা—জল, স্থল

সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)

আকাশ—সর্বত্র এই যুদ্ধের বিস্তৃতি, মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুর্কী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ইওরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের মানচিত্রের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র একেবারে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের মানচিত্র তদানীন্তন লোকের নিকট কোন নূতন মহাদেশের মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়ার পুনর্গঠন চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন ধারার স্বষ্টি করিয়াছিল।

জার্মান, রুশ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন : নূতন নূতন রাষ্ট্রের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্বষ্টির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। বলকান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের স্বষ্টি হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যেসকল নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের জয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইয়াছিল মোট ষোল।

গণতন্ত্রবাদ

কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিরুদ্ধ

ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের স্থলে 'ডিক্টেটরশিপ'-এর ( Dictatorship ) উদ্ভব হইতে থাকে। এই নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে, ইতালির ফ্যাসিজম্ ও জার্মানির নাৎসিজমের উদ্ভবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডিক্টেটরশিপ-এর উদ্ভব ( Rise of Dictatorship )

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার ঘটিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর 'কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ' ( Concert of Europe ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাময়িকভাবে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল (Third International)-এর প্রতিষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিকতার বৃদ্ধি : লীগ-অব-ন্যাশন্‌স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পরবর্তী যুগের যুবসমাজের মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

যুবসমাজের জাগরণ

এই যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি ঋণগ্রস্ত দেশ, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাজন দেশে (creditor country) পরিণত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান পরবর্তী কালে নানাপ্রকার ঈর্ষ্যা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ফলাফল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য

যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছে বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্র এই যুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বেসামরিক বিমান-চলাচল, নৌ-চলাচল প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানের উন্নতি

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর দান ছিল সর্বাধিক। তাহাদের শ্রমের ফলেই এই বিশাল যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বভাবতই শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। ক্রমেই তাহারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের স্থচনা করিল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। নারীজাতিরও রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

শ্রমিকদের উন্নতি : নারীজাতির নূতন মর্যাদা লাভ

এই যুদ্ধে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিল। এই সকল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে যে অশান্তির স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপূরক হিসাবেই দেখা দিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ক্ষতিপূরণ সমস্যা

## ( Problem of Reparation )

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ( Reparation for the World War I ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলিতেছিল সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক জনমত পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে ছিল। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিবার আর্থিক সামর্থ্য ইওরোপের কোন দেশেরই ছিল না। ভার্সাই-এর চুক্তির পূর্বাবধি যেসকল শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেগুলির অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করা। মিত্রশক্তিবর্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ব্যয়ের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পরাজিত জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবার বাতুলতা উপলব্ধি করিয়া কেবলমাত্র বেসামরিক জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পত্তির যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহা জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিতে রাজী হইল। জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ফল হিসাবেই যে এই ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে বেসামরিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি হওয়া উচিত সেবিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের অঙ্কের কোন উল্লেখ করা হইল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন বা Reparation Commission নামে মিত্রপক্ষীয় একটি কমিশনের হস্তে উহার পরিমাণ নির্ধারণের ভার দেওয়া হইল। এই কমিশন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের মধ্যে এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন একথাও বলা হইল। ইতিমধ্যে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ হিসাবে ১০০০,০০০,০০০ (একশত কোটি) পাউণ্ড মিত্রপক্ষকে দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই ব্যাপার

বেসামরিক জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ

ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission)'-এর উপর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত

লইয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জার্মানির স্পা ( Spa ) নামক স্থানে মিত্রপক্ষ ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আদায়িকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ কিভাবে মিত্রপক্ষের মধ্যে বন্টিত হইবে তাহা স্থির করা হয়। যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্বাধিক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া আদায়িকৃত ক্ষতিপূরণের ৫২ শতাংশ ফ্রান্স, ২২ শতাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ১০ শতাংশ ইতালি, ৮ শতাংশ বেলজিয়াম, ৬.৫ শতাংশ গ্রীস-রুমানিয়া-যুগোস্লাভিয়া ও ১.৫ শতাংশ পোর্তুগাল-জাপান পাইবে স্থির হইল। কিন্তু মূল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়া-ই মিত্রপক্ষীয় এবং জার্মান প্রতিনিধিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ জার্মানির নিকট হইতে একবারেই মোট ক্ষতিপূরণের জন্য থোক (lump sum ) অর্থ গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় স্পা সম্মেলনে কোন সমাধানই সম্ভব হইল না। এদিকে মিত্রপক্ষ প্যারিসে এক সভায় সম্মিলিত হইয়া জার্মানির উপর ১১,৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য করিল। ৪২ বৎসরে এই অর্থ পরিশোধ্য হইবে এবং প্রতি বৎসর জার্মানির বৈদেশিক বাণিজ্যলব্ধ অর্থের শতকরা ১২ ভাগ মিত্রপক্ষকে দিতে হইবে। জার্মানি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া এককালীন মোট ১৫০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিল। এই অর্থও মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানি হইতে অপসারিত হইলে দেওয়া হইবে একথা জার্মানি জানাইতে দ্বিধা করিল না। মিত্রপক্ষ এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মতামতের এই বিরাট পার্থক্যের ফলে এবং প্রাথমিক ১০০ কোটি পাউণ্ড কিস্তি জার্মানি তখনও আদায় দেয় নাই সেই কারণে মিত্রপক্ষ জার্মানির ডুইস্‌বার্গ ( Duisberg ), ডুসেলডর্ফ ( Dusseldorf ) ও রুহ্‌রর্ট ( Ruhrort )—এই তিনটি স্থান অধিকার করিয়া লইল। এমতাবস্থায় জার্মানি এককালীন মোট ১ হাজার কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইল, কিন্তু মিত্রপক্ষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল।

স্পা (Spa) কন্‌ফারেন্স্

ক্ষতিপূরণ বণ্টনের হার নির্ধারণ

মিত্রপক্ষ ও জার্মানির মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য

জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক কিস্তিদানে বিলম্বহেতু মিত্র শক্তিবর্গ কর্তৃক ডুইসবার্গ, ডুসেলডর্ফ ও রুহ রর্ট দখল

ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ক্ষতিপূরণ কমিশন ( Reparation Commission ) জার্মানির উপর মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য করিলেন। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন হইতে জার্মানির ক্ষতিপূরণের তালিকা ( The London Schedule ) প্রস্তুত করিলেন। এই তালিকানুসারে ৬৬০ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে ৪০০ কোটি পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিপত্র ( bond ) জার্মানির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ কমিশনের নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে, এবং ভবিষ্যতে জার্মানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে তাহা আদায়ের প্রশ্ন উঠিবে। অবশিষ্ট ২৬০ কোটি পাউণ্ড জার্মানি ১০ কোটি পাউণ্ড বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে এবং প্রতি বৎসরের মোট রপ্তানি বাণিজ্যলব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ মিত্রপক্ষকে দিবে।

ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য : (London Schedule)

পরাজিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঙ্গু জার্মানির নিকট হইতে ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার দুরাশা লণ্ডনস্থ মিত্রপক্ষীয় কাউন্সিল ( Allied Supreme Council ) উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির প্রতি যে বিদ্বেষভাব জাগরিত হইয়াছিল উহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা এই বিশাল অঙ্কের পরিমাণ হ্রাস করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, ৪০০ কোটি পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিপত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিবার ফলে ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ যে জার্মানির নিকট হইতে আদায় করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল তাহাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ২৬০ কোটি পাউণ্ড সম্পর্কে যে ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণ কমিশন করিয়াছিলেন তাহা যাহাতে কার্যকরী হয় সেজন্য মিত্রপক্ষ একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল যে, জার্মানি যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানির শিল্পাঞ্চল রুহ্‌র ( Ruhr ) দখল করিতে বাধ্য হইবে। এই বিষয় লইয়া জার্মানির তদানীন্তন মন্ত্রিসভার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জার্মানি মিত্রপক্ষের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি হিসাবে আদায় দিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানির মুদ্রা ব্যবস্থায় অত্যন্ত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। প্রচলিত নোটের অনুপাতে সরকারের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ সোনা না থাকায় কাগজী মুদ্রার মূল্য ক্রমেই

হ্রাস পাইতেছিল। তদুপরি পাঁচ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার ফলে মুদ্রার মূল্য ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বভাবতই জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণের আর কিস্তি দেওয়া যে অসম্ভব হইয়া পড়িবে ইহা ইওরোপীয় অর্থনীতিক মাত্রেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে জার্মানির প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। ইংলণ্ড পরবর্তী দুই বৎসর জার্মানির নিকট হইতে কোনপ্রকার নগদ অর্থ আদায় করা হইবে না—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিলে ফ্রান্স উহার বিরোধিতা করিল। পরাজিত শত্রু নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াইয়া যাইবে ইহা ফ্রান্সের মনঃপূত হইল না। ইহা ভিন্ন জার্মানি London Schedule না মানিলে মিত্রপক্ষ রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইবে এই কথা ফ্রান্স ভুলিতে পারে নাই। যে-কোন প্রকারে রুহ্‌র অঞ্চল দখল করিয়া লওয়াই ছিল তখন ফ্রান্সের অভিপ্রায়। সুতরাং জার্মানিকে 'স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের' (Voluntary Default) অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল (১১ জানুয়ারি, ১৯২৩)।

জার্মানির অর্থ নৈতিক অবনতি : মুদ্রা-ব্যবস্থা সঙ্কটাপন্ন

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার কেবল বে-আইনী-ই ছিল না, অদূরদর্শিতারও পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির তৎকালীন আর্থিক দুরবস্থায় নগদ ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এমতবস্থায় জার্মানিকে স্বেচ্ছাকৃত অনাদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছিল বলা বাহুল্য। জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক অব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা, যথেচ্ছ পরিমাণ কাগজী মুদ্রার প্রচলন* এবং মিত্রপক্ষের দাবি এই চারিটি কারণে জার্মানি

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকারের সমালোচনা

* "Inflation was a greater disaster for Germany than the treaty of Versailles". E. H. Carr : *International Relations between the Two World Wars.*

তখন দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল। যাহা হউক, রুহ্‌র অঞ্চলে জার্মানগণ ফরাসী-বেলজিয়ানদের সহিত অসহযোগিতা শুরু করিল। তাহারা সেই অঞ্চলের কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিয়া, শ্রমিক ধর্মঘট করাইয়া রুহ্‌র অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা নাশ করিয়া দিল। ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যগণ খাদ্যদ্রব্য, ব্যাঙ্ক আমানত, আদায়িকৃত শুল্ক সব কিছু বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইতে চলিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আমানত এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণভাবে মূল্যহীন হইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য মোতায়েন রাখিতে যে ব্যয় হইতেছিল উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ রুহ্‌র অঞ্চল হইতে আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় রুহ্‌র অঞ্চল বলপূর্বক অধিকার করা বিফলতায় পর্যবসিত হইল। যাহা হউক, জার্মানি রুহ্‌র অঞ্চলে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তাহা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে সম্পূর্ণভাবে দমিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে চ্যান্সেলর কুনো ( Cuno )-এর স্থলে গাস্টাভ্‌ স্ট্রেসিম্যান ( Gustav Stresemann ) জার্মানির চ্যান্সেলর পদে আসীন হইলে সর্বপ্রথমেই রুহ্‌র অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া এবং কলকারখানাগুলিকে পুনরায় চালু করিয়া জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি কোন কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ সমস্যার কোন নূতন সমাধানের কথা চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা যে বৃথা সেবিষয়ে ফ্রান্সেরও কোন সন্দেহ রহিল না। এদিকে আমেরিকাও যুদ্ধোত্তর ইওরোপের অর্থনৈতিক অবনতির চাপ অল্প-বিস্তর অনুভব করিতে লাগিলে মার্কিন সেক্রেটারী হিউজেস্‌ ( Hughes ) জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। ফলে 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' ( Reparation Commission ) 'ডাওয়েজ কমিটি' (Dawes Committee) নামে একটি নূতন কমিটি নিযুক্ত

জার্মানিতে নূতন মন্ত্রিসভার ক্ষমতালাভ

রুহ্‌র অঞ্চলে জার্মান অসহযোগিতার অবসান

জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে আমেরিকার ঔৎসুক্য

করিয়া উহাকে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার কিভাবে সমাধান সম্ভব এবং জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে পুনরায় সুষ্ঠু করিয়া তুলিবার উপায় কি সেবিষয়ে সুপারিশ করিবার ভার দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহায়তা-লাভের উদ্দেশ্যে জেনারেল ডাওয়েজ (General Dawes) ও আওয়েন ইয়ং ( Owen Young )—এই দুইজন মার্কিন প্রতিনিধি এবং সার রবার্ট কিণ্ডারস্লে ( Sir Robert Kindersley ) ও সার যোশিয়া স্ট্যাম্প্ ( Sir Josiah Stamp )—দুইজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি লইয়া ডাওয়েজ কমিটি গঠিত হইল ( ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ )। এই কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল ডাওয়েজ-এর নামানুসারে ইহা 'ডাওয়েজ কমিটি' ( Dawes Committee ) নামে পরিচিত।

ডাওয়েজ কমিটি (Dawes Committee)

**ডাওয়েজ পরিকল্পনা ( Dawes Plan ) :** ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ডাওয়েজ কমিটি তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। ডাওয়েজ কমিটি কয়েকটি বিশেষ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল নীতি ছিল : (১) জার্মানির উপর যে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপান হইয়াছিল উহা ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ রাজনৈতিক অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিবে না। অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে এক দেশ অপর দেশের আর্থিক পরিস্থিতির কথা যেভাবে বিবেচনা করিয়া থাকে, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত। (২) জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর বাহির হইতে কোনপ্রকার চাপ দেওয়া চলিবে না। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনরুজ্জীবনের এবং পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জার্মানির হস্তেই থাকা চাই। (৩) জার্মানিকে বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণের সুযোগ দান করিতে হইবে। (৪) জার্মানিকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতায় ( Economic Sovereignty ) পুনঃস্থাপন করিতে হইবে।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার মূলনীতি

উপরি-উক্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ডাওয়েজ কমিটি (১) জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় জার্মান মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করিলেন। পুরাতন জার্মান মার্কের মূল্য একেবারে

ডাওয়েজ পরিকল্পনা : (১) নূতন মুদ্রাব্যবস্থা —'রাইক্ মার্ক'— বিদেশী সাহায্য— জার্মান ও বিদেশী প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির উপর মুদ্রা প্রচলনের পরিদর্শনভার ন্যস্ত

হ্রাস পাইয়া গেলে জার্মান সরকার ইতিপূর্বে রেণ্টেন্মার্ক (Rentenmark) নামে এক নূতন মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার তেমন উন্নতি ঘটে নাই বলিয়া ডাওয়েজ কমিটি 'রাইক্ মার্ক' (Reich Mark) নামে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মুদ্রা চালু করিবার সুপারিশ করিলেন। এই সকল মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় একটি 'Bank of Issue'-র হস্তে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। সরকারের সরাসরি দায়িত্ব হইতে এইভাবে মুদ্রা ব্যবস্থাকে সরাইয়া আনা হইল। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার জার্মান এবং বিদেশীদের এক সংযুক্ত কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইল এবং ৪০ কোটি স্বর্ণ মার্ক উহার মূলধন হিসাবে ধার্য করা হইল। (২) জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য জার্মানিকে ৪ কোটি পাউণ্ড ঋণদানের ব্যবস্থাও করা হইল। এই অর্থ হইতে জার্মানি ক্ষতিপূরণের কিস্তিও দিতে পারিবে স্থির হইল। (৩) জার্মানির অর্থ নৈতিক কাঠামো দৃঢ় হইয়া উঠিলে জার্মানি বৎসরে ৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবে এবং ক্রমে অবস্থার উন্নতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কিস্তির হার বাৎসরিক ১২½ কোটি পর্যন্ত বাড়ান চলিবে। (৪) জার্মানি যাহাতে ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে দিতে পারে সেজন্য মাদক পানীয়, তামাক, চিনি, পরিবহণ হইতে লব্ধ রাজস্ব, রেলপথ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে লব্ধ ঋণপত্র প্রভৃতি ক্ষতিপূরণের অর্থ সংস্থানের উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। (৫) জার্মানির অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের অপরিহার্য পদক্ষেপস্বরূপ রুহ্‌র অঞ্চল হইতে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ প্রয়োজন এবং জার্মানিকে অর্থ নৈতিক সার্বভৌমত্ব (Economic Sovereignty) অর্থাৎ বিনা বাধায় নিজ ইচ্ছামত অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের সুযোগ দান করিতে হইবে—এই কথাও ডাওয়েজ কমিটি সুপারিশ করিলেন। (৬) ক্ষতিপূরণের অর্থ যাহাতে যথাযথভাবে

(২) জার্মানিকে বিদেশী ঋণ দান

(৩) ক্ষতিপূরণের বাৎসরিক কিস্তি নির্ধারণ

(৪) ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার উপায় নির্দেশ

(৫) জার্মানিকে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বে পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

(৬) ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য 'এজেণ্ট জেনারেল' নিয়োগ

আদায় হয় সেজন্য একজন 'এজেণ্ট জেনারেল' ( Agent General ) নিযুক্ত করা প্রয়োজন, একথাও ডাওয়েজ কমিটি সুপারিশ করিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মিত্রপক্ষীয় ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন শহরে এক কন্‌ফারেন্সে ( London Conference ) সমবেত হইলেন। ইংলণ্ডের পক্ষে রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী হেরিয়ট, জার্মানির চ্যান্সেলর স্ট্রেসিম্যান লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এই কন্‌ফারেন্সে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল। স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দানের শর্তাদি পালন করিয়াছে কিনা সেই প্রশ্ন মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের সর্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ভবিষ্যতে মিত্রপক্ষের কোন এক বা দুইটি দেশের পক্ষে জার্মানি কিস্তি খেলাপ করিয়াছে এই অজুহাতে জার্মানির উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রুদ্ধ হইল। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যেমন ইংলণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মানিকে কিস্তি খেলাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল সেইরূপ কার্যের পুনরাবৃত্তির পথ এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে রুদ্ধ হইল। ইহার পর ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য রুহ্‌র অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যের শেষ দল জার্মানি ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স
( জুলাই, ১৯২৪)

লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণ ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডাওয়েজ পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশার বাস্তব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। এজেণ্ট জেনারেলের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া ডাওয়েজ কমিটি ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি ক্ষতিপূরণ কমিশন ( Reparation Commission )-এর হাত হইতে সরাইয়া লইয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুর উপর প্রতিশোধ-গ্রহণের মনোবৃত্তি ক্ষতিপূরণ কমিশনেরও যে ছিল না, একথা বলা যায় না। সুতরাং ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে

ডাওয়েজ কমিটির
দূরদর্শিতা

ক্ষতিপূরণের সমস্যাটিকে নিছক অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের পর্যায়ভুক্ত করিয়া ডাওয়েজ কমিটি যুদ্ধোত্তর ইওরোপের এক বিরাট এবং জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জার্মানিকে নিজ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা দান করিয়া, জার্মানিকে বিদেশী ঋণ দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া, সর্বোপরি জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া জার্মানির উপর ইওরোপের দেশসমূহের আস্থা যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তেমনি জার্মান জাতিকেও নিজ ভাগ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ডাওয়েজ পরিকল্পনার মূল সুরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া লণ্ডন কন্‌ফারেন্স জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানে বিলম্ব অথবা কিস্তি খেলাপের অজুহাতে এককভাবে জার্মানির উপর কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও কার্যকরী-ভাবে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে তথা জার্মানি হইতে লব্ধ ক্ষতিপূরণের উপর ভিত্তি করিয়া অপরাপর দেশের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের এক বিরাট পদক্ষেপ ডাওয়েজ পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছিল।

জার্মানির উপর ইওরোপীয় দেশসমূহের আস্থা বৃদ্ধি—জার্মান জাতি নিজ ভাগ্য সম্পর্কে আশান্বিত

তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানিকে বিদেশী ঋণের দিকেই মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা না করিয়া জার্মানি আমেরিকা হইতে অধিকতর মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানি ১৮·২ মিলিয়ার্ড রাইক্ মার্ক ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল মাত্র ১০·৩ মিলিয়ার্ড রাইক্ মার্ক। সুতরাং পরের অর্থে পরের ঋণ শোধ করিয়া আরও কিছু নিজের কাজে ব্যয় করিবার সুযোগ জার্মানি গ্রহণ করিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনার অপর একটি ত্রুটি ছিল এই যে, উহা জার্মানির ক্ষতিপূরণের কিস্তি কোন্ বৎসর পর্যন্ত দিতে হইবে এবং মোট কি

ডাওয়েজ পরিকল্পনার কুফল: জার্মানিকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহ দান

পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইবে সেবিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। ফলে, ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ তখনও বলবৎ ছিল।* এমতাবস্থায় জার্মানি নিজ জাতীয় আয় হইতে ক্ষতিপূরণ শোধ করিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিদেশী ঋণের সাহায্যে তাহা করিতে অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী কর্তৃক রাইন অঞ্চল সম্পর্কেও জার্মানির অসন্তুষ্টি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

বিদেশী ঋণের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ দানের নীতি গ্রহণ

**ইয়ং কমিটি ও ইয়ং পরিকল্পনা ( The Young Committee & Young Plan ):** ডাওয়েজ পরিকল্পনা ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সমস্যা-সংক্রান্ত যে রেষারেষি দেখা দিয়াছিল তাহার উপশম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতে হয় নাই। জার্মানি কর্তৃক আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ মিটাইবার নীতি আমেরিকায় শীঘ্রই বিরোধিতার সৃষ্টি করিল। এদিকে ফ্রান্স আমেরিকা হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পরিশোধের বাৎসরিক কিস্তি দিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির সহিত ক্ষতিপূরণের অর্থের পাকাপাকি হিসাব করিতে চাহিল। জার্মানিও ডাওয়েজ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ধিত হারে বাৎসরিক ১২½ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার পূর্বে মিত্রশক্তিবর্গের অধিকার হইতে রাইন অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইতে চাহিল। এই সকল কারণে মিত্রশক্তিবর্গ 'ক্ষতিপূরণ সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত সমাধান'† করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া 'ইয়ং কমিটি' ( Young Committee ) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করিল। আওয়েন ইয়ং হইলেন ইহার সভাপতি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ং কমিটি তাঁহাদের সুপারিশ ও পরিকল্পনা পেশ করিলেন।

ইয়ং কমিটি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

আওয়েন ইয়ং কমিটি তাহাদের পরিকল্পনায় (১) জার্মানি কর্তৃক দেয়

*Vide Langsam : *The World Since 1919*, p. 62.

† *Ibid*, p. 62 "Complete and final settlement of the reparation problem."

মোট ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া* জার্মানিকে উহা মোট ৫৮½ বৎসরব্যাপী বাৎসরিক কিস্তিতে শোধ করিবার সুযোগ দান করিলেন। (২) এই পরিকল্পনায় ক্ষতিপূরণের অর্থকে অবশ্য দেয় এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দেয় ক্ষতিপূরণের দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এরূপ পরিস্থিতিতে স্থগিত রাখা চলিবে স্থির হইল। (৩) জার্মানি ক্ষতিপূরণের অর্থের একাংশ জার্মানিতে উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাও আর দশ বৎসর শোধ করিতে পারিবে একথাও ইয়ং পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত হয়। (৪) ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার ক্ষতিপূরণ কমিশন তথা কোন বিদেশীর হস্তে রাখা হইল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন ( Reparation Commission ) উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং উহার পরিবর্তে 'আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ ব্যাঙ্ক' ( Bank of International Settlement )-এর হস্তে ক্ষতিপূরণ আদায় প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করা হইল। জার্মানি ও জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ যে সকল দেশের পাইবার কথা ছিল সেগুলির প্রতিনিধি লইয়া এই ব্যাঙ্ক-এর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইল। (৫) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী অপসারিত হইবে এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই সেনাবাহিনীর ব্যয় জার্মানি বহন করিবে না, স্থির হইল। (৬) জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি-বর্গের কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সে বিষয় উত্থাপন করিতে হইবে এবং সেই বিচারালয় জার্মানিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেই তাহা করা চলিবে।

ইয়ং পরিকল্পনা

ইয়ং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ও উহা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ হেইগ ( Hague ) নামক স্থানে মিলিত হইলেন, কিন্তু কোন্ দেশ কি

---

* $ 8,032, 500,000 in place of the original reparation of $ 32,000,000,000, *Idem.*

হারে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবে একথা লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত সেই অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হেইগ্-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে ইয়ং পরিকল্পনা মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে Bank of International Settlement স্থাপিত হইল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী রাইন অঞ্চল হইতে অপসরণ করিল।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক ইয়ং পরিকল্পনা অনুমোদন

এদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আন্তর্জাতিক এবং প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক দারুণ মন্দা দেখা দিল। জার্মানির পক্ষে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। মিত্রশক্তিবর্গও আমেরিকা হইতে যুদ্ধের কালে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের আদায় না হইলে শোধ করিতে পারিল না। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি এক জটিল আকার ধারণ করিল। আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারেও মন্দা দেখা দিলে আমেরিকা জার্মানিকে আর অর্থ সাহায্য করিতে সক্ষম হইল না। জার্মানির অর্থ নৈতিক অবস্থা ক্রমেই দুর্দশার দিকে আগাইয়া চলিল। বিদেশী বণিকগণ জার্মানি হইতে তাহাদের মূলধন ও আমানত উঠাইয়া লইল। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ কর্তৃক ঘোষিত একাধিক জরুরী আইনও অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইল না। এমতাবস্থায় হিণ্ডেনবুর্গ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট হুভার এই আন্তর্জাতিক অর্থসংকট হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে মোট এক বৎসরের জন্য বিভিন্ন সরকারের পরস্পর ঋণশোধ স্থগিত থাকিবে এই ঘোষণা করিলেন। ইহা Hoover Moratorium নামে খ্যাত। জার্মানি অবশ্য দেয় ক্ষতিপূরণ Bank of International Settlement-এর নিকট দিবে, কিন্তু ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থগিত রাখা যাইতে পারে সেরূপ ক্ষতিপূরণ এক বৎসর দিতে হইবে না এরূপ ব্যবস্থা হইল। এবিষয় লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। ইংলণ্ড প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা সমর্থন করিল, কিন্তু ফ্রান্স উহা সমর্থন করিল না।

আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক মন্দা

'Hoover Moratorium'

এইরূপ পরিস্থিতিতে Bank of International Settlement-এর উপদেষ্টা কমিটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৯ই তারিখ ঘোষণা করিল যে, জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ (Reparations) দেওয়া অসম্ভব। জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়া যে সকল সরকার বিদেশী ঋণ শোধ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল তাহারা পরস্পর ঋণ নাকচ করিবার দাবি উত্থাপন করিল। বলা বাহুল্য ইহা আমেরিকার পক্ষেই সর্বাধিক ক্ষতির কারণ ছিল। যাহা হউক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হেরিয়ট (Herriot)-এর সনির্বন্ধতায় ল্যাসেন নামক স্থানে এক কন্‌ফারেন্সের (Lausanne Conference) সম্মুখে ক্ষতিপূরণ সমস্যা পুনর্বিবেচনার জন্য স্থাপন করা হইল।

জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানে অক্ষমতা

ল্যাসেন কন্‌ফারেন্স

এই সম্মেলনে মোট ১৫ কোটি পাউণ্ডের বিনিময়ে জার্মানির সমগ্র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নাকচ করা স্থির হইল। ইয়ং পরিকল্পনায় জার্মানির উপর যে মোট ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ধার্য করা হইয়াছিল উহার মাত্র ৩ শতাংশ পাইলেই মিত্রশক্তিবর্গ সন্তুষ্ট হইবে, একথাই ল্যাসেনের কন্‌ফারেন্সে স্থিরীকৃত হইল। এই ১৫ কোটি পাউণ্ড আবার নগদ না দিয়া শতকরা ৫% সুদে Bank of International Settlement-এর নিকট ঋণপত্র দিলেই চলিবে। বস্তুত, ল্যাসেন কন্‌ফারেন্সে জার্মানির ক্ষতিপূরণ নাকচ-ই হইয়া গেল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি আমেরিকাকে ফ্রান্সের দেয় ঋণের পরিমাণও অনুরূপ হ্রাস করা হইলে ল্যাসেন কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমেরিকা দেখিল যে, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের অক্ষমতার অজুহাতে ইওরোপীয় মিত্র-শক্তিবর্গ আমেরিকা হইতে গৃহীত ঋণ শোধ করিতে অনিচ্ছুক। ঐ বৎসর (১৯৩২) ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত ঋণ শোধের কিস্তি দিল না। পর বৎসর ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশও কেবল নামমাত্র পরিমাণ অর্থ কিস্তি দিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্বলতার কারণে আমেরিকা বিদেশী সরকারদের, বিশেষত যাহারা ঋণ শোধ করে নাই তাহাদের পক্ষে আমেরিকা হইতে

মিত্রশক্তিবর্গের আমেরিকা হইতে গৃহীত ঋণ শোধের সমস্যা

বিদেশী সরকার কর্তৃক আমেরিকার ঋণগ্রহণ নিষিদ্ধ

কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে, ঋণী দেশ মাত্রেই আমেরিকাকে আর কোন অর্থ শোধ করিল না। এদিকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এডল্‌ফ্ হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর পদ লাভ করিলে ল্যসেন কন্‌ফারেন্স কর্তৃক ধার্য ১৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণও জার্মানি আর দিতে রাজী হইল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দীর্ঘকালের চেষ্টা তথা বিভিন্ন কমিটি ও পরিকল্পনার মাধ্যমেও ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান হইল না।

ক্ষতিপূরণ সমাধানে অসাফল্য

ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিশালতা, জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক অব্যবস্থা, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের অনিচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। মিত্রশক্তিবর্গের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জার্মানি শোধ করিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক ঋণদানের ফলে জার্মানি বিদেশী ঋণের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। জার্মানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত ইওরোপীয় দেশগুলি আমেরিকাকে ঋণ শোধের প্রশ্ন জড়িত করিয়া সমগ্র যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে অত্যধিক জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এই জটিলতাও ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের বাধাস্বরূপ কাজ করিয়াছিল। সর্বশেষে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মতানৈক্য—যেমন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একাধিক বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা—জার্মানির প্রতি কোন একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাও ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানে অসাফল্যের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

অসাফল্যের কারণ

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## নিরাপত্তার সমস্যা ঃ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

## (Problem of Security : The League of Nations)

**আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা (The Need of International Security) ঃ** যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দারিদ্র্য ও দুর্দশা মানুষকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের উপায় হিসাবে যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া মানুষকে পুনরায় যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধের পর শান্তি, এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা সাময়িকভাবে মানুষের মনে শান্তিস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ (League of Nations) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর শান্তি—শান্তির পর যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার প্রথম চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) গঠনের মধ্যে। নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিয়া যে অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করিয়াছিল উহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় সেজন্য ইওরোপীয় কন্‌সার্ট গঠিত হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূলনীতি ছিল ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বজায় রাখা। এই সংস্থা প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলপূর্বক বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ে বাধা দান করা এবং কোন রাষ্ট্রই যাহাতে অপর কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ছিল ইওরোপীয় কন্‌সার্টের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য প্র-বিপ্লব যুগের

প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইওরোপীয় কন্‌সার্ট (Concert of Europe)

রাজনৈতিক অবস্থা যাহা ভিয়েনা সম্মেলন বলপূর্বক পুনঃস্থাপন করিয়াছিল উহা রক্ষা করিয়া চলিবার অর্থ-ই ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা। এই সকল ব্যবস্থা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার নামে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকাশ রুদ্ধ করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তব জগতের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলিয়াই পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) কোন প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের স্বীকৃতি আমরা দেখিতে পাই।

ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেস রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেইগ কন্‌ফারেন্স (Hague Conference) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরি-উক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তথাপি স্থায়ী শান্তি স্থাপনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলব্ধ হইতেছিল এই সকল চেষ্টার মধ্যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা

যাহা হউক, উপরি-উক্ত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা যে মূলত শক্তি-সাম্য-নীতি-ভিত্তিক ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নামে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল উহার মূলনীতি ছিল পূর্বগামী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মূলনীতি ছিল সমবেতভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা করা। শক্তি-সাম্য নীতির প্রাধান্য লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর গঠনতন্ত্র অথবা কার্যকলাপে পরিলক্ষিত

হয় না। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কন্সার্ট-অব-ইওরোপের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইতে উচ্চতর ও বহুলাংশে পৃথক ছিল। মানব ইতিহাসের সকল স্তরেই পশুশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই পশুশক্তি জগতের সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া আরও জটিলতর কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া থাকে। এই কারণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ মানুষের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

**লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ (The League of Nations):** মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আন্তর্জাতিক শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর সর্বশেষ শর্তটির* উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদির সহিত উহার গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র বা 'কভেনাণ্ট'(Covenant)-এর মূল সূত্র ছিল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি আন্তরিক এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। সমসাময়িক জনসাধারণের মনে এই আশা জাগিয়াছিল যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ আন্তর্জাতিক

মূল উদ্দেশ্য: আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা

* The High Contracting Parties :

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security.

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations.

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another. Agree to this Covenant of the League of Nations. *Preamble to the covenant of the League of Nations*, Langsam, p. 124.

শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানই শুধু করিবে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নূতন নেতৃত্ব ও সমবায়ের সূচনা করিবে।*

পরস্পর বিবাদে লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ

এই কভেনাণ্ট-এর দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য-দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর বিবাদ দেখা দেয় তাহা হইলে সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে এবং মধ্যস্থতার অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যে কোন-প্রকার সামরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন সদস্য-দেশ যদি লীগের কভেনাণ্ট উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করে তাহা হইলে অপরাপর সদস্য-দেশগুলি সেই যুদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার অর্থ নৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করিবে। প্রয়োজনবোধে সদস্য-দেশগুলি লীগের কভেনাণ্ট রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক নৌ এবং বিমান বহরের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

লীগের কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) ও একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) ছিল। এই দপ্তরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠন করা হইল। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর হইল এই আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সংগঠন

সাধারণ সভা লীগের কভেনাণ্টে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-দেশ তিনজন প্রতিনিধি সেই সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু সদস্য-দেশের একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের স্থায়ী সদস্য ছিল—গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স,

বিভিন্ন অংশের কার্যাদি

* Littlefield : *History of Europe Since 1815*, p. 196.

ইতালি ও জাপান। এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যান্য সদস্য-দেশ হইতে আরও চারজন সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কার্যনির্বাহক সভার ন্যায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লীগ ত্যাগ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিণ সরকার লীগ-অব-ন্যাশন্‌সে যোগদানের চুক্তি অনুমোদন না করায় আমেরিকা কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল।

**নিরাপত্তার সমস্যা ( Problem of Security ):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভের সাময়িক উল্লাস শেষ হইবামাত্র ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার দিকে মনোযোগী হইল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সাহায্য-সহায়তা ভিন্ন ফ্রান্স কয়েক সপ্তাহের অধিককাল জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না এই সত্যটি ফরাসী সরকার ভুলিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন জার্মানির তুলনায় ফ্রান্সের লোকবল, অর্থবল, সামরিক শক্তি ও কৌশল —সব কিছুই ছিল অকিঞ্চিৎকর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ( ১৮৭০, সেডানের যুদ্ধ ) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-পদক্ষেপে জার্মানি মধ্য-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সেডানের যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা প্রভৃতির ফলে জার্মানির প্রতি ফ্রান্সের ভীতি বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরও জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণের ভীতি ফ্রান্সের জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনেতৃবর্গের এক দুঃসহনীয় মানসিক অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণে যুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যাই ছিল

ফ্রান্সের জার্মান ভীতি

* "Twice within memory had the pounding of German military boots been heard on French soil, and the French were fearful of another incursion." Langsam (Seventh Edn.) p. 75.

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা।* এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের নিকট ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা প্রসারিত হউক এই দাবি করিয়াছিল। ফরাসী কূটনীতিকদের মতে ইহাই ছিল জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র বাস্তব এবং কার্যকরী ব্যবস্থা। কিন্তু রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারিত হইলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জার্মান ফ্রান্সের শাসনাধীন হইয়া পড়িবে এই কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর মিত্রশক্তি ফ্রান্সের এই দাবি স্বীকার করিল না। কিন্তু রাইন নদীর বামতীর অর্থাৎ ফ্রান্সের দিকের তীরটি পনর বৎসরের জন্য মিত্রশক্তির অধীনে স্থাপন করিতে মিত্রশক্তিবর্গ রাজী হইল। ইহা ভিন্ন এই অঞ্চলে এবং রাইন নদীর পূর্বতীরের কতকস্থানে কখনও কোনপ্রকার সামরিক ব্যবস্থা বা সৈন্য মোতায়েন করা হইবে না—অর্থাৎ এই অঞ্চলের স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ করা হইল। কিন্তু ইহাতেও ফ্রান্সের অস্বস্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হওয়ায় আমেরিকা ও ইংলণ্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সেনেট প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন সমর্থিত ভার্সাই-এর সন্ধি অনুমোদন না করিবার ফলে আমেরিকা কর্তৃক ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই বাতিল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিপূরক ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিও অকার্যকর হইয়া পড়িল। ফলে ফ্রান্সের হতাশার আর সীমা রহিল না। জার্মান আক্রমণের ভীতি ফ্রান্সকে একপ্রকার উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

নিরাপত্তার জন্য রাইন পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারণের দাবি

মিত্রশক্তিবর্গের অসম্মতি—বিকল্প ব্যবস্থা—রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক ১৫ বৎসরের জন্য অধিকার —রাইন অঞ্চলের নিরস্ত্রীকরণ

জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি : অকার্যকারিতা

রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারণ, ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক সাহায্যের

* "The most important and persistent single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security." Carr : *International Relations between the Two World Wars*, p. 25.

প্রতিশ্রুতি কোন কিছুই কার্যকরী না হওয়ায় ফ্রান্স লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র ( Covenant ) অনুসারে যতটুকু নিরাপত্তা দাবি করিতে পারিত তাহা ভিন্ন অধিক কোন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইল না।

লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার শর্ত

কিন্তু লীগের চুক্তিপত্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসাবে কতটুকু মূল্যবান সেবিষয়ে ফ্রান্স প্রথম হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর দশম শর্তে 'সম্মিলিত-ভাবে বা যুগ্ম আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার' ( Collective Security ) কথা বর্ণিত ছিল। এই শর্তানুসারে লীগের সকল সদস্য-রাষ্ট্র যুগ্মভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তা, প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষা করিবে এবং কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে কি উপায়ে এই সকল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।*

ফ্রান্স কর্তৃক ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যাত

এদিকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পয়েনকেয়ারি ( Poincare )-এর চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনবোধে ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্যদানে রাজী হইয়াছিলেন বটে (১৯২২), কিন্তু ঠিক কি ধরণের এবং কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া নিজ দায়িত্ব

---

* **League of Nations Covenant :**

*Article :* 10. "The members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and exsisting political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

16. (*a*) "......severance of all trade or financial relations, the prohibition of all financial, commercial or personal inter-course between the nationals of the covenant breaking state and the national of any other state, whether a Member of the League or not".

(*b*) "......to recommend......what effective military, naval or airforce the members of the League shall severally contribute to the armed forces to be raised to protect the Covenant of the League."

(*c*), (*d*)......" [ For details see Appendix ]

বাড়াইতে চাহিলেন না। ইহাতে অদূরদর্শী ফরাসী প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিশ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমতাবস্থায় লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর 'যুগ্ম নিরাপত্তার' শর্তটির উপরই ফ্রান্সকে নির্ভর করিতে হইল। লীগ চুক্তিপত্রের দশম শর্তটিকে কার্যকরী করিবার জন্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ, আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্যদান, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন করা প্রভৃতি নানা উপায় ষোড়শ শর্তে বর্ণিত ছিল। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগের চুক্তিপত্রে ১০ম ও ১৬শ শর্ত সম্পর্কে জেনিভাতে লীগের সাধারণ সভায় ( League Assembly ) আলোচনায় স্থির হয় যে, আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে কি ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা প্রত্যেক দেশের সরকার স্থির করিবেন। ফলে, লীগের চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট ১০ম ও ১৬শ শর্ত দুইটির আর কোন প্রকৃত মূল্য রহিল না। যুগ্ম নিরাপত্তার মূলভিত্তিই দুর্বল হইয়া পড়িল।

লীগ চুক্তিপত্রের ১০ম ও ১৬শ শর্তের ব্যাখ্যা—লীগের দুর্বলতা বৃদ্ধি

এদিকে ক্ষতিপূরণ কমিশন ( Reparation Commission ) জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া জার্মানিকে একথা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিল যে, জার্মানি যদি ক্ষতিপূরণ কমিশন নির্ধারিত ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণদানে স্বীকৃত না হয় এবং সেজন্য বাৎসরিক ১০ কোটি পাউণ্ড ও মোট রপ্তানি বাণিজ্যের ২৫ শতাংশ দিতে রাজী না হয় তাহা হইলে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানির শিল্প-প্রধান রুহ্‌র অঞ্চল দখল করিবে। এই সময় হইতেই ফ্রান্স রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। জার্মানির শিল্প-প্রধান রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিতে পারিলে একদিকে যেমন জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, পক্ষান্তরে জার্মানির দুর্বলতার অনুপাতে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাইবে। জার্মানির ক্ষতিপূরণদানে অক্ষমতাহেতু বিলম্বের অজুহাতে ফ্রান্স একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল যে, জার্মানি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণদানে বিলম্ব করিতেছে। এইজন্য ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে সৈন্য প্রেরণ করিয়া

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল

জার্মানির রুহ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল। এই অদূরদর্শী পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ন হইল। তদুপরি যে আশা লইয়া রুহ্র অঞ্চল অধিকার করা হইয়াছিল উহাও বিফলতায় পর্যবসিত হইল। রুহ্র অঞ্চল হইতে বলপূর্বক লব্ধ অর্থ দ্বারা সেই অঞ্চলে মোতায়েন ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যের ব্যয় সঙ্কুলানই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল।

রুহ্র দখলের অদূরদর্শিতা

রুহ্র অঞ্চল অধিকার যখন ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অদূরদর্শিতার এক চরম দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া পড়িল তখন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পয়েনকেয়ারির উপর ফরাসী জাতির আস্থা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ফলে তাঁহার স্থলে হেরিয়ট (Herriot) প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইংলণ্ডে সেই সময়ে শ্রমিকদল রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald)-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ডাওয়েজ কমিটিও ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিলে স্বভাবতই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কতক পরিমাণে শান্তভাব ধারণ করিল। ফ্রান্স পুনরায় যুগ্ম নিরাপত্তার দিকে মনোযোগী হইয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতে সচেষ্ট হইল। ইহার অব্যবহিত পূর্বে (১৯২৩) ফরাসী সরকারের চেষ্টায় পরস্পর সাহায্য-সহায়তার এক চুক্তির খস্‌ড়া (Draft Treaty of Mutual Assistance) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখিবার মধ্যেই ইওরোপ তথা ফ্রান্সের নিরাপত্তা নির্ভরশীল এই ধারণা ফরাসী সরকার মিত্রপক্ষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তির খস্‌ড়া রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। লীগের চুক্তিপত্র (Covenant) অনুযায়ী আঞ্চলিক মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে পরস্পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। 'পরস্পর সাহায্য-সহায়তা চুক্তি'র (Treaty of Mutual Assistance) খস্‌ড়ায় সেই আঞ্চলিক মৈত্রী কিরূপ হইতে পারে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এই খস্‌ড়ায় বলা হইল যে, কোন দেশের পক্ষে অপর কোন দেশ আক্রমণ করা আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া ধরা হইবে এবং এইরূপ আক্রমণের চারি

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা

দিনের মধ্যে আক্রমণকারী দেশ কোন্‌টি তাহা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর কাউন্সিল কর্তৃক ঘোষিত হইবে। ইহা ভিন্ন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের দায়িত্ব এই খস্‌ড়া যে-সকল দেশ স্বাক্ষর করিবে সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, এ-কথাও স্থির হইল। ইহা ভিন্ন যে গোলার্ধে আক্রমণাত্মক কার্য ঘটিবে উহার বাহিরের অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের কোন দায়িত্ব স্বাক্ষরকারী দেশের থাকিবে না এবং লীগ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে আঞ্চলিক নিরাপত্তার চুক্তি রাষ্ট্রবর্গ স্বাক্ষর করিতে পারিবে। সর্বশেষে এই খস্‌ড়ায় একথাও বলা হইল যে, এই খস্‌ড়া স্বাক্ষরের পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে হইবে। সামরিক শক্তি হ্রাস না করিলে কোন রাষ্ট্র 'পরস্পর সাহায্যের চুক্তি'র শর্তানুযায়ী সাহায্য পাইবে না। এই চুক্তির খস্‌ড়া আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। এমন কি, ফ্রান্সও এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হইল না, কারণ, এই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বেই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রশ্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত এই পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি (১৯২৩) বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

'পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি'র খস্‌ড়া (Draft Treaty of Mutual Assistance, 1923)

চুক্তির খস্‌ড়া প্রত্যাখ্যাত

**জেনিভা প্রোটোকোল, ১৯২৪ (Geneva Protocol, 1924) ঃ** লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভার (Assembly) পঞ্চম অধিবেশনে (১৯২৪ খ্রীঃ) Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes নামে একটি দলিল প্রস্তুত করা হইল। গ্রীস ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিদ্বয় এই দলিলটি রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণত এই দলিলটি 'জেনিভা প্রোটোকোল' (Geneva Protocol) নামেই পরিচিত। জেনিভা প্রোটোকোলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ' (International crime) বলিয়া অভিহিত করা হইল। এই

দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (১) পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। (২) আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত অথবা চুক্তির শর্তাদির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিরোধ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে, (৩) যে সকল বিবাদ বা বিরোধে কোন আইন বা ব্যাখার প্রশ্ন জড়িত থাকিবে না সেগুলি লীগের কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবে। (৪) লীগ কাউন্সিল যদি সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারে তাহা হইলে কাউন্সিল সালিশ ( Arbitrators ) নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর উহার বিচার ভার ন্যস্ত করিবে। এই সালিশদের সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। (৫) যে রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে অপর রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হইবে না বা লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অথবা লীগ কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত সালিশদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজী হইবে না, বা বিবাদটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় যুদ্ধ শুরু করিবে উহাকে 'আক্রমণকারী দেশ' ( Aggressor ) বলিয়া অভিহিত করা হইবে। (৬) লীগ কাউন্সিল আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করিতে পারিবে, লীগের চুক্তিপত্র ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে অথবা যে দেশ লীগের কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বিচারালয় অথবা সালিশদের সিদ্ধান্ত অমান্য করিবে সেই সকল দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন, বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজস্ব রাজ্য সীমা অথবা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধরত দেশকে সামরিক সাহায্য দান করিতে পারিবে। (৭) আক্রমণকারী দেশের উপর যুদ্ধ সৃষ্টির ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইবে, কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নির্ধারণ করা চলিবে না। (৮) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহূত হইবে জেনিভা প্রোটোকোল-এ এই শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। (৯) জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্তে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কেও লীগ কাউন্সিল বিচার-বিবেচনা করিতে পারিবে, একথাও সন্নিবিষ্ট হইল।

জেনিভা প্রোটো-কোলের ( Geneva Protocol ) শর্তাদি

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মাত্রেই জেনিভা প্রোটোকোল স্বাক্ষর করিতে আগ্রহান্বিত হইলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহার শর্তাদি আপত্তিকর বলিয়া মনে করিল, এবং

এই কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করিলে জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইল। কোন কোন লেখকের মতে ইংলণ্ডে লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ও সেই স্থলে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার গঠন জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির অন্যতম গুণ হইল এই যে, মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন করা হয় না। পররাষ্ট্র নীতির মূল ধারা অপরিবর্তিত রাখিয়া চলা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত নীতি। তথাপি লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন এবং নূতন রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক কার্যভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের মধ্যবর্তী কালে জেনিভা প্রোটোকোল-এর ত্রুটিসমূহ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হয়ত রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা উহা গ্রহণে প্রস্তুত হন নাই। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নসমূহ ছিল জেনিভা প্রোটোকোল-এর বিরোধী। কারণ এই প্রোটোকোল-এর একাদশ শর্তের বলে আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কেও এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে লীগ কাউন্সিলের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা চলিত। এই শর্তটি জাপানের চেষ্টায় জেনিভা প্রোটোকোলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ জাপানী আগন্তুকদিগকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্তানুসারে এই ধরণের সমস্যা জাপান লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে এই আশঙ্কা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি করিয়াছিল। তদুপরি আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য নীতির অনুকরণে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি বিশেষভাবে কানাডা ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ইচ্ছুক ছিল। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও ছিল প্রোটোকোলের ষোড়শ শর্তানুযায়ী সামরিক সাহায্য দানের বিরোধী। কারণ এই শর্তানুযায়ী সামরিক সাহায্য দানের দায়িত্ব এই সকল দেশের নিজস্ব উন্নয়নের পরিপন্থী হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিত। এই সকল কারণ ভিন্ন বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য

ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির বিরোধিতা

জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্তের ত্রুটি

সালিশীর যে ব্যবস্থা জেনিভা প্রোটোকোলে করা হইয়াছিল উহা বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে নাই। আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শাস্তিদানের নীতিও বিভিন্ন দেশে, প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, সমর্থন পায় নাই। এই সকল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বল্ডুইনের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হইলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অস্টেন চেম্বারলেন জেনিভা প্রোটোকোল ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন না একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন।* গ্রেটব্রিটেন কর্তৃক জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার অপমৃত্যু ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের যে শর্ত উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল উহারও কোন মূল্য রহিল না।

জেনিভা প্রোটো-কোলের অপমৃত্যু

জেনিভা প্রোটোকোল বাতিল হইয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমত, জেনিভা প্রোটোকোল লীগ চুক্তিপত্র ( Covenant )-এর কতকগুলি ত্রুটি দূর করিতে সচেষ্ট ছিল। লীগ চুক্তিপত্রে যে সকল শর্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে লীগ কাউন্সিলে মতানৈক্য ঘটিলে উহার কিভাবে মীমাংসা করা যাইবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না। জেনিভা প্রোটো-কোল এইরূপ পরিস্থিতিতে বিষয়টি সালিশীর জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং সালিশদের সিদ্ধান্ত বিবদমান রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরী হইবে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছিল। এইভাবে লীগ চুক্তিপত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি দূরীভূত হইয়াছিল।

জেনিভা প্রোটোকোলের গুণ : (১) লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটি সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরীভূত

দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সমস্যা-প্রসূত বিবাদ সম্পর্কে পরস্পর বিবদমান দেশ একাদশ শর্তানুযায়ী লীগ কাউন্সিলের বিচার-বিবেচনা প্রার্থনা করিতে পারিবে—এই ব্যবস্থার ফলে আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়া দুই দেশের বিবাদের মীমাংসার পথ জেনিভা প্রোটোকোলে করা হইয়াছিল।†

(২) আভ্যন্তরীণ সমস্যা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার ভার লীগ কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত

* Vide : Carr, pp. 91-92 ; Hardy, pp. 70-72.

† "The Covenant left the door open for war, not only in (Contd.)

তৃতীয়ত, জেনিভা প্রোটোকোল নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ( ১৫ই জুন, ১৯২৫ ) 'নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন' ( Disarmament Conference ) আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

(৩) নিরস্ত্রীকরণের জন্য সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা

(৪) 'আক্রমণের' (Aggression) সংজ্ঞা নির্দেশ

চতুর্থত, জেনিভা প্রোটোকোল 'আক্রমণ' ( Aggression ) বলিতে কি বুঝাইবে অর্থাৎ কিরূপ পরিস্থিতিতে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

কিন্তু জেনিভা প্রোটোকোল একেবারে ত্রুটিশূন্য ছিল না। লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সামরিক ব্যবস্থার যে নীতি বর্ণিত ছিল উহার কোন কার্যকরী রূপ বা ব্যবস্থা লীগ চুক্তিপত্রে উদ্ভাবিত হয় নাই। জেনিভা প্রোটোকোলের ত্রয়োদশ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে কি কি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র কি পরিমাণ সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনী দিয়া সাহায্য করিবে সে সম্পর্কে লীগ কাউন্সিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবে এ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু কোন দেশকে লীগ কাউন্সিল 'আক্রমণকারী দেশ' ( Aggressor ) বলিয়া ঘোষণা করিবামাত্র উহার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। বস্তুত, লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তটি পূর্ববৎই দুর্বল রহিয়া গিয়াছিল। জেনিভা প্রোটোকোল বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের বিবেচনার অধিকার লীগ কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিয়া

cases when the Council, voting without the parties, failed to pronounce an unanimous judgment on a dispute, but also in cases where the subject of the dispute was ruled to be a matter within the domestic jurisdiction of one of the parties. The Protocol sought to close these two *gaps*." Carr, p. 90.

রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। ইহাও এই প্রোটোকোলের ত্রুটি হিসাবে বিবেচ্য। ইহা ভিন্ন জেনিভা প্রোটোকোল ফ্রান্সের সনির্বন্ধতায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়া নানা ত্রুটিপূর্ণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তির সংরক্ষণের উপরই আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভরশীল এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির কোন শর্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন যাহাতে লীগ কাউন্সিলে উপস্থাপিত না হইতে পারে সেজন্য ফ্রান্স এই ধরণের পরিবর্তন 'আন্তর্জাতিক বিবাদ'-এর পর্যায়ভুক্ত হইবে না একথা জেনিভা প্রোটোকোলে সন্নিবিষ্ট করাইয়া লইয়াছিল। ফলে, প্যারিসের শান্তি-চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া জেনিভা প্রোটোকোল লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। যাহা হউক ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়নগুলির বিরোধিতার ফলে জেনিভা প্রোটোকোল অকার্যকর হইয়া গেল।

জেনিভা প্রোটোকোলের ত্রুটি

**লোকার্ণো চুক্তিসমূহ (Locarno Treaties)ঃ** জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যাত হইলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা পুনরায় ফরাসী সরকারের ভীতি ও অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ইংলণ্ডের অসম্মতির ফলেই প্রধানত জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এজন্য স্বভাবতই ফরাসী সরকারের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকারই দায়ী ছিলেন। ফ্রান্সের নিরাপত্তার ব্যবস্থার উপায় ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাইন অঞ্চল সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিদান করা। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতিদানে প্রস্তুত হইবেন না এ কথাও ফরাসী সরকারের অবিদিত ছিল না। সুতরাং ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার অন্য পন্থা খুঁজিতে লাগিল। এদিকে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যে পরস্পর সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল উহার উপশমের উদ্দেশ্যে* ১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত পরস্পর যুদ্ধ-নিরোধ চুক্তি সম্পাদনের, পরস্পর রাজ্যসীমা অপরিবর্তিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দানের

ফ্রান্স কর্তৃক পুনরায় নিরাপত্তার অন্য উপায় অন্বেষণ

*Vide : Langsam p. 80.

এবং পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশ নিয়োগের জন্য যথাযথ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব জার্মানি উত্থাপন করিয়াছিল। একাধিকবার এই প্রকার প্রস্তাব জার্মানি করিয়াছিল কিন্তু ফ্রান্স এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করিলে স্বভাবতই এই ব্যাপারে কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইলে জার্মান প্রধান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্ট্রেসিম্যান্ পুনরায় পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির প্রশ্ন ফরাসী সরকারের নিকট উত্থাপন করিলেন। এবার ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশ-ই জার্মানির প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। ফরাসী সরকারের ইচ্ছানুক্রমে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইতালিকে এই বিষয়ে আলোচনা কালে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোকার্ণো নামক স্থানে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উপরি-উক্ত সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে সমবেত সকল দেশের প্রতিনিধিই সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার লাভ করিবার ফলে সম্মেলনের আলাপ-আলোচনায় এক অভূতপূর্ব সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লোকার্ণো সম্মেলনেই সর্বপ্রথম বিজিত ও বিজেতার মধ্যে সম-মর্যাদা, সম-অধিকার ও সৌহার্দ্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। এই পরিবর্তিত মনোবৃত্তি 'Locarno Spirit' নামে অভিহিত। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি ও বেলজিয়াম এক 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি চুক্তি' (Treaty of Mutual Guarantees) স্বাক্ষর করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পৃথকভাবে এক একটি করিয়া মোট চারিটি সালিশী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের সহিত পৃথকভাবে পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার পরস্পর প্রতিশ্রুতি সম্বলিত (Treaties of Guarantee) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই

লোকার্ণো চুক্তিসমূহ : (১) জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির মধ্যে 'পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি' (Treaty of Mutual Guarantee), (২-৫) জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও চেকো-স্লোভাকিয়া, জার্মানি ও পোল্যাণ্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে পরস্পর বিবাদে সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসার চুক্তি (Arbitration and Conciliation treaties), (৬-৭) ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি (Treaties of Guarantee)

মোট সাতটি চুক্তি একত্রে 'লোকার্ণো চুক্তিসমূহ' বা Locarno Treaties or Pacts নামে পরিচিত।

উপরি-উক্ত চুক্তিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল জার্মানি এবং ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পৃথক পৃথক এবং সমবেতভাবে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী পরস্পর রাজ্যসীমা যাহাতে অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অনুসারে বেলজিয়াম ও জার্মানির এবং ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী যে সীমারেখা নির্ধারিত হইয়াছিল উহা যাহাতে বজায় থাকে (Status Quo) সেজন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। ইহা ভিন্ন জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কেবলমাত্র (১) দেশরক্ষা, (২) লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর আদেশ পালনের জন্য এবং (৩) রাইন অঞ্চলের বেসামরিকীকরণের (demilitarization) অন্যথা ঘটিলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে নতুবা নহে—এই প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই সকল পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে কোনটি যদি অন্যায়ভাবে অর্থাৎ এই চুক্তির শর্তবহির্ভূতভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অপরাপর স্বাক্ষরকারী দেশ উহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য থাকিবে। কোন ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলে লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চাওয়া হইবে। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য করা হইল এবং জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্যভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকার্ণো চুক্তি বলবৎ হইবে স্থির হইল।

(১) নং চুক্তির শর্তাদি

বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানির যে সালিশী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই চুক্তির শর্তানুসারে এই সকল দেশ পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ যদি কূটনৈতিক উপায়ে মিটাইতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে সে বিবাদ কোন সালিশী সংস্থা অথবা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে স্থির হইল। লোকার্ণো চুক্তির পূর্বেকার বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে

(২—৫) নং চুক্তির শর্তাদি

না। স্বভাবতই পোল্যাণ্ডের করিডোর (Polish Corridor) সংক্রান্ত বিবাদ এই চুক্তির আওতায় পড়িল না।

ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উহার শর্তানুসারে স্থির হইয়াছিল যে, লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গকারী কোন দেশ কর্তৃক ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড কিংবা চেকোস্লোভাকিয়ার কোনপ্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

(৬—৭) নং চুক্তির শর্তাদি

লোকার্ণো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল বলিয়া সাধারণত বলা হইয়া থাকে। বস্তুত, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ইহাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এই চুক্তি পরাজিত জার্মানিকে বিজয়ী শক্তিবর্গের সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া এবং জার্মানি ও ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ডাওয়েজ কমিটি কর্তৃক জার্মানির প্রতি যে উদারতা প্রদর্শনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল উহারই অনুসরণ করিয়াছিল। জার্মানি পুনরায় ইওরোপীয় শক্তিসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। লোকার্ণো চুক্তি ফরাসী নিরাপত্তার সমস্যা, জার্মানির হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সমস্যা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার আগ্রহ এই তিনটি সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের দিক হইতে বিচার করিলে লোকার্ণো চুক্তি ব্রিটিশ সরকারকে ফরাসী-জার্মান শক্তিদ্বয়ের নিয়ন্তার পদে স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় শক্তি-সাম্যের চাবিকাঠি ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল। এজন্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অস্টেন চেম্বারলেন বলিয়াছিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুগের অবসান ঘটাইয়া শান্তির যুগের সূচনা করিয়াছিল। ফলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির কঠোরতা এবং রুহ্‌র অঞ্চল দখলের ফলে জার্মান জাতির মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া কতকটা সোহার্দ্যমূলক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল।

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণা

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করা হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে

লোকার্ণো চুক্তি অথবা লোকার্ণো সম্মেলনে যে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা (Locarno Spirit) শান্তি রক্ষার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। লোকার্ণো চুক্তির শর্তানুসারে একথা বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স যেমন রাইন অঞ্চলের উপর সংরক্ষণের দাবি ত্যাগ করিয়াছিল তেমনি জার্মানিও আলসেস্-লোরেনের উপর অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানির পূর্বদিকের সীমা সম্পর্কে ইংলণ্ড কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেমন হয় নাই, জার্মানিও তেমনি ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি দ্বারা নির্ধারিত পূর্ব-সীমারেখা যে মানিয়া লয় নাই তাহা লোকার্ণো চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এজন্য ফ্রান্সকে এককভাবে পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত পরস্পর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

লোকার্ণো চুক্তির ত্রুটিসমূহ :

জার্মানির পূর্বসীমা সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব

লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল সেরূপ সৌহার্দ্যের মনোবৃত্তি পরবর্তী যুগে তেমন প্রদর্শিত হয় নাই। অবশ্য এই মনোবৃত্তি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি (Kellog-Briand Pact or Pact of Paris) পর্যন্ত অল্প-বিস্তর টিকিয়াছিল। কিন্তু Locarno Spirit যে প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতাশূন্য ছিল তাহা ক্লীমেন্‌শোর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির এক অতি দুর্বল ব্যবস্থা মাত্র। ভাবাবেগপূর্ণ মনকে লোকার্ণো চুক্তি সম্মোহিত করিতে পারিলেও ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া এই চুক্তি ক্ষতিকারক।* স্বভাবতই ফ্রান্স যে নিরাপত্তার উপায় অন্বেষণে সচেষ্ট ছিল তাহা লোকার্ণো চুক্তিতে সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

ফরাসী নিরাপত্তার চেষ্টা আংশিক সফল

---

*"The Locarno Pact offers a fragile appearance of a guarantee. It is an illusion which will delude facile minds and put vigilance to sleep. The spirit of Locarno itself a threat to the interest of our country" *Clemenceau.*

লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ডের উপর যে সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ মাত্রায় ছিল একথা বলা চলে না। কারণ, গণতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ব্যাপারে জনমতের প্রভাব নেহাৎ কম নহে। লোকার্ণো চুক্তির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সামরিক সাহায্য দান ব্যাপারে ব্রিটিশ জনমত যে বিরোধী হইবে না উহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে* ব্রিটিশ সরকার কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য বাস্তবক্ষেত্রে দিতে পারিতেন সেই প্রশ্নের কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ কেবলমাত্র ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আছে একথাই আক্রমণকারী দেশের ভীতির সঞ্চার করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সুতরাং লোকার্ণো চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া কোন দেশই ব্রিটিশ শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। কিন্তু এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে সমর্থন করা যায় না। বস্তুত, লোকার্ণো চুক্তি গ্রহণে এবং জার্মানিকে বিজেতাদের সমপর্যায়ে পুনঃস্থাপনের পশ্চাতে অন্য গুরুতর প্রশ্ন জড়িত ছিল।

লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ডের সামরিক দায়িত্ব

ব্রিটিশ সরকার একথা-ই বুঝিয়াছিলেন যে, জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের ঐক্যবদ্ধতা জার্মানিকে ক্রমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবে। ইতিপূর্বে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে র‍্যাপ্যালো (Rapallo)-এর চুক্তি এই ভীতির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের নিকট সাম্যবাদ ও জার্মানি—এই দুইয়ের মধ্যে সাম্যবাদ ছিল অধিকতর ভীতিপ্রদ। এইজন্যই ইংলণ্ড লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া বিশাল সামরিক দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রুশ ভীতিতে লোকার্ণো চুক্তির মূল তাৎপর্য নিহিত

---

* "A democracy can hardly resort to war without the support of national opinion. It is still more probable that in such a case public opinion would be hopelessly divided on the merits. So long, however, as British intervention was feared by the potential aggressors of both sides, it seemed unlikely that the reality of the Pact would be put to the test." Hardy. p. 76.

লোকার্ণো চুক্তি লীগ চুক্তিপত্রের ( League Covenant ) দুর্বলতাও প্রমাণ করিয়াছিল। কারণ, লীগ চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও লোকার্ণো চুক্তিতে পুনরায় পরস্পর সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সুতরাং লীগ চুক্তিপত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পর সামরিক সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর না করিলে কোন রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সাহায্য দানে বাধ্য নহে, এই ধারণাই লোকার্ণো চুক্তি হইতে জন্মিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভার্সাই-এর চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষিত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পুনরায় লোকার্ণো চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার ফলে এ কথাই প্রতীত হইল যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বেচ্ছাধীনভাবে পরস্পর প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ না হইলে ভার্সাই-এর চুক্তি তথা এই ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তি তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইবে না। দশ বৎসর পর যখন জার্মানি ভার্সাই-এর শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই জার্মানির বিরোধিতা করে নাই। ফলে, লোকার্ণো চুক্তি একদিকে যেমন ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির আন্তর্জাতিক প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল অপর দিকে উহা তেমনি লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।*

ভার্সাই-এর চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকার্ণো চুক্তিতে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে

* "In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Covenant. It encouraged both the view that the Versailles Treaty, unless confirmed by other engagements of a voluntary character lacked binding force, and the view that governments could not be expected to take military action in defence of frontiers in which themselves were not directly interested. Ten years later, nearly all governments appeared to be acting on these assumptions." Carr : p. 97. Also read p. 96.

কোন কিছু উল্লিখিত হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে উহা জেনিভা প্রোটোকোল অপেক্ষা বহু পশ্চাতে ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তা নীতিও লোকার্ণো চুক্তিতে সমর্থিত হয় নাই।

নিরস্ত্রীকরণ নীতি উপেক্ষিত

সর্বশেষে, লোকার্ণো চুক্তিদ্বারা একমাত্র জার্মানির স্বার্থই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই চুক্তি জার্মানিকে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের সম-মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তিতে জার্মানির যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছিল। আবার জার্মানির পূর্বসীমা সম্পর্কে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে এই সীমারেখা লঙ্ঘন করিবার নৈতিক দাবি জার্মানির আছে একথাই পরোক্ষভাবে ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই চুক্তির পর রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী অপসারণও দ্রুততর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই চুক্তি ফ্রান্সের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে নাই। এই কারণেই ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে 'ম্যাজিনো লাইন' ( Maginot Line ) নামক সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

জার্মান স্বার্থবৃদ্ধি

**কেলগ্‌-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি ( Kellog-Briand Pact or Pact of Paris ) ঃ** 'লোকার্ণো স্পিরিট' ( Locarno Spirit ) পূর্ণমাত্রায় বজায় না থাকিলেও লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রধানত আমেরিকা ও ফ্রান্সের চেষ্টায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কেলগ্‌-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফরাসী বদান্যতার প্রকাশস্বরূপ ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াণ্ড আমেরিকার সহিত যুদ্ধ-নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করিবার প্রস্তাব করেন ( ৬ই এপ্রিল, ১৯২৭ )। সেই সময়ে আমেরিকায় যুদ্ধ-নিরোধ সম্পর্কে এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতই ব্রিয়াণ্ডের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাগ্রহে গৃহীত হইল। কিন্তু মার্কিন সেক্রেটারী কেলগ্‌ পাল্টা প্রস্তাব করিলেন যে, যুদ্ধ-নিরোধ কেবলমাত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হইয়া অপরাপর শক্তিবর্গের

কেলগ্‌-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির পটভূমিকা

সহিত যুগ্মভাবে স্বাক্ষরিত হওয়া-ই বাঞ্ছনীয়। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি ইতিপূর্বেই যুদ্ধ-নিরোধের প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিশ্রুত ছিল। স্বভাবতই অপরাপর রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইল না। ফলস্বরূপ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। প্রথমে মোট পনরটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিলেও চারি বৎসরের মধ্যে উহার স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৬২তে দাঁড়াইল।

৬২টি রাষ্ট্র কর্তৃক কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত

আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রগুলির মধ্যে কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি ছিল সর্বাপেক্ষা স্বল্প-পরিসর। প্রথমে উহার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া একটি প্রস্তাবনা এবং উহার সহিত মোট তিনটি ধারা সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রস্তাবনায় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ পৃথিবীর জনসাধারণের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে চিরস্থায়ী মিত্রতা বৃদ্ধি, পরস্পর রাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারণে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ এবং পৃথিবীর সভ্য জনসমাজকে যুদ্ধ-নিরোধের নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া—প্রভৃতি কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইল।

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির প্রস্তাবনা

প্রথম ধারায় স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে বা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যুদ্ধ-বিগ্রহ অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা বলিয়া বর্ণনা করিল এবং প্রত্যেকে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণে এবং সমস্যা সমাধানে যুদ্ধ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইল।

যুদ্ধ-নিরোধ

দ্বিতীয় ধারায় বলা হইল যে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর সর্বপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করিবে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা

তৃতীয় ধারা অনুসারে স্থির হইল যে, এই চুক্তিপত্র অপরাপর রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

অপরাপর রাষ্ট্রকে চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগদান

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পন্থা বন্ধ হইয়াছিল সেকথা বলা চলে না।

প্রথমত, নিজ দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ অথবা লীগ কাউন্সিলের নির্দেশ অনুসারে —অর্থাৎ লীগ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী যুদ্ধ, কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তিভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উপনিবেশ ও বিশেষ স্বার্থরক্ষার্থ যুদ্ধ, পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি-প্রসূত দায়িত্ব পালনের জন্য যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তিদ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় নাই। সুতরাং কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল বলা যায় না; কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধই এই চুক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির সমালোচনা ঃ বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধ চুক্তির বহির্ভূত

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির অপর ত্রুটি ছিল এই যে, ইহার নীতি বা শর্তাদি কিভাবে কার্যকরী করা হইবে সেই ব্যবস্থা ইহাতে করা হয় নাই। এই চুক্তি জনমতের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির নৈতিক জ্ঞানের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, জনমতের চাপে এবং নৈতিক জ্ঞানের প্রভাবে আক্রমণকারী দেশ শেষ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক কার্য হইতে বিরত হইবে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপানের বিবাদের কালে একথা স্পষ্ট-ভাবেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি অনুসারে আক্রমণকারী দেশের শাস্তিবিধানের জন্য কার্যকরী বাস্তব ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

চুক্তি কার্যকরী করিবার বাস্তব ব্যবস্থার অভাব

এই চুক্তির অপর ত্রুটি ছিল এই যে, ইহা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া আক্রমণাত্মক কার্যাদির ( Acts short of war ) বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। ফলে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর অ-ঘোষিত যুদ্ধ ( undeclared war ) অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যুদ্ধ শুরু করিবার রীতি অনুসৃত হইতে থাকে। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে এই চুক্তি যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। যুদ্ধ ঘৃণ্য কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং 'যুদ্ধ-নিরোধ' ইহাতে হইয়াছে বলা যায় না। যে-সকল রাষ্ট্র নিজে ছিল শান্তিকামী সেগুলিও প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান ছিল না।

অ-ঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার অভাব

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। লীগ চুক্তিপত্র সর্বপ্রকার যুদ্ধই রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি নানাপ্রকার যুদ্ধকে ইহার বহির্ভূত রাখিয়া নানা অজুহাতে যুদ্ধ-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলিতে কি বুঝায় তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিয়া যে-কোন কারণে আরব্ধ যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলিয়া চালাইবার কোন অসুবিধা ইহাতে ছিল না।

লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হিসাবে যুদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রুতিদান এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি এক নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যুদ্ধকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাশিয়া, আমেরিকার ন্যায় বিশাল দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ছিল। লীগের সদস্য না হইয়াও এই দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কার্যে যোগদান পৃথিবীর শান্তি রক্ষার কার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তিতে পৃথিবীর জনসাধারণ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কতদূর ব্যাকুল তাহাও প্রকটিত হইয়াছিল। ইহা স্বভাবতই আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির গুণ

**নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Problem of Disarmament)** : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সহিত সরাসরিভাবে জড়িত, বলা বাহুল্য। স্বভাবতই উইল্‌সনের যে চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র বা Covenant রচিত হইয়াছিল উহার চতুর্থ শর্তে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজসরঞ্জাম ন্যূনতম পরিমাণে নামাইয়া আনিতে হইবে একথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল।* লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তে† এই

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

* "Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety." *Art. 4. Wilson's Fourteen Points.*

† See *Appendix.*

নীতি গৃহীত হইয়াছিল এবং একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইবে একথা লীগ চুক্তিপত্রের নবম শর্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।* সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব ও চেষ্টা লীগ কাউন্সিলের উপরই ন্যস্ত ছিল।

লীগের মাধ্যমে ও লীগ বহির্ভূতভাবে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রী-করণের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু লীগের বাহিরেও নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একাধিকবার বিভিন্ন রাষ্ট্র করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে কেবল-মাত্র লীগের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আলোচনা করা হইবে।

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য, বলা বাহুল্য। কারণ, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ও সামরিক সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা শুরু হইলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি হয়। এই ভীতি সকলের মনে নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে, ফলে, রাষ্ট্রজোট গঠন এবং শেষ পর্যন্ত 'যুদ্ধের সৃষ্টি' প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতা যুদ্ধের পূর্বচ্ছায়া স্বরূপ।

নিরাপত্তা ও মানবতার দিক্ হইতে নিরস্ত্রীকরণের যৌক্তিকতা

মানবতার দিক হইতে বিচার করিলেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের যুক্তি রহিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের তথা যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি বেসমারিক উন্নয়নের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাসের উপরই অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যে অর্থ নৈতিক মন্দা সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তখনও বিভিন্ন দেশের সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের উর্ধ্বে সামরিক সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধিকে স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান কেবল সুযৌক্তিকই নহে, অপরিহার্যও বটে।

লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম এবং নবম শর্তের নির্দেশানুসারে লীগ কাউন্সিল লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য দেখা গিয়াছিল

---

* See *Appendix.*

উহার সুযোগ লইয়া নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তুতির জন্য একটি কমিশন (Preparatory Commission or Disarmament) নিযুক্ত করিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জেনিভা শহরে এই প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশন শুরু হইলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে এই কমিশনের আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ খসড়া উত্থাপিত হইল। এই দুইয়ের মধ্যে এবং সদস্যবর্গের আলাপ-আলোচনায় মতানৈক্য এমনভাবে প্রকট হইয়া উঠিল যে, নিরস্ত্রীকরণের মূল প্রশ্নটিই সকলে ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ভীতি, বিদ্বেষ, পরস্পর স্বার্থ প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) প্রধানত তিনটি অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। পদাতিক সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিবার ব্যাপারে সকলে একমত হইলেও প্রকৃত সৈনিক (Effectives) বলিতে কাহাদের বুঝাইবে সেবিষয় লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। ফ্রান্স এবং অপরাপর যে-সকল দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের রীতি চালু ছিল সেই সকল দেশ 'সৈনিক' সংখ্যার হিসাব হইতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ যাহারা স্থায়ী সৈনিকের কাজ করে না তাহাদিগকে বাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ সৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে এই ধরণের ব্যক্তিদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিল।

প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission)

নৌবাহিনী হ্রাসের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রত্যেক দেশের নৌবাহিনীর মোট বহনক্ষমতা কত টন হইবে (Tonnage) তাহা স্থির করিবার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জাহাজের পৃথক্ পৃথক্ভাবে বহনক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত মোট Tonnage-এর পরিমাণ ঠিক রাখিয়া যে-কোন পর্যায়ের জাহাজের জন্য কোন বাঁধাধরা Tonnage স্থির না করিবার পক্ষপাতী ছিল। বিভিন্ন দেশ নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শনের জন্য ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল, কারণ, সকল দেশের প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের মধ্যেই ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা নিহিত বলিয়া মনে করিত। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি

সমবেত সদস্যদের মতানৈক্য

আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী নিয়োগের দাবিও করিয়াছিল। কিন্তু অপরাপর দেশ কোন প্রকার পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের বা পুলিশবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী ছিল না। প্রত্যেক দেশের সততার উপরই নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব তাহারা ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল।*

উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ে মতানৈক্য ভিন্ন অপরাপর অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অনুরূপ মতানৈক্য দেখা দিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অস্ত্রশস্ত্র' ( Armament ) বলিতে কি বুঝাইবে তাহা লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত ইহা নির্ধারণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইল। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের সামরিক বাজেট হ্রাস করিবার প্রশ্ন উঠিলে আমেরিকা উহার বিরোধিতা করিল। কারণ, মোট সৈন্যসংখ্যা নির্ধারিত হইলে পর উহাদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে সেবিষয়ে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করাই উচিত, এই ছিল আমেরিকার অভিমত। জার্মানি ও ইতালি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির রদ-বদল দাবি করিল, কারণ, তাহাদের মতে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নের সহিত ভার্সাই-এর সন্ধির পরিবর্তন ছিল সরাসরিভাবে জড়িত। কিন্তু পোল্যাণ্ড, চোকোস্লো-ভাকিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি যে দেশগুলির স্বার্থের পক্ষে ভার্সাই-এর চুক্তি অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজনীয় ছিল সেই সকল দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। এইভাবে প্রস্তুতি কমিশনের কার্য প্রতিপদেই ব্যাহত হইতে লাগিল। জার্মানি নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রত্যেক পর্যায়ের অস্ত্রশস্ত্র কোন্ দেশ কি পরিমাণ রাখিতে পারিবে তাহা নির্ধারিত করা হউক দাবি করিলে অপরাপর দেশ উহার বিরোধিতা করিল। এমতাবস্থায় রুশ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্ প্রত্যেক দেশই অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকৃত হউক এই প্রস্তাব করিলেন। স্বভাবতই এই প্রস্তাবের আর তেমন গুরুত্ব রহিল না।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন

রুশ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব

এইভাবে প্রস্তুতি কমিশনের সদস্যগণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন ও উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মূল নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কিছু করিতে

* Vide Langsam, pp. 84-86.

সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সদস্যগণ মোটামুটি একমত এবং যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল সেগুলি একটি দলিলে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রস্তুতি কমিশন তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিলেন (১৯২৭)। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় প্রস্তুতি কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল সেগুলির কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা তাহাই ছিল প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য। এদিকে ঐ সময়ে লীগ-অব-ন্যাশন্স্‌-এর বাহিরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেজন্য লণ্ডনে একটি নৌবাহিনী-সংক্রান্ত কনফারেন্স (Naval Conference) আহূত হইয়াছিল। প্রস্তুতি কমিশন এই কনফারেন্সের ফলাফল কি হয় তাহা দেখিয়া পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি এই কনফারেন্সে গৃহীত শর্তাদি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান উহার শর্তাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও চুক্তিটি অকার্যকর হইয়া পড়িল। এই সময়ে প্রস্তুতি কমিশন পুনরায় তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একটি দলিলের খস্‌ড়া (Draft Convention) প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এই খস্‌ড়ায় কোন সর্ববাদিসম্মত নীতি বা পন্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন দেশের সদস্যবর্গের মতানৈক্য পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়া গেল। যাহা হউক, প্রস্তুতি কমিশনের একপ্রকার অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনিভা শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) আহ্বান করিল।

প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তি-স্বরূপ দলিলের খস্‌ড়া রচনা

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। মোট ৬১টি* দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে

* "The conference was attended by representatives of sixty one states including five non-members of the League of Nations." Carr, p. 183.

"When the Geneva Conference opened there were present representatives from about sixty states." Langsam, p, 88.

উপস্থিত হইলেন। প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক গৃহীত চুক্তি বা দলিলের খসড়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। এই দলিলে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা হইবে উহার বিবরণ থাকিলেও কি পদ্ধতিতে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা যাইতে পারে সেবিষয়ে কোন নির্দেশ ছিল না।* স্বভাবতই নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে প্রস্তুতি কমিশনের কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। তাঁহারা পদাতিক সৈন্য, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী হ্রাস করিবার এবং একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠনের উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি উত্থাপিত হইলে সম্মেলনের সদস্যবর্গকে সর্বাধিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সের প্রতিনিধি জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া নিজ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হইলেন না। এজন্য তিনি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের আদেশাধীন পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন। পক্ষান্তরে জার্মানি ফ্রান্সের সমপর্যায়ের সামরিক শক্তি অর্থাৎ সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি জানাইল। এইভাবে প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিল। জার্মানি এককভাবে নিরস্ত্রীকৃত থাকিবে, ইহা জার্মান জাতি কোনভাবেই মানিয়া লইবে না—এই সংকল্প জার্মান প্রতিনিধির দাবিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার সূচনা করিল। ফরাসী-জার্মান বিরোধ ভিন্ন আরও নানাপ্রকারের জটিলতাও দেখা দিল। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি কোন কোন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বিশাল আকৃতির কামান, ডুবো-জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম হিসাবে

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন—২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর নিরাপত্তা রক্ষার দাবি

ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব

* "It was a *skeleton lacking flesh and blood.*" Vide Langsam, p. 88.

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হইল। অতঃপর তিনটি পৃথক কমিশনের উপর এই সকল প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহাদের সুপারিশ নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্স-এর নিকট পেশ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। ফরাসী প্রতিনিধির মতে কেবলমাত্র বিশালাকৃতির ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর সবকিছুই ছিল আত্মরক্ষা-মূলক অস্ত্র-শস্ত্র। বিশালাকৃতি ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। জার্মান প্রতিনিধি যুক্তি দেখাইলেন যে, ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামই আক্রমণাত্মক এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সেগুলির নিষিদ্ধকরণ প্রয়োজন। বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে অবশ্য কোন দ্বিমত ছিল না এবং উহা নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন সেকথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করিবার কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত তিনটি কমিশন কেবলমাত্র বিষাক্ত গ্যাস, বিমান আক্রমণ ও বিশালাকৃতির ট্যাঙ্ক সম্পর্কে সর্ব-বাদিসম্মত সুপারিশ পেশ করিতে সমর্থ হইলেন। বিষাক্ত গ্যাস, উৎপাদনে কোন বাধা না থাকিলেও উহা যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না, বৃহদাকৃতির ট্যাঙ্ক (বিশালাকৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহা অবশ্য বলা হইল না) ব্যবহার করা চলিবে না, বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করা চলিবে না এবং প্রত্যেক দেশের বিমান সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, বেসামরিক বিমান চলাচলও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই কয়টি ধারাসম্বলিত একটি প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের নিকট উপস্থাপন করা হইল (২০শে জুন, ১৯৩২)। মোট ৪১টি দেশ এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিল, জার্মানি ও রাশিয়া উহার বিরোধিতা করিল, ইতালিসহ মোট আটটি দেশের প্রতিনিধি নিরপেক্ষ রহিলেন। জার্মান প্রতিনিধি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না যে, ভার্সাই-এর চুক্তি অনুসারে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র ও

তিনটি কমিশনের উপর ব্রিটিশ প্রস্তাব বিবেচনার ভার অর্পণ

ফ্রান্সের বিরোধিতা

বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে কমিশনের মতৈক্য—অপরাপর বিষয়ে অনৈক্য

কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব

জার্মানি ও রাশিয়ার বিরোধিতা

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া যে পর্যায়ে আনা হইয়াছিল, অপরাপর দেশকেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়া অনুরূপ পর্যায়ে আসিতে হইবে নতুবা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ব্যাপারে জার্মানিকে অপরাপর ইওরোপীয় দেশের সহিত সম-অধিকার দিতে হইবে, অর্থাৎ জার্মানিকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইবার অধিকার দিতে হইবে। এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই যখন কোনপ্রকার সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না তখন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সাময়িক কালের জন্য মুলতুবী রাখা হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩২), নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হইল। জার্মান প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিলেন না। পাছে জার্মানি এককভাবে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিতে শুরু করে, সেজন্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড, ইতালি ও ফ্রান্স জার্মানির সম-অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। অবশ্য এই স্বীকৃতিতে বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি সম-অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এই ঘোষণার পর জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিলেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি অপরাপর শক্তির সমপর্যায়ে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে এই শর্তটির উপর নির্ভর করিয়া ফ্রান্স কতকটা আশ্বস্ত রহিল বটে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আশু সমাধান সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জার্মানির সম-অধিকার স্বীকার

পরবৎসর (১৯৩৩) ফেব্রুয়ারি মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইল। ইহার কয়েকদিন পূর্বে (জানুয়ারি, ১৯৩৩) এডল্‌ফ হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে নাৎসি সরকার যেমন অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির ব্যাপারে কালবিলম্ব করিতে রাজী ছিলেন না, তেমনি ফরাসী সরকারও জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দাবি কোনভাবেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা চরম তিক্ততায় পরিণত হইল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ ( Ramsay Macdonald ) নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে কোন্ দেশ কি পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে উহার একটি বিশদ পরিকল্পনা সম্মেলনের নিকট পেশ করিলেন। ইহা 'ম্যাক্‌ডোনাল্ড পরিকল্পনা' (Macdonald Plan) নামে পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘ চারি সপ্তাহের আলাপ-আলোচনায় সমবেত সদস্যদের পরস্পর মতানৈক্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে ফরাসী প্রতিনিধি একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপন করিলেন। এই পরিকল্পনায় নিরস্ত্রীকরণের কাজকে দুইভাগে ভাগ করা হইল। প্রথম চারি বৎসর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরিদর্শন করিবে এবং এই সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সামরিক বাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হইবে। এই চারি বৎসরের পর প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ শুরু হইবে এবং যে-দেশের সাজ-সরঞ্জাম নির্ধারিত পরিমাণের অধিক থাকিবে তাহা হ্রাস করিতে হইবে।

ফরাসী পরিকল্পনা

জার্মানি কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ

ব্রিটিশ ও ইতালীয় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রান্সের এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়া গেলেন ( ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩ ) এবং ইহার অব্যবহিত পরেই জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল। এদিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরও কয়েকমাস অধিবেশনে থাকিবার পর ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার পর উহার আর কোন অধিবেশন হয় নাই। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হইল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অবসান

**নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ ( Causes of the Failure of Disarmament Conference ) ঃ** নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ এবং পরস্পর ভীতি ও সন্দেহের মধ্যে

খুঁজিতে হইবে। (১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পটভূমিকা রচনা করিয়া নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা যে বিফলতায় পর্যবসিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

(২) ইহা ভিন্ন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্পাদক ( Secretary ) আর্থার হেণ্ডার্‌সন্। কিন্তু সম্মেলন শুরু হইবার পূর্বেই লেবার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পুনরায় যে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে আর্থার হেণ্ডার্‌সন্ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন বা ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিতে পারিতেন সেরূপ ক্ষমতা স্বভাবতই তাঁহার আর ছিল না।

হেণ্ডার্‌সনের ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-নির্বাচনে পরাজয়

(৩) ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের কোন কর্মচারীকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রেরণ না করিয়া এই সম্মেলনের অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণে ত্রুটি

(৪) জার্মানির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন এবং ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ পার্টির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, জার্মানির অর্থ নৈতিক দুর্দশা প্রভৃতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মান মতামতের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে জার্মানির মনোবৃত্তি স্বভাবতই সহায়ক ছিল না।

জার্মানির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

(৫) প্রস্তুতি কমিশন ( Preparatory Commission ) নিরস্ত্রীকরণের আলাপ-আলোচনার ভিত্তি রচনা করিতে গিয়া কোন সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। উপরন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর-

প্রস্তুতি কমিশনের ব্যর্থতার কুফল

বিরোধিতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যকরী নির্দেশ এই কমিশন দিতে পারে নাই।*

(৬) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা—নিরাপত্তার অজুহাতে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অপেক্ষা অধিকতর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা রাখিবার দাবি—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের পন্থা রুদ্ধ করিয়াছিল। জার্মানিতে হিট্‌লারের উত্থান এবিষয়ে জার্মান সরকারের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করায় ফরাসী-জার্মান বিরোধ অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

ফরাসী-জার্মান বিরোধ

(৭) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ইঙ্গ-ফরাসী নীতির অনৈক্যও প্রকাশ পাইয়াছিল। স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি কি হইবে, এবিষয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্স চাহিয়াছিল স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন কর্তৃক কিছুকাল অন্তর প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তদন্ত বাধ্যতামূলক করিতে। কিন্তু ইংলণ্ড উহা বাধ্যতামূলক না করিয়া কোন দেশ কর্তৃক অপর কোন দেশে নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে স্থায়ী কমিশন ঐ বিষয়ে তদন্ত করিবে—এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

(৮) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে কেবল ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যই প্রকটিত হইল না, আমেরিকার সহিতও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির নানাবিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভার প্রত্যেক দেশের সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্স এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে আমেরিকার উৎসাহ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমেরিকার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতানৈক্য

---

* "The Preparatory Commission had provided more signposts to the pitfalls of disarmament than to promising lines of advance." Carr, p. 184.

(৯) অনুরূপ, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাও দীর্ঘ আলোচনার পর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণ অপেক্ষা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে রাশিয়া ফ্রান্সের সমর্থক ছিল। কিন্তু আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশ নিরস্ত্রীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের কার্যে কোন একতা বা মতৈক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ফ্রান্স কর্তৃক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অপরাপর দেশ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ

(১০) সর্বশেষে, হিট্‌লারের চ্যান্সেলর-পদ লাভ এবং ভার্সাই-এর চুক্তি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প জার্মান মনোভাবকে ক্রমেই অনমনীয় করিয়া তুলিতেছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মান প্রতিনিধির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ—উহার ব্যর্থতার শেষ পদক্ষেপ।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান

**লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর বাহিরে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা (Attempts at Regional Security & Disarmament outside League of Nations) : নিরাপত্তা (Security) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে একদিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার চেষ্টা চলিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি লীগের বাহিরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও চলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও জার্মান-ভীতি ফ্রান্সের এক দারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক দিয়া অধিকতর অগ্রসর এবং জনসংখ্যার দিক দিয়া অধিকতর বলশালী জার্মানি পরাজিত হইয়াও ফ্রান্সের ভীতির কারণ রহিয়া গিয়াছিল। এজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে স্বাক্ষরিত ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকিবে এবং জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দায়ী থাকিবে এই আশা ফরাসী সরকারের ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ইংলণ্ড এই ধরণের

বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি :

ফ্রান্স কর্তৃক নিরাপত্তার চেষ্টা

প্রতিশ্রুতি দানে অগ্রসর না হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা স্বভাবতই জটিল হইয়া উঠিল। লীগ চুক্তিপত্রের শর্তাদিও ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের সমস্যা হইল দুইটি ঃ (১) জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইওরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিবর্গের সহিত মৈত্রী স্থাপন ও (২) জার্মানির চতুর্দিকে মিত্র-শক্তিবর্গের একটি আবেষ্টনী গঠন।

ফ্রান্সের পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মিত্রতালাভে অসুবিধা হইল না। যে সকল দেশের পক্ষে ভার্সাই তথা প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি বজায় রাখা লাভজনক ছিল সেগুলির সহিত ফ্রান্সের মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া খুবই সহজ হইল। (১) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বেলজিয়ামও জার্মান আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল, সুতরাং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বার্থের সমতা হেতু উভয় দেশের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী চুক্তির কোন বাধা ছিল না।

ফ্রান্স-বেলজিয়াম চুক্তি

ফ্রান্স-পোল্যাণ্ড চুক্তি

(২) প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অনুসারে পোল্যাণ্ড জার্মানি হইতে পশ্চিম-প্রাশিয়া, সাইলেশিয়ার একাংশ ও পোজেন পাইয়াছিল। জার্মানি স্বভাবতই এই সকল স্থান হারাইয়া পোল্যাণ্ডের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সেজন্য জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভীতি পোল্যাণ্ডকে ফরাসী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। (৩) চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায় লাভবান হইয়াছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান বা অস্ট্রিয়ার সহিত জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া এই সকল রাষ্ট্রের পক্ষে ভীতির কারণ ছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তি বজায় রাখাই ছিল এগুলির স্বার্থ। সুতরাং এই তিনটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই মৈত্রী Little Entente নামে পরিচিত। ফ্রান্সের পক্ষেও শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখা অর্থাৎ Status Quo বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন

Little Entente

ছিল। স্বভাবতই ফ্রান্স Little Entente-এর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। Little Entente রাষ্ট্রগুলিকে—অর্থাৎ রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ফ্রান্স সামরিক উপকরণ, ঋণ প্রভৃতি দান করিয়া এবং সেই সকল দেশে ঘন ঘন সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ করিয়া এই তিনটি দেশকে ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল। Little Entente রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সকে ভার্সাই-এর চুক্তি বজায় রাখিতে যেমন সাহায্য করিবে, ফ্রান্সও তেমনি হাঙ্গেরীর সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিতে এবং বিশেষভাবে ইতালির আক্রমণ হইতে যুগোস্লাভিয়াকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এই সকল চুক্তির ফলে একদিকে যেমন জার্মানির চতুর্দিকে ফ্রান্সের মিত্রশক্তিবর্গের একটি আবেষ্টনী গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, অপর দিকে এই সকল মিত্রশক্তির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ফ্রান্স নিজের উপর প্যারিসের শান্তি-চুক্তি রক্ষার প্রায় যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

ফ্রান্স-Little Entente চুক্তি

বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হইতে কতক কতক স্থান রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্বভাবতই প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তন চাহিতেছিল। এই সকল দেশ রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতির মধ্যে কোন আঞ্চলিক নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্থাপিত হউক তাহা চাহিত না। সেজন্য রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া Little Entente স্থাপন করিলে এবং ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস ও আলবানিয়া একটি পাল্টা মৈত্রী-সংঘ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইতালির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিল। ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় নাই সেজন্য আলবানিয়ার উপর সংরক্ষণমূলক আধিপত্য (Protectorate) বিস্তার করিয়াছিল। বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার লইয়া ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স ও Little Entente-এর মৈত্রীর প্রত্যুত্তর হিসাবে ইতালি এবং হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও গ্রীসের সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিল। বলকান অঞ্চলের

ইতালি-হাঙ্গেরী-আলবানিয়া-বুলগেরিয়া-গ্রীস মৈত্রী

নেতৃত্ব ন্যায়ত তুরস্কের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত ছিল। তুরস্কও এবিষয়ে সচেতন ছিল। বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক জটিলতার সুযোগে তুরস্ক বলকান দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের সহিত পর পর তিনটি সম্মেলনে সমবেত হয় (১৯৩০,১৯৩১,১৯৩২)। এই সকল সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তুরস্ক, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করা সম্ভব হয়। এইভাবে তুরস্ক বলকান অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণে যখন অগ্রসর হইয়াছে সেই সময়ে জার্মানিতে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসকে তুরস্কের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপনে প্রলুব্ধ করে। গ্রীস, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি আঞ্চলিক চুক্তি (Pact of Balkan understanding) স্বাক্ষরিত হয় (৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪)। এই চুক্তি দ্বারা স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হয় এবং সকলের স্বার্থ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে আলাপ-আলোচনা করিবার নীতি স্বীকৃত হয়। আলবানিয়া ও বুলগেরিয়া এই বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করে নাই, কারণ এই দুইটি দেশ ছিল ইতালির সহিত মিত্রতাবদ্ধ। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া যুগোস্লাভিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও তুরস্কের সহিত পরস্পর 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করে। এইভাবে বলকান অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গঠিত হয়।

বলকান চুক্তি

ইতালি, হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তনের দাবি করিতেছিল। স্বভাবতই এই তিন দেশের মধ্যে এক গভীর ঐক্য-স্পৃহা জাগরিত হয়। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন দেশের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারা 'রোম প্রোটোকোল' * (Rome Protocol) নামে একটি চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করেন। রোম প্রোটোকোল স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পর নিরাপত্তা বৃদ্ধি। ইহা ভিন্ন এই তিন দেশের মধ্যে কয়েকটি বাণিজ্য-চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। রোম-অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পরস্পর আলোচনা ও সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে সামরিক ও অর্থ নৈতিক

রোম প্রোটোকোল (Rome Protocol)

* Vide Langsam, pp. 99, 277.

নিরাপত্তার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই ( ১৯৩৫ ) ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার, রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ-শক্তি মৈত্রী, জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকার ( ১৯৩৮ ) প্রভৃতির ফলে রোম প্রোটোকোল অর্থহীন হইয়া পড়িল।

আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক মৈত্রী ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি পৃথিবীর—বিশেষভাবে ইওরোপের অপরাপর অংশেও স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল। উত্তর-ইওরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহ—ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে এই সকল দেশ রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক—সকল ক্ষেত্রেই পরস্পর আলোচনা, সাহায্য-সহায়তার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অভ্যন্তরেও এই সকল দেশ একটি পৃথক রাষ্ট্রজোট বা ব্লক ( Bloc ) হিসাবে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ছিল। এই রাষ্ট্রজোট ইওরোপীয় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্মানি কর্তৃক নরওয়ে ও ডেনমার্ক জয়, রাশিয়া কর্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড অধিকৃত হইলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রজোট ( Scandinavian Bloc ) ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইল না।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ ব্লক—ডেনমার্ক-সুইডেন-নরওয়ে-ফিন্‌ল্যাণ্ড-আইসল্যাণ্ড মৈত্রী

উপরি-উক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটের অনুরূপ রাষ্ট্রজোট মধ্য-প্রাচ্য, বাল্টিক অঞ্চল প্রভৃতিতেও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তুরস্কের নেতৃত্বে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তান ও তুরস্ক নিজেদের মধ্যে একটি পরস্পর অনাক্রমণ ও নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব-ছায়া পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাল্টিক অঞ্চলে ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্টিক চুক্তি' ( Baltic Pact ) নামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এস্তোনিয়া-লিথুয়ানিয়া-ল্যাটভিয়া মৈত্রী—বাল্টিক চুক্তি ( Baltic Pact )

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এ্যাসোসিয়েশান

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ ব্রিটিশরাজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর বাহিরে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর ন্যায় ঐক্যবদ্ধ এবং পরস্পর সাহায্য-সহায়তার মনোবৃত্তিসম্পন্ন অপর কোন রাষ্ট্রজোট ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এই ঐক্য স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আয়র্লণ্ড অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, তথাপি ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথ্‌-এর ঐক্যবোধ কত গভীর তাহার প্রমাণ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল।

প্যান-আমেরিকা-নিজম্‌

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর অনুরূপ অপর একটি ঐক্য আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অপরাপর অংশের রাষ্ট্রগুলির সহিত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে। গোণ্ড্রা চুক্তি ( Gondra Treaty ), বুয়েনোস-এয়ারিস ( Buenos Aires ) চুক্তি প্রভৃতি এবিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই ছিল মার্কিন ঐক্য আন্দোলনের ( Pan-Americanism ) মূল উদ্দেশ্য।

লণ্ডন চুক্তি ( London Agreements )

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ইংলণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে একটি চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, পররাষ্ট্র-নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের সম-অধিকার স্থাপন ছিল এই প্রস্তাবিত চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তি রোমে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাশিয়ায় সন্দেহের উদ্রেক হইলে, রাশিয়া চেকো-স্লোভাকিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া, পারস্য, পোল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, রুমানিয়া যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই সকল চুক্তি London Agreements নামে পরিচিত। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পর অনাক্রমণ, বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সামরিক সাহায্যদান প্রভৃতি এই চুক্তি দ্বারা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই সকল চুক্তির কোনটিই প্রকৃতক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নাই।

**নিরস্ত্রীকরণ ( Disarmament ) :** আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর আওতার বাহিরে যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আত্ম-রক্ষামূলক চুক্তি ও রাষ্ট্রজোট গড়িয়া উঠিয়াছিল অনুরূপ লীগের বাহিরে বিভিন্ন দেশের পরস্পর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টাও চলিয়াছিল। নিরাপত্তা ( Security ) ও নিরস্ত্রীকরণ ( Disarmament ) এই উভয় ব্যাপারেই লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই।

লীগের বাহিরে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর জনক প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন মার্কিন সেনেটের বিরোধিতায় আমেরিকাকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত জড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না। আমেরিকা লীগ বয়কট করিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান তাহাতে হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের অভ্যুত্থান, জাপান কর্তৃক চীনদেশের উপর একুশ দাবি ( Twenty one Demands ) কার্যকরীকরণ প্রভৃতি আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটন শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও সুদূর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যা-সমূহের সমাধান এবং সেই অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের—প্রধানত আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। ইঙ্গ-মার্কিন নৌশক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করা ও চীন-জাপানের বিবাদের মীমাংসা করাও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডও এই সম্মেলনের পক্ষপাতী ছিল। কারণ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির শর্তানুসারে আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডকে জাপানের পক্ষ লইতে হইত। ইহার ফলে স্বভাবতই ইঙ্গ-মার্কিন সৌহার্দ্য বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং আহূত 'ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স' ( Washington Conference ) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শুরু হইল এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উহার অধিবেশন চলিল।

(১) ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স ( Washington Conference 1921-22 )

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে রাশিয়া ভিন্ন সুদূর প্রাচ্যে অপরাপর যে সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল সেইরূপ সকল দেশের প্রতিনিধিই আমন্ত্রিত হইলেন। বেলজিয়াম, চীন, জাপান, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোর্তুগাল, নেদারল্যাণ্ডস্—এই আটটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ওয়াশিংটনে সমবেত হইয়া মোট সাতটি চুক্তি সম্পাদন করিলেন।* পাঁচটি চুক্তি প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, আর অপর দুইটি ছিল নৌবল হ্রাস (Naval Disarmament)-সংক্রান্ত।

নৌ-শক্তি হ্রাসের চুক্তি

শেষোক্ত চুক্তি দুইটি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুইয়ের একটি দ্বারা স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের নৌশক্তি কি অনুপাতে থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হয়। জাপানকে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌবলের ৬০% শতাংশ রাখিতে দেওয়া হইবে স্থির করা হয়। আর ফ্রান্স ও ইতালি ইংলণ্ড ও আমেরিকার মোট নৌবলের ৩০% শতাংশ রাখিতে পারিবে। এই অনুপাত কেবলমাত্র যুদ্ধ-জাহাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে, অপরাপর জাহাজের সংখ্যা এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ার করিবে না বলিয়াও প্রতিশ্রুত হয়। অপর চুক্তি দ্বারা উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশ ( অর্থাৎ আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালি ) যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করিবে না এবং ডুবো-জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নীতি স্থির করিল।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স পাঁচটি দেশের নৌবল সম্পর্কে নিরস্ত্রীকরণ-নীতি গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সেরূপ কিছু

'ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স'-এর সাফল্যের পরিমাণ

ছিল না। এই চুক্তির শর্তাদি জাপানকে ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-শক্তির ৬০% শতাংশ রাখিবার অধিকার দিবার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয়:অঞ্চলে জাপানের নৌ-প্রাধান্য বজায় রহিল। কারণ, জাপানের নৌবল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলে ইংলণ্ড বা আমেরিকার পক্ষে তাহাদের

* Vide Langsam, pp. 417-18.

নিজ নৌ-শক্তির ৬০ শতাংশ নৌবলও কোন এক সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে জাপানের প্রাধান্য এই অঞ্চলে অক্ষুণ্ণ ছিল। অনুরূপ আমেরিকা ও ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের নৌ-শক্তির ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। তদুপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৌবলের প্রাধান্য বা জাপানের নৌবল ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল না। আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ ইতালির পক্ষে সেই সময়ে নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং অপরাপর দেশের যে-কোন কারণে বা যে-কোন পরিমাণ নৌ-শক্তি হ্রাসের প্রস্তাব ইতালির পক্ষে স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল। এই সকল কারণে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স সাফল্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে ডেস্ট্রয়ার, ডুবোজাহাজ, ক্রুইজার প্রভৃতির সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। সর্বপ্রকার সামরিক নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে না পারিলে কেবলমাত্র যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স প্রকৃত সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল একথা বলা চলে না। তথাপি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এবং পরবর্তী দশ বৎসর আর কোন নূতন যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণ করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আপাতদৃষ্টিতে সাফল্য—মূলত তাহা নহে

সম্পূর্ণ সাফল্যলাভে সমর্থ না হইলেও প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ

প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুলিজ (President Coolidge) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে একটি দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিলেন। ইহাও ছিল ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর ন্যায় একটি নৌ-শক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত কন্‌ফারেন্স। এই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানকে আমন্ত্রণ জানাইলে ফ্রান্স ও ইতালি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল। ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর কার্যকলাপ স্মরণ করিয়া ইতালি ও ফ্রান্স স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে, এইরূপ কন্‌ফারেন্স দ্বারা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রী-

(২) জেনেভা নৌ-কন্‌ফারেন্স (Geneva Naval Conference, 1927)

করণের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে, কারণ কেবলমাত্র নৌ-শক্তি হ্রাস করিলেই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা ভিন্ন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যখন অবহিত এবং সেবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত সেই অবস্থায় কেবলমাত্র পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন যুক্তিযুক্ত নহে। সর্বোপরি ইতালি ও ফ্রান্স ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের স্বার্থ-রক্ষার মনোবৃত্তি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নাই। একথাও ফরাসী ও ইতালীয় সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে দ্বিধা করিলেন না। ফলে, জেনিভা শহরে কেবলমাত্র মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানী প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইলেন। কন্‌ফারেন্স শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গ-মার্কিন মতানৈক্য দেখা দিল। ক্রমে ইহা এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, জেনিভা কন্‌ফারেন্স সম্পূর্ণ বিফল হইল। আমেরিকা চাহিয়াছিল ক্রুইজার-এর সংখ্যা কোন্ দেশ কত রাখিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, পক্ষান্তরে বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন ছিল বিরাট সংখ্যক ক্রুইজারের। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সেজন্য চাহিলেন যে, ক্রুইজারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিয়া উহার আকার নিয়ন্ত্রণ করা হউক। এই বিষয় লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য ক্রমে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষে পরিণত হইল। এই কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া গেলে পরও এই পরস্পর বিদ্বেষ ও সন্দেহ কিছুকাল উভয় দেশের সৌহার্দ্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

ইতালি ও ফ্রান্স কর্তৃক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

কন্‌ফারেন্সের বিফলতা—ইঙ্গ-মার্কিন বিদ্বেষ

জেনিভা নৌ-কন্‌ফারেন্সপ্রসূত ইঙ্গ-মার্কিন সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড্ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ইহাতে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভাব অনেকটা দূরীভূত হইল। ব্রিটিশ সরকার সেই সুযোগে লণ্ডনে আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালিকে একটি কন্‌ফারেন্সে আহ্বান করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই সকল দেশের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে সমবেত হইলেন। এই কন্‌ফারেন্স-এ ইঙ্গ-মার্কিন অনৈক্যের মীমাংসা হইল, কিন্তু ফ্রান্স-ইতালির

মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিল উহার সমাধান করা সম্ভব হইল না।

লণ্ডন নৌ-শক্তি হ্রাসের সম্মেলন (London Naval Disarmament Conference, 1930)

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমপরিমাণ ডুবো-জাহাজ রাখিবার অধিকার জাপান লাভ করিল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র আকার ক্রুইজারের সংখ্যা এবং আমেরিকা বৃহদাকার ক্রুইজারের সংখ্যা বাড়াইবার অধিকার পাইল। এই দুই দেশের মোট সংখ্যক ক্রুইজারের বহন ক্ষমতা (Tonnage) অবশ্য সমান রহিল। লণ্ডনে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুসারে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাক্ষরকারী দেশগুলি জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকা যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির বিবাদের মীমাংসা সম্ভব হইল না। ফ্রান্স ইতালির সমপরিমাণ নৌ-শক্তি রাখিতে রাজী হইল না, কারণ ফ্রান্সের সমান নৌবল রাখিবার অধিকার পাইলে ভূমধ্যসাগরে ইতালি নিরঙ্কুশপ্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। তদুপরি ফ্রান্সের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণ নৌবল প্রয়োজন ইতালির তাহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ফ্রান্স

লণ্ডন চুক্তি (London Treaty)

ইতালি অপেক্ষা অধিক নৌশক্তি রাখিতে চাহিল। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে ফ্রান্স ইতালিকে সমপরিমাণ নৌ-শক্তি রাখিতে দিতে রাজী হইল না। ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করা সম্ভব হইল না। ফলে, ইতালি ও ফ্রান্সের বিবাদের মীমাংসা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশ লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইল। ইতালি ও ফ্রান্স এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা আত্ম-রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে পূর্বে নোটিশ দিয়া নৌ-শক্তি বাড়াইতে পারিবে —এই শর্তটি লণ্ডন চুক্তিতে ( ১৯৩০ ) যোগ করিতে বাধ্য হইল। ফলে, লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এর নিরস্ত্রীকরণ-নীতি তেমন কার্যকরী হইল না।

লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরে তুরস্ক ও গ্রীস পরস্পর

এ্যাঙ্গোরা প্রোটোকোল, ১৯৩০

নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে এ্যাঙ্গোরা প্রোটোকোল ( Angora Protocol ) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীর আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হইলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্তরিক চেষ্টার অভাব এই কথাই প্রমাণিত হইল। জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়া যাইবার পর জার্মানি যখন ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল তখন ব্রিটিশ সরকার জার্মানির সহিত একটি নৌ-শক্তি-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (Anglo-German Naval Agree-ment, June 18,1935)। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার জার্মানিকে ব্রিটিশ নৌ-শক্তির ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত নৌবহর বৃদ্ধি করিতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জাহাজ প্রস্তুতের অধিকার দানে স্বীকৃত হইলেন। জার্মানি কর্তৃক এককভাবে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া চলিবার কার্যে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদানত করিয়া রাখিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনে করা ভুল হইবে না। যাহা হউক, ব্রিটিশ সরকার সম্মুখীন পরিস্থিতি মানিয়া লইবার ও ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্যই এইরূপ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি
১৯৩৫, জুন

ঐ বৎসরেই লণ্ডনে জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সর্বশেষবারের মত নৌ-শক্তি হ্রাসের চেষ্টায় সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে জাপান নৌ-শক্তি ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সম-পর্যায়ভুক্ত হইতে চাহিল। কিন্তু এই দাবি অপরাপর দেশ স্বীকার করিল না। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানি রাইন অঞ্চলে পুনরায় সেনানিবাস প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে লণ্ডনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ অস্ত্রশস্ত্র বা নৌ-শক্তি হ্রাসের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গ ১৯২১-২২ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নৌ-চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে বিবেচনায় পুনরায় তাহাদের পরস্পর নৌ-বলের অনুপাত পূর্ববৎ রাখিতে এবং জাহাজ নির্মাণে পরস্পর পরস্পরকে নূতন তথ্যাদির আদান-প্রদানে স্বীকৃত হইয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (২৫শে মার্চ, ১৯৩৬)। কিন্তু জাপান এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হইল না, উপরন্তু ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের নৌ-চুক্তি (ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত) ও লণ্ডন

লণ্ডন নৌ-সম্মেলন,
১৯৩৫-৩৬

চুক্তির ( ১৯৩০ ) মেয়াদ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার শর্তাদি মানিতে বাধ্য থাকিবে না একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল।

এইভাবে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন নৌ-সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় দেশসমূহ জার্মানি ও ইতালির একক অধিনায়কত্বের 'যুদ্ধং-দেহি' মনোভাবের পরিচয় লাভ করিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন তখন নিছক বাতুলতায় পরিণত হইল।

**লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ( League of Nations & World Peace ) :** আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর দায়িত্ব যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, লীগ চুক্তি-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে যথাযথ অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, ম্যাণ্ডেট্ রাজ্যগুলি পরিচালনা ও পরিদর্শন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদি—সব কিছুই লীগের কর্তব্য-কার্যের তালিকাভুক্ত ছিল। এই সকল কার্য-কলাপের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, দুঃখদুর্দশা মোচন, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি আনয়ন প্রভৃতি বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গঠিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি লীগকে অনুসরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব :

(১) আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান দেশগুলির মধ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে এবং লীগের এ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিলের পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের অবসান ঘটান ছিল লীগের দায়িত্ব। এই সকল দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হইবে তাহা লীগ চুক্তিপত্রে (League Covenant) বর্ণিত ছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উদ্দেশ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতি

(২) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইয়া যুদ্ধ রোধ করাই লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

রক্ষার জন্য আক্রমণকারী দেশকে উপযুক্ত শাস্তিদান করাও ছিল লীগের কর্তব্য-কার্যের অন্যতম। প্রত্যেক দেশের সীমার নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে বা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে লীগ কাউন্সিল উহা রোধ করিবার যথাযথ উপায় ও ব্যবস্থার নির্দেশ দিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' রক্ষা করা লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রধান দায়িত্ব হইলেও লীগ চুক্তিপত্রের কোন স্থানে 'শান্তি' (Peace) শব্দটির উল্লেখ করা হয় নাই।

প্রতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা—আক্রমণকারী রাষ্ট্রের শাস্তির ব্যবস্থা

(৩) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, নৌ-বল ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, একথা উপলব্ধি করিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ধরণের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে পারিলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার পথ সহজতর হইবে, তেমনি অপর দিকে অযথা এক বিশাল ব্যয়ের বোঝা হইতে প্রত্যেক দেশ রক্ষা পাইবে। এইভাবে অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অসুস্থতা হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি স্বভাবতই সহজ হইবে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ

(৪) লীগের চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করা লীগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে সার অঞ্চল ও ডানজিগ্ শহরের উপর পরিদর্শনমূলক কার্য লীগকে করিতে হইয়াছিল। ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলির শাসনকার্যের পরিদর্শন অধিকারও লীগের উপর ন্যস্ত ছিল।

সার অঞ্চল. ডান্‌জিগ্ শহর ও ম্যাণ্ডেট অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের কাজ

(৫) বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য প্রত্যেক দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে ন্যায্য ব্যবহার ও সম-অধিকার পাইতে পারে সেজন্য লীগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের বা নির্দেশদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতা

(৬) সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে নূতন জ্ঞান, নূতন ধারণা প্রভৃতি প্রত্যেক দেশকে সরবরাহ করিয়া, নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পর শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল।

সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের মাধ্যম লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

**লীগের কার্যকলাপ (Activities of the League) : নিরাপত্তা রক্ষার কার্যাদি (Activities for the Preservation of Security) :** প্যারিসের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি মোট ৪৪টি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই সমস্যার জটিলতা সম-পরিমাণ ছিল না। যাহা হউক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। এগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লীগ নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েকটির ক্ষেত্রে লীগ অসহায় দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল।

লীগ কাউন্সিলের সম্মুখে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি উপস্থাপিত হইয়াছিল উহা 'এঞ্জেলি ঘটনা' (Enzeli Affair) নামে পরিচিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নৌবহর কাস্পিয়ান অঞ্চলে এঞ্জেলি বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিলে পারস্য সরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুধু তাহাই নহে, পারস্য সরকার রাশিয়ার সহিত সরাসরি এবিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চালান। শেষ পর্যন্ত লীগ কাউন্সিলের কোন কিছু করিবার পূর্বেই পারস্য সরকার ও রুশ সরকার এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) এঞ্জেলি ঘটনা

ঐ বৎসরই (১৯২০) সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ (Aaland Islands)-এর আধিপত্য লইয়া বিবাদ দেখা দিলে ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় এই উভয় দেশ লীগের সদস্য না হইলেও তাহাদের বিবাদটি মীমাংসার জন্য লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। লীগ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে লীগের সদস্য ভিন্ন অপরাপর

(২) আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ

দেশের এই ধরণের বিবাদের মীমাংসা লীগ কাউন্সিলের করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং লীগ আন্তর্জাতিক বিচারালয় তখনও গঠিত হয় নাই বলিয়া কয়েকজন আইনজ্ঞের একটি কমিটি নিয়োগ করিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে লীগ কাউন্সিল এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে উভয় পক্ষ অর্থাৎ ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেন তাহা মানিয়া লইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর মাধ্যমে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কিছু করিবার পূর্বেই আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র তুরস্ক কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যায়।

(৩) আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনা

পর বৎসর ( ১৯২১ খ্রীঃ ) টিউনিসিয়ার অধিবাসীদের এক শ্রেণীর লোককে ফরাসী সরকার ফরাসী নাগরিক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদিগকে ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিলে ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করে। কারণ, ইংলণ্ড এই সকল লোককে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া দাবি করিত। শেষ পর্যন্ত এবিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসিত হইবার পূর্বে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই বিবাদ মিটাইয়া লয়। ঐ বৎসরই জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে লীগ কাউন্সিল এই দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাণ্ড লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

(৪) ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

(৫) জার্মানি-পোল্যাণ্ড সীমান্ত সমস্যা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিবাদের মীমাংসায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাত্র সার্বিয়ার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডানজিগ্‌, সার অঞ্চল, দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী-সংক্রান্ত নানা বিষয়েও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল।

লীগের অপরাপর কার্যাদি

আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন, আফিং ব্যবসায়, ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে অর্থনৈতিক সংকট হইতে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে লীগের অবদান নেহাৎ কম ছিল না।

কিন্তু যে-সকল ঘটনায় লীগের শক্তির প্রকৃত পরিচয় দানের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রেই লীগের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে লীগের অসাফল্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষক সংস্থা হিসাবে উহার ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (৭) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্‌ফু ঘটনায় (Corfu Incident) লীগের প্রকৃত শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিতে পারা গেল। ঐ বৎসর গ্রীস ও আলবানিয়ার সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সভার অধিবেশন গ্রীসে যখন চলিতেছিল তখন ঐ সভার সদস্য ইতালীয় দূত জনৈক জেনারেলকে গ্রীসের রাজ্যসীমার মধ্যে হত্যা করা হয়। ইতালি এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিলে গ্রীস সরকার উহা দিতে অস্বীকৃত হন। ইতালি গ্রীসের করফু নামক দ্বীপটির উপর গোলা বর্ষণ করে এবং উহা দখল করিয়া লয়। এই ব্যাপার লইয়া লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করা হইলে মুসোলিনি লীগের অধিকার অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের যে সভা গ্রীসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সভা গ্রীসের উপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দিলে গ্রীস তাহা দিতে বাধ্য হয়। ইতালি কর্তৃক লীগের বিচারক্ষমতা অস্বীকার লীগের দুর্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

করফু ঘটনা

(৮) ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'সীমা নির্ধারণ কমিশন' ( Boundary Commission ) নিযুক্ত করে। এই কমিশন যখন কার্যে রত ছিল ঐ সময়ে তুরস্কের অধীন কুর্দ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে আরম্ভ করিলে কুর্দগণ ইরাক-তুরস্কের সীমান্তে পলাইয়া আসে এবং সেখান হইতে তুর্কী সৈন্যদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ একটি দ্বিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরস্কের

ইরাক ও তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

সীমা নির্ধারিত হয়। ব্রিটেন, তুরস্ক ও ইরাক এই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯২৬)।

(৯) গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রায়ই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁহার একজন অনুচর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এই বিষয়ে তদন্তের পর গ্রীসকে সৈন্য অপসারণে এবং বুলগেরিয়ার সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। গ্রীস অবশ্য এই সকল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে ইতালি যখন গ্রীসের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তখন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া গ্রীস স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা

(১০) লিথুয়ানিয়ার সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' ( State of War ) ঘোষণা করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দুই দেশে তথাপি মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের তৎপরতায় দূর হইয়াছিল।

লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সৃষ্টিতে বাধাদান

(১১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানকে নিরস্ত করিতে চাহিল। লীগ চুক্তিপত্র অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, কারণ চীন জাপানের ন্যায়-ই ছিল লীগের সদস্য রাষ্ট্র। জাপান স্বেচ্ছাকৃতভাবে লীগ-চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল এবং সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলে এবং জাপান তাহা অগ্রাহ্য করিলে লীগ লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করিলে সুদীর্ঘ আলোচনার পর

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)

লীগ জাপানের উপর দোষারোপ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানের অন্যায় আচরণের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, জাপানের বিরুদ্ধে লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তানুযায়ী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক, জাপান ও লীগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া লীগের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিল।

(১২) ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (১৯৩৬) এবং লীগের বিভিন্ন সদস্যের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অযথা কালক্ষেপ লীগের অকর্মণ্যতার চরম দৃষ্টান্তহিসাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালি ও ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্ব ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও ইথিওপিয়ার সীমায় ওয়ালওয়াল (Walwal) নামক স্থানে ইথিওপিয় ও ইতালীয় সৈনিকদের সংঘর্ষ হইতে শুরু হইয়াছিল।

ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) দখল

কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া ইথিওপিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবার ফলস্বরূপ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া লইলেন। রাজ্যহারা ইথিওপিয় রাজা হেইলেসেলাসি লীগের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া লীগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লীগ কাউন্সিল কর্তৃক রাজ্যহারা হেইলেসেলাসিকে লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। ইথিওপিয়াকে লীগের সদস্য হিসাবে স্বীকার করিলে ইতালি লীগ ত্যাগ করিয়া গেল। ইহার দুই বৎসর পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অকর্মণ্যতা ও চরম দুর্বলতা পৃথিবীর জনসমাজের নিকট পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল। এই সময় হইতেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অস্তিত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইহার পর স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো তথাকার প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্য অন্তর্বিরোধ শুরু করিলে একক অধিনায়কত্বাধীন জার্মানি ও ইতালি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ অবলম্বন করিল। স্পেনীয় সরকার লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন

কার্যকরী সাহায্য পাইলেন না। লীগ কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব পাস করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে একক অধিনায়কত্বের জয় ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এরও পতন ঘটিল।

**লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর মূল্যায়ন ( Worth of the League of Nations ) ঃ** লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ নানাকারণে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অবদানও যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। প্রথমত, লীগ পৃথিবীর জনসমাজকে আন্তর্জাতিক সমবায়, সৌহার্দ্য ও সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর জনসাধারণকে মনোযোগী করিয়া তুলিয়া নিছক জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনে কতক পরিমাণে দমন করা উচিত এই শিক্ষাই দিয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর অবসান ঘটিলেও লীগ প্রচারিত আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ পূর্ববর্তী কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারেও এক নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বিবাদ-বিসংবাদ লীগ চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মীমাংসার ব্যবস্থা এবং লীগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি নির্ধারিণ করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) লীগের আদর্শ ও সংগঠনের অনুবৃত্তি, একথা অনস্বীকার্য।* আন্তর্জাতিক সমবায়ের ধারণা অতি প্রাচীন

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সংস্থা হিসাবে লীগের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব

* "The ideals which it (League) sought to promote, the hopes to which it gave rise, the methods it devised, the agencies it created, have become essential part of the political thinking of the civilized world and their influence will survive

হইলেও লীগের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল যেমন অভিনব, উহার প্রভাবও ছিল তেমনি ব্যাপক ও স্থায়ী।

লীগের অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদির গুরুত্ব

তৃতীয়ত, লীগ উহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার কার্যাদির দ্বারা পৃথিবীর জনসাধারণের সম্মুখে এক চমৎকার এবং অভিনব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাধারণ মানুষকেই যে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে, এই শিক্ষাই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পরবর্তী যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছিল।

সর্বজাগতিক ঐক্যের আদর্শ

সর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পৃথিবীর সকল অংশের রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে পৃথিবীর মূল ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

**লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations) :** উপরোক্ত কার্যকারিতা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ প্রকৃত সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল।

লীগের ব্যর্থতার কারণ : (১) পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছিল। স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন দেশেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কেহ তেমন উপলব্ধি করে নাই।

---

until mankind enjoy a unity transcending the divisions of state and nations.

Whatever the fortunes of the united nations may be, the fact that, at the close of the Second World War, its establishment was desired and approved by the whole community of civilized peoples must stand to future generations as a vindication of the men who planned the League". Watler, vide Langsam, pp. 55-56.

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে স্বভাবতই প্রত্যেক দেশ লীগের শর্তাদি ও লীগের মূল নীতির অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। জাতীয় সার্বভৌমত্বের (National Sovereignty) ধারণা দ্বারা রাষ্ট্রবর্গ অত্যধিক প্রভাবিত হইবার ফলে লীগের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য তাহাদের জন্মিতে পারে নাই।

(২) জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরাজয়

তৃতীয়ত, লীগ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপসরণ এবং প্রথম দিকে রাশিয়া ও জার্মানিকে উহার সদস্যপদভুক্ত না করা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি দ্বারা জার্মানিকে এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ ত্যাগ করিয়া গেলে উহা পুনরায় ক্ষুদ্রপরিসর হইয়া পড়িল। লীগের ইতিহাসে কোন সময়েই পৃথিবীর সকল বৃহৎ দেশ ইহার সদস্যপদভুক্ত ছিল না। ইহা লীগের দুর্বলতা তথা বিফলতার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচ্য।

(৩) সকল বৃহৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতার অভাব

চতুর্থত, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন—এই নীতির ফলে কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। লীগের আলাপ-আলোচনায় সেজন্য রাষ্ট্রগত ও জাতিগত স্বার্থ-ই প্রাধান্য লাভ করিত। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৪) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

পঞ্চমত, লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার মত কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকায় লীগের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লীগের নিজস্ব কোনপ্রকার সামরিক শক্তি না থাকায় লীগের সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে মনে করা হইত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ফলে, ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে লীগ ইতালিকে নিরস্ত

(৫) লীগের সামরিক শক্তির অভাব

করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ জাপানকে কোনভাবেই নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৬) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে লীগ চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার কুফল

ষষ্ঠত, লীগ চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার ফলে ইহার আন্তর্জাতিক প্রকৃতি কতকাংশে ব্যাহত হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের পূর্বতন অবস্থা ( Status Quo ) বজায় রাখাই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর প্রধান দায়িত্ব এই ধারণা অনেকের মধ্যেই জন্মিয়াছিল। ইহা লীগের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

(৭) একক অধি-নায়কত্বের উদ্ভব

সপ্তমত, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অর্থ নৈতিক মন্দা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিয়াছিল উহার অন্যতম ফল হিসাবেই ইওরোপে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ঘটে। অথচ লীগ চুক্তিপত্র ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক দলিল। স্বভাবতই একক অধিনায়কত্বের আদর্শ ও কর্মপন্থা লীগের আদর্শ ও কর্মপন্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। জাপান, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের আচরণে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

(৮) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহায়তার অভাব

অষ্টমত, লীগের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল সদস্য-দেশগুলির আন্তরিক এবং নৈতিক সাহায্য ও সহায়তা। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন দেশই আন্তর্জাতিক শান্তি বা লীগের নীতি মানিয়া চলিবার প্রশ্নের ধার ধারিত না। এই সকল কারণে ক্রমেই লীগ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে লাগিল। ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ( ১৯৩৫ ), জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল ( ১৯৩৮ ) প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই লীগ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামরিক নিরস্ত্রীকরণ ( Disarmament) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একটি মূলনীতি ছিল। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ,

বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ছোট যুদ্ধজাহাজের, এবং ফ্রান্স সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হয় নাই। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অন্ততঃ ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জার্মানি এই অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্পকাল পরেই ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করিয়া দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধের ফলেই পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা: ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স

নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান: সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## ( Rise of Soviet Russia : Soviet Foreign Relations )

**সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান ( Rise of Soviet Russia ):** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউনিয়ন-এর উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল, আভ্যন্তীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশের নীতি এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া চিরাচরিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারায় এক সম্পূর্ণ নূতন প্রবাহ আনিয়াছে। জার-শাসিত রাশিয়ায় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক

রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা

অত্যাচার, সামাজিক বিভেদ-জনিত বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল তাহা মার্কসপন্থী বল্‌শেভিক্‌ দলের প্রচারকার্য ও চেষ্টার ফলে বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইতেছিল। ১৯১৪-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসাবে রাশিয়ার পুনঃপুনঃ পরাজয়ে জারের শাসনের দুর্বলতা চরমে পৌঁছিলে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হইয়া ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসের ৬ই তারিখ বল্‌শেভিক্‌ দলের হস্তে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হইলে বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করে।

রুশ বিপ্লব ছিল দুইটি প্রধান নীতির উপর নির্ভরশীল—(১) মার্কসীয় মতবাদ ও (২) উহার পদ্ধতি। মার্কসের মতবাদ (Marxian Philosophy)-এর উপর নির্ভরশীল, এই কারণে স্বভাবতই বিপ্লবী রাশিয়া শ্রেণীবৈষম্যহীন জনসমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর ছিল। আর শ্রেণীবৈষম্যহীন জনসমাজ গঠনের পন্থা (Method) হিসাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা ধনতন্ত্রের অবসান ঘটান অপরিহার্য। এবিষয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই সুস্পষ্ট দুইটি মতবাদ দেখা দিয়াছিল—জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অবসানের নীতি ও সর্ব-জাগতিক ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া রুশ সাম্যবাদ তথা সাম্যবাদ-নীতি রক্ষা করিবার নীতি।

রুশ বিপ্লবের আদর্শ—মতবাদ ও পন্থা

যাহা হউক, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ বিপ্লব অর্থাৎ বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লব সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন দেখা দিল। বলশেভিক সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে অপসরণের জন্য যে-কোন মূল্যে জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত হইলেন। ব্রেস্ট্‌-লিট্‌ভস্কের শান্তি-চুক্তি দ্বারা রাশিয়া জার্মানিকে মোট পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিশাল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই কঠোর শর্তে শান্তি স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল, কারণ ইহার ফলে বল্‌শেভিক্‌ সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন।

ব্রেস্ট্‌-লিট্‌ভস্কের শান্তি-চুক্তি

**সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্ক ১৯১৭-২০ (Soviet Foreign Relations 1917-20)ঃ** বল্‌শেভিক্ সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই পররাষ্ট্রের নিকট হইতে জার শাসনকালে গৃহীত ঋণ এবং স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অস্বীকার করিলে মিত্রশক্তিবর্গ রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অপরাপর দেশের ধনতান্ত্রিক শাসনের অবসান ও পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ স্থাপনের সংকল্প ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সন্দেহ ও ভীতি বৃদ্ধি করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশ সমগ্র রাশিয়ার অবরোধ ঘোষণা করিয়া ভ্লাডিভস্টক মার্মান্স্ক্, আর্চেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানে মিত্রপক্ষ সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। ইহা ভিন্ন এই সুযোগে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও ট্রান্সককেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। রুমানিয়া বেসারাবিয়া অধিকার করিয়া লইল। এইভাবে বল্‌শেভিক্ সরকার সমগ্র ইওরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রত্যক্ষ শত্রুতার সম্মুখীন হইলেন।* বিদেশী সৈন্যগণ বল্‌শেভিক্ শাসন-বিরোধী রুশদের সহিত যোগদান করিয়া 'লাল' (Red) সরকারের স্থলে 'সাদা' (White) সরকার স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল।†

জাপান, আমেরিকা ও ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক বল্‌শেভিক্ শাসনের বিরোধিতা

এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া বল্‌শেভিক্ সরকারকে প্রথমে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক সেনাবাহিনীর রাশিয়ায় প্রবেশ প্রকৃত দেশপ্রেমিক রুশদের সমর্থন লাভ করিল না। বল্‌শেভিক্ শাসনের পক্ষপাতী না হইলেও বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে অনেকেই উহার সাহায্যে দণ্ডায়মান হইল। জারদের আমলে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন তাঁহাদের দান এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলের কৃষকসম্প্রদায় বল্‌শেভিক্ আদর্শের কোন ধারণা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এবং সেই সরকার কর্তৃক বাধ্যতা-মূলকভাবে কৃষকদের নিকট হইতে ফসল আদায়ের নীতির বিরোধী হইলেও

বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশ, যুবক কর্মচারিবৃন্দ ও কৃষকদের সাহায্য

* Langsam, p. 317.

† "The foreign troops co-operated with the anti-Bolshevik natives to set up 'white' government."—*Ibid*, p. 317.

তাহারা জার-শাসন পুনঃস্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিল। স্বভাবতই তাহারা বিদেশীদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্ সরকারকে সাহায্যদানে দ্বিধা করিল না।

এমতাবস্থায় বল্‌শেভিক্ সরকার 'চেকা' (Cheka) নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। রুশ-বিপ্লব প্রতিরোধ, সরকারী সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি যাহা-কিছু বল্‌শেভিক্ শাসনবিরোধীরা করিতেছিল তাহা বন্ধ করাই ছিল 'চেকা' নামক প্রতিষ্ঠানটির কর্তব্য। ফরাসী বিপ্লবের কালে ফ্রান্সে বিপ্লবী ট্রাইব্যুন্যাল (Revolutionary Tribunal)-এর মতই রুশ 'চেকা' বহু বল্‌শেভিক্ বিরোধীর প্রাণনাশ করিল। ইহা ভিন্ন জারের আমলের সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে একলক্ষ লালফৌজ (Red Army)-কে আধুনিক সমর-শিক্ষা দেওয়া হইল। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্রত্যেক দেশেই আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের সমস্যা দেখা দিল। ফলে মিত্রশক্তিবর্গের যে সকল দেশ রাশিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল সেগুলির পক্ষে বল্‌শেভিক্ সরকার দমনের আগ্রহ প্রদর্শন আর সম্ভব হইল না। তদুপরি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রাশিয়ায় একলক্ষ সৈনিকের 'লালফৌজ' গড়িয়া উঠিলে সেই আগ্রহ আরও দমিত হইল। রাশিয়ার ন্যায় বিশাল দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লাভবান হইবার ইচ্ছাও ইওরোপীয় দেশসমূহের ছিল। ফলে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি প্রভৃতি রাশিয়ার অবরোধ উঠাইয়া লইল। ঐ বৎসরেরই শেষভাগে বল্‌শেভিক্ সরকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিরোধিতার অবসান ঘটাইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর পর (১৯১৪-২০) রাশিয়ায় শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক্ রাশিয়া স্বল্প-পরিসর ছিল, কারণ, তখনও ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, হোয়াইট রাশিয়া, ইউক্রাইন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীন অথবা বিদেশী অধিকারে ছিল। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই বল্‌শেভিক্ রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ বৎসরই বল্‌শেভিক্ রাশিয়া 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাব্‌লিকস্' ('Union of Soviet Socialist Republics) নাম ধারণ

'চেকা (Cheka) ও 'লালফৌজ' (Red Army) গঠন

বল্‌শেভিক্ সরকার কর্তৃক আভ্যন্তীণ বিদ্রোহ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান

ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস্ (U.S.S.R.) নামকরণ

করে। সরকারী কাগজপত্রে 'রাশিয়া' নামটি ঐ সময় হইতে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য অর্থাৎ Republics-এর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১৬টি।

**সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্ক, ১৯২০-১৯৩৯ (Soviet Foreign Relations, 1920-1939):** ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটিলে স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থায়িত্বলাভ করিল। কিন্তু পররাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আরও কয়েক বৎসর সন্দেহ ও বিদ্বেষপূর্ণ রহিয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক যুগের ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতির মূল ধারাকেই অস্বীকার করিয়াছিল। আধুনিক যুগের ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র-সম্পর্কের মূলধারা বা নীতি-ই হইল শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পররাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তাহাদের নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অথবা সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবার নীতি অনুসরণ করিবে না। যুদ্ধের কালে এই নীতির ব্যতিক্রম হইলেও শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি করিবে না।* কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সাম্যবাদের সর্বজাগতিক আবেদনে বিশ্বাসী, সেজন্য তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা, চিঠিপত্রাদি ও প্রচারের মাধ্যমে সাম্যবাদ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারের সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলেন।† ইহা ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশে ধনতন্ত্রের অবসান না ঘটিলে

---

* "To undermine security of another state by spreading disaffection among its subjects was an expedient which might be justified in time of war, but which was altogether contrary to the idea of normal relations. Soviet theory boldly rejected these fundamental assumptions." Carr, pp. 72-73.

† "So proud, however, were the Russian Revolutionaries of their methods, that they largely neutralised their effects by the extreme frankness with which they were in the habit of discussing them." Hardy, p. 105

সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্যবাদ স্থায়িত্বলাভ করিবে না এই ধারণার বশবর্তী হইয়াও তাঁহারা সাম্যবাদকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। এজন্য অপরাপর রাষ্ট্রে প্রচারকার্য চালান প্রয়োজন হইল। ফলে, অপরাপর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই অবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য জনসাধারণের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারিবে, এই ভীতিও ইওরোপীয় দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রথমে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইল না।

সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী প্রচার-কার্যের ফলে অপরাপর রাষ্ট্রে বিদ্বেষ ও ভীতির সৃষ্টি

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক শত্রুতাপূর্ণ

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী আদর্শ ও প্রচারকার্যাদির ফলে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান যেভাবে ব্যাহত হইয়াছিল উহার অবসান ঘটান সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সোভিয়েত সরকার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পর আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে পূর্ণ-সাম্যবাদের স্থলে 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' ( New Economic Policy = NEP ) চালু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আগ্রহের পশ্চাতেও প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্যিক চুক্তি ( Anglo-Russian Trade Agreement ) স্বাক্ষরিত হইল। পরবৎসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জের চেষ্টায় প্রথমে কেনেস এবং পরে জেনোয়াতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহূত হইল। ল্যয়েড জর্জ আশা করিয়াছিলেন যে, জেনোয়া সম্মেলনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্তু ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধিদ্বয় রাশিয়া কর্তৃক জার আমলের যাবতীয় বৈদেশিক

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য চুক্তি (১৯২১)

কেনেস ও জেনোয়া সম্মেলন, (১৯২২)

ঋণ স্বীকার না করিলে কোনপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে রাজী হইলেন না। ফলে, রাশিয়ার সহিত ইওরোপীয় শক্তিবর্গের কোনপ্রকার মৈত্রী স্থাপিত হইবার বাধার সৃষ্টি হইলে রুশ প্রতিনিধি দেখিলেন যে, একমাত্র জার্মানিকে নিজপক্ষে টানিতে পারা যাইতে পারে। জার্মানি তখনও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সমপর্যায়ভুক্ত হয় নাই, সুতরাং রুশ প্রতিনিধি জার্মানি যাহাতে সোভিয়েত-বিরোধী দলের সহিত যোগ না দেয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেনোয়া সম্মেলনের বাহিরে রুশ-জার্মান প্রতিনিধিদ্বয় আলাপ-আলোচনা করিয়া 'র‍্যাপালো ( Rapallo ) চুক্তি' স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তাদির কোন গুরুত্ব ছিল না বটে, কিন্তু এই চুক্তি জার্মানির ন্যায় একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকর্তৃক সোভিয়েত রাষ্ট্রের তথা সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য তখন পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, র‍্যাপালোর সন্ধি এক দিকে যেমন সোভিয়েত সরকার ও জার্মান সরকারের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে উভয় দেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানি ও রাশিয়ার ন্যায় দুইটি বৃহৎ দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার অদূরদর্শিতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুইটি দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবার-বহির্ভূত রাখিবার ত্রুটি র‍্যাপালোর চুক্তির পর সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

'র‍্যাপালোর চুক্তি'—ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপ

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লেবার পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করিলে লেবার মন্ত্রিসভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। ঐ বৎসরই আগষ্ট মাসে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর যাবতীয় দেনা-পাওনা ও দাবি-দাওয়া নাকচ করা হইল। ইহা ভিন্ন উপযুক্ত গ্যারান্টির বিনিময়ে সোভিয়েত সরকারকে ঋণদানের প্রতিশ্রুতিও ব্রিটিশ সরকার দিলেন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনমত, বিশেষভাবে রক্ষণশীলদলের সমালোচনার ফলে, এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, ১৯২৪

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃত

খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সাধারণ নির্বাচনে লেবার দলের পতন ঘটিলে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা পুনরায় গঠিত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তির শর্তানুসারে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেনে কোনপ্রকার সাম্যবাদী প্রচারকার্য চালাইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তাঁহারা রক্ষা করেন নাই।*

ইতালি, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি কর্তৃক সোভিয়েত সরকার স্বীকৃত

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, ফ্রান্স, জাপান ও অপরাপর ইওরোপীয় দেশ আনুষ্ঠানিক-ভাবে সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সোভিয়েত সরকারকে তখনও স্বীকার করিতে রাজী হইল না। যাহা হউক, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশেষভাবে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত সরকার সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের উপর আর ততটা গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। ইহার ফলে অপরাপর দেশের পক্ষে সোভিয়েত সরকারের সহিত আদান-প্রদানের পথও সহজ হইয়া উঠিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকারের কূট-নৈতিক অদূরদর্শিতা হেতু পরিস্থিতির কতক অবনতি ঘটিল। সোভিয়েত সরকার

সোভিয়েত সরকারের কূটনৈতিক অদূর-দর্শিতা

ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদী প্রচারকার্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন অথচ সেই সকল দেশের নিকট হইতে নানা-প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা গ্রহণের এবং সেই সকল দেশ কর্তৃক সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির চেষ্টাও তাঁহারা করিতে লাগিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের লোকার্ণো চুক্তি ছিল আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সমতার প্রতীকস্বরূপ অথচ সোভিয়েত সরকার এই চুক্তিকে সোভিয়েত-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলিয়া আখ্যা দিলেন। লোকার্ণো চুক্তি জার্মানির পূর্ব-সীমান্তের প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া জার্মানিকে উহা নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তনের সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে ইহা ছিল আপত্তিজনক, একথা অবশ্য স্বীকার্য। পর বৎসর ( ১৯২৬ খ্রীঃ ) সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক অদূরদর্শিতার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। ঐ বৎসর গ্রেট ব্রিটেনের খনিগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু

* Tinoviev Letter, vide Carr, p. 76.

হইলে সোভিয়েত সরকার ধর্মঘটীদের অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলে, ব্রিটেনের সহিত সোভিয়েত ইউ-নিয়নের যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল উহা বহুলাংশে বিনষ্ট হইল। শুধু ব্রিটেনের সহিত-ই নহে, সোভিয়েত সর-কারের নীতি ফ্রান্সের সহিতও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সও উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী-সোভিয়েত সৌহার্দ্যের পথ কতকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকার ফরাসী দেশ হইতে কোন কোন সামগ্রী আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া, ফরাসী সরকারের নিকট রাশিয়ার ঋণ অস্বীকার করিয়া, বিশেষভাবে প্রয়োজনবোধে ধনতান্ত্রিক দেশ হইতে সোভিয়েত রাশিয়ার লালফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে ঘোষণা করিয়া ফরাসী সরকারকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। সাময়িকভাবে পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটিল যে, ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটাইলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২৪-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে সোভিয়েত কূট-নৈতিক অসাফল্যের প্রধান কারণ ছিল কমিন্‌টার্নের অর্থাৎ তৃতীয় ইণ্টারন্যাশন্যালের ( Third International ) সাম্যবাদ প্রচার নীতি।* যাহা হউক, সাম্যবাদী প্রচারকার্য ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এমন কি গ্রেট ব্রিটেনেও অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত সরকারকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। উপরন্তু ইংলণ্ডে অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসে ব্রিটিশ-সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের কতক কতক প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য চুক্তি নাকচ করিয়া দিলেন (১৯২৭)। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত দূতগণকে গ্রেট ব্রিটেন হইতে চলিয়া যাইবারও

ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদী প্রচারকার্য —ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য

তৃতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যালের কার্য-কলাপে সোভিয়েত কূটনীতিকদের অসাফল্য

* Gathorne Hardy, p. 108.

আদেশ দেওয়া হইল। ঐ বৎসর-ই পোল্যাণ্ডে অবস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূতের হত্যা এবং চীনদেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাস আক্রমণ সোভিয়েত সরকারের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যখন এইরূপ তখন কমিউনিস্ট পার্টি হইতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-এর বহিষ্কার সাম্যবাদী বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-স্পৃহা কতকটা হ্রাস করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে স্ট্যালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে সাম্যবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। ট্রট্স্কির মতে ধনতান্ত্রিক দেশ-সমূহের মধ্যে এককভাবে রাশিয়া সাম্যবাদী আদর্শ বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে না, এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান নীতি হওয়া উচিত পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্যবাদী বিপ্লবের সৃষ্টি করা। এজন্য রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বিলম্বিত হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে স্ট্যালিনও রাশিয়ায় সাম্যবাদপূর্ণ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কির বহিষ্কার সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি করিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রচারের দিকে আর ততটা মনোযোগী হইবে না।

সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের রূপান্তর : ট্রট্স্কির বহিষ্কার

পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ইওরোপীয় দেশ-সমূহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া ইতালি ও তুরস্কের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া অর্থনৈতিক আদান-প্রদান শুরু করিল। ইহার দুই বৎসর পর (১৯৩৩) রাশিয়া পোল্যাণ্ড, পারস্য, আফগানিস্তান, ল্যাট্ভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করিল। ঐ বৎসরই চীনদেশের সহিত রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইল।

ইওরোপীয় ও প্রাচ্যাঞ্চলের দেশ-সমূহের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্য-মূলক চুক্তি

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি সোভিয়েত সরকারের সমর্থন লাভ করে নাই। সোভিয়েত সরকার এই চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত বিভিন্ন রাজ্যের সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার (Status Quo) নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু হিট্লারের অধীনে

সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমর্থন

জার্মানির পুনরুত্থান সোভিয়েত রাশিয়াকে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার অর্থাৎ Status Quo রক্ষা করিবার নীতির সমর্থক করিয়া তুলিল। কারণ, রাশিয়ার দিকে জার্মানির সম্ভাব্য বিস্তার-নীতি তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশা ছিল। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করিবার নীতিও মানিয়া লইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্তি ইহার পরিচায়ক।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্তি

সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরি-উক্ত পরিবর্তন স্বভাবতই ফরাসী-রুশ সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। রাশিয়া কর্তৃক জার্মানির সহিত র‍্যাপালোর ( Rapallo ) মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর, জার আমলের যাবতীয় ঋণ অস্বীকার এবং ফ্রান্স কর্তৃক জারতন্ত্রের সমর্থকদের আশ্রয় দান ও রাশিয়ার শত্রুদেশ রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপন, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়া কর্তৃক সর্বাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব প্রভৃতি রুশ-ফরাসী বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসি দলের অভ্যুত্থান, ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দলের অভ্যুত্থান, সুদূর প্রাচ্যে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সহিত এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। প্রধানত ফ্রান্সের নির্দেশেই রুমানিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পর বৎসর ( ১৯৩৫ খ্রী: ) ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরস্পর সাহায্যের এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। অপর দিকে জাপানের ক্রমপ্রসার নীতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার বহির্মঙ্গোলিয়ার সহিত পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন ( ১৯৩৬ )।

নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থান—রুশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের নীতি পরিবর্তন

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি—রুশ-মঙ্গোলিয়ার মৈত্রী

সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সম্পর্ক যখন এইভাবে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-

পরিবারের সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ তথা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি-বর্গের উদাসীনতা রাশিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। অনুরূপ জার্মানি কর্তৃক রাইন অঞ্চলে পুনরায় সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার বিরোধিতা না করাও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নীতি সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারকে সন্দিহান করিয়া তুলিল। তদুপরি অক্ষশক্তিবর্গ অর্থাৎ জার্মানি-ইতালি-জাপানের কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর এবং হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকারকালে ইঙ্গ-ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা ক্রমেই সোভিয়েত সরকারের ভীতির কারণ হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় মিউনিক চুক্তি ( ১৯৩৮ ) দ্বারা ( Munich Pact ) ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি হিট্‌লারকে চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করিতে দিলে ইওরোপীয় শক্তি-বর্গ রাশিয়ার নিরাপত্তার কথা মোটেই ভাবিতেছে না ইহা সোভিয়েত সরকারের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করিলেন। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যে-কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিলে রাশিয়ার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা—সোভিয়েত সরকারের সন্দেহের কারণ

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় কর্তৃক ইতালি ও জার্মানির প্রসার-নীতির পরোক্ষ সমর্থন রাশিয়ার উদ্বেগের কারণ

সুতরাং আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে হইল। জার্মানির সহিত যাহাতে শীঘ্রই যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইতে হয় সেজন্য সোভিয়েত সরকার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক অনাক্রমণ-চুক্তি ( Non-Aggression Pact ) স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে হিট্‌লারও রাশিয়াকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির পক্ষে পোল্যাণ্ড আক্রমণের আর কোন বাধা রহিল না। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিলেন।

মিউনিক চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল—রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি ( আগস্ট, ১৯৩৯ )

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ( সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ )

# পঞ্চম অধ্যায়

## জার্মানির পুনরভ্যুত্থান : নাৎসি পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## ( German Resurgence : Nazi Foreign Relations )

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা ( Economic Prostration of Germany after the First World War ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী দেশমাত্রেরই অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘটিয়াছিল। নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অভাব, মূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা প্রত্যেক দেশেই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছিল বহুগুণে বেশি। বিশাল ক্ষতি-পূরণ দানের সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধে পরাজয়-জনিত হতাশা জার্মানির যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এমতাবস্থায় জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। মূল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে যেমন অচল করিয়া দিয়াছিল, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকেও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। জন-সাধারণের আর্থিক দুর্দশার সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য সহজেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময়ে এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার নামে জনৈক প্রাক্তন সৈনিক 'ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট' ( National Socialists ) বা নাৎসি ( Nazi ) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। হিট্‌লারের নেতৃত্বাধীনে ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট দল বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হৃতমর্যাদা জার্মানি পুনরায় ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি যে মানিয়া চলিবে না, বা এইরূপ শান্তি-চুক্তি জার্মানির পক্ষে যে মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না একথা সকলেই, এমন কি, ফরাসীরাও স্বীকার করিত। কিন্তু ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিজম-এর নামে এবং হিট্‌লারের নেতৃত্বাধীনে জার্মানিতে যে এইরূপ প্রতিক্রিয়াপন্থী সরকার স্থাপিত হইবে

যুদ্ধোত্তর কালে জার্মানির দুর্দশা

নাৎসি দলের অভ্যুত্থান

এবং জার্মানির পুনরুভ্যুত্থান যে সমগ্র ইওরোপের রাজনৈতিক ভার-সাম্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া এক দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করিবে তাহা অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক টয়েনবি অবশ্য নাৎসিদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, নাৎসিবাদের সকল কিছুই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা না গেলেও একথা বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই যে, ইহা নিম্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক মতবাদ।* ডক্টর উল্‌ফার ( Dr. Wolfer )-ও নাৎসি দল সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

হিট্‌লারের নেতৃত্ব

নাৎসি নেতা হিট্‌লারের সমগ্র জার্মানি ও জার্মান জাতির একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। হিট্‌লার মূলত জার্মানির নাগরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ার অধিবাসী। অথচ তিনিই জার্মানির শক্তি ও জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হের হেস্, গোয়েরিং, ফেডার, রোজেনবার্গ, গোয়েব্‌লস্ প্রভৃতির সাহায্যে হিট্‌লার 'ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট'নামক দল গঠন করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ফলে, তাঁহাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় হিট্‌লার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ মেঁই ক্যাম্পফ্ (Mein Kampf) রচনা করেন। নাৎসি দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ এই গ্রন্থে উল্লিখিত নীতির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, হিট্‌লার তথা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল (১) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি নাকচ করা, (২) জার্মান জাতির লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা (Pan-Germanism), (৩) জার্মান-

হিট্‌লার, গোয়েরিং, হেস্, গোয়েব্‌লস্ প্রভৃতি কর্তৃক নাৎসিদল গঠন

মেঁই ক্যাম্পফ গ্রন্থে বর্ণিত নাৎসি দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

* "...many things might be obscure, but one thing you could count on was that Nazis were on the down-grade".—*Toynbee*, vide, *International Affairs*, 1934, p. 343 ; Hardy, p, 357.

অধ্যুষিত বিদেশী সরকারের অধীন অঞ্চলসমূহে জার্মান ঐক্যের ধারণার সৃষ্টি করিয়া সেই সকল অঞ্চলকে জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা। এই শেষোক্ত নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হিট্‌লার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জার্মানির পদাতিক, নৌ, বিমান, গোলন্দাজ প্রভৃতি চারিটি বাহিনী ত' রহিয়াছেই ইহা ভিন্ন জার্মান জাতির লোক বিদেশে যেখানেই বসবাস করিতেছে তাহারা সকলেই 'পঞ্চম বাহিনী' স্বরূপ কাজ করিবে। (এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশদ্রোহিতার কাজ এখন পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ—Fifth column activities—নামে অভিহিত হইয়া থাকে)। (৪) নাৎসিবাদের অপর আদর্শ ছিল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা এবং যেহেতু জার্মানগণ জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ সেহেতু সর্বত্র জার্মান অধিকার স্থাপন করা।

উপরি-উক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম পন্থা ছিল প্রচারকার্যের উপর জোর দেওয়া। এই প্রচারকার্যে সত্য-মিথ্যার কোন ধার ধারা হইত না। প্রচারকার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক করিয়া তোলা। ব্যক্তির জীবন ও কার্যকলাপ রাষ্ট্রের উন্নতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নহে এই ধারণার সৃষ্টি করাও ছিল এই প্রচার-কার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। হিট্‌লার 'জনসাধারণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবপ্রবণ, যুক্তি ও বিচার ক্ষমতাহীন' বলিয়া মনে করিতেন। স্বভাবতই, জনসাধারণকে নানাভাবে উস্কাইয়া দিয়া তিনি কার্যসিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন।

নাৎসি কার্যপন্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা ও মানসিক অসন্তুষ্টির সুযোগ লইয়া হিট্‌লারের নেতৃত্ব ক্রমেই সমগ্র জার্মান জাতির উপর বিস্তৃত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির হস্তে জার্মানির পরাজয় এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অপমানজনক শর্তাদি জার্মান জাতিকে প্রতিশোধ-পরায়ণ করিয়া রাখিয়াছিল। হিট্‌লারের নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও নীতি স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ফলে, নাৎসি দলের সদস্য সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাৎসি দলের সমর্থকদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসর সাধারণ নির্বাচনে জার্মান প্রতিনিধি সভা 'রাইকৃস্ট্যাগ্'-এ (Reichstag) নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও হের্

নাৎসি দলের সমর্থক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

ফন্ প্যাপেন-এর রাজনৈতিক কারসাজির ফলে নাৎসি নেতা হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় জার্মান প্রতিনিধি-সভা 'রাইক্‌স্ট্যাগ্'-এর মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮৪-জনের মধ্যে নাৎসি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯৬। যাহা হউক্, একবার ক্ষমতায় আসীন হইয়া হিট্‌লার তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাইক্‌স্ট্যাগ্ সভাগৃহে জনৈক অর্ধ উন্মাদ ওলন্দাজ অগ্নিসংযোগ করিলে হিট্‌লার সেজন্য কমিউনিস্ট্‌দিগকে দায়ী করিলেন। এই অজুহাতে তিনি কমিউনিস্ট্ ও সোশিয়াল ডেমোক্রেট্ দলের নেতৃবর্গ যাঁহারা রাইক্‌স্ট্যাগের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দেশে কমিউনিস্ট ভীতির ধুয়া তুলিয়া হিট্‌লার নাৎসি দলের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পরবর্তী যে নির্বাচন হইল তাহাতে নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে হিট্‌লার রাইক্‌স্ট্যাগের সাহায্যে চারি বৎসরের জন্য পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা বাতিল করিলেন এবং নাৎসি দল ও উহার নেতা—অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ আইন পাস করাইয়া লইলেন। এইভাবে হিট্‌লার যখন জার্মান রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিনায়কে পরিণত হইলেন সেই সময়ে জার্মান প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিট্‌লার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট উভয়পদেই নিযুক্ত হইলেন। তিনি হইলেন জার্মান জাতির ফুহ্‌রার (Feuhrer)। হিট্‌লারের একক-অধিনায়কপদে আসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল ইহুদি নির্যাতন। জার্মান জাতি 'আর্য' সেহেতু সেমিটিক জাতির লোকের প্রতি তাহাদের তীব্র ঘৃণা ছিল। আর্য জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অন্যতম উপায় হিসাবে ইহুদি নির্যাতন পৃথিবীর সর্বত্র ঘৃণার উদ্রেক করিল। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও হিট্‌লারের ইহুদি নির্যাতন নীতির হাত হইতে রেহাই পাইলেন না।

হিট্‌লারের ক্ষমতালাভ

কমিউনিস্ট্ ও সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দল দমন

হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্ব লাভ

**নাৎসি পররাষ্ট্র-নীতি ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক (Nazi Foreign Policy and Foreign Relations) ঃ** ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট তথা নাৎসি দলের পররাষ্ট্র-নীতির আংশিক আলোচনা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শের

আলোচনাকালে করা হইয়াছে। নাৎসি দলের আবেদন জার্মান জাতির নিকট যাহাতে মনোগ্রাহী হয় সেজন্য প্রচারকার্যের যেমন ত্রুটি ছিল না, তেমনি পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণেও নাৎসি দলের জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। হিট্‌লার তথা নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য ও নীতি হিট্‌লার রচিত মেঁই ক্যাম্পফ্ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

নাৎসি জার্মানির পররাষ্ট্র-নীতি :

প্রথমত, ইওরোপীয় মহাদেশে জার্মানি ভিন্ন অপর কোন দেশকে প্রাধান্য অর্জনে বাধা দান। এজন্য জার্মানির সীমান্তবর্তী ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা জার্মান জাতিকে আক্রমণাত্মক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে বাধাদান করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন যে রাষ্ট্রের শক্তি জার্মান জাতির কোন প্রকার অস্বস্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে হইবে।

(১) ইওরোপ মহাদেশে জার্মানি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তির উত্থান রোধ

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর চুক্তি জার্মানিকে পদানত ও হৃতমর্যাদা করিয়াছিল। এই চুক্তি ও সেণ্ট্ জার্মেইনের চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। বলাবাহুল্য এই নীতি জার্মানির সকল শ্রেণীর লোকের আন্তরিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি ছিল বলিয়া ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য হিট্‌লারের যাবতীয় কার্যকলাপ জার্মান জাতির স্বাভাবিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

(২) ভার্সাই ও সেণ্ট্ জার্মেইন-এর চুক্তি বাতিলকরণ

তৃতীয়ত, জার্মান জাতির লোক অধ্যুষিত ইওরোপের যাবতীয় অঞ্চল লইয়া বৃহত্তর জার্মান জাতি ও জার্মান রাষ্ট্র গঠন। 'প্যান-জার্মানিজম্' (Pan-Germanism) ছিল নাৎসি দলের অন্যতম প্রধান নীতি এবং পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তিস্বরূপ।

(৩) জার্মান জাতির সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা—'প্যান জার্মানিজম্'

চতুর্থত, জার্মান জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য এবং জার্মানির উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় রাজ্যজয়। রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন সীমান্তবর্তী রাজ্য সম্পর্কেই এই নীতি প্রযোজ্য ছিল।

(৪) জার্মানির উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় রাজ্য-জয়

(৫) জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নয়ন

সর্বশেষে, নাৎসিদল তথা হিট্‌লারের চরম উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিতে পারিলে হিট্‌লার নিজের তথা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে মনে করিতেন।*

উপরি-উক্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া হিট্‌লার তথা নাৎসি সরকার জার্মান জাতিকে ব্যাপক প্রচারকার্যের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। যুদ্ধ নীতিগতভাবে সকলের নিকট-ই ঘৃণ্য হইলেও জাতীয় মর্যাদা, রাষ্ট্রগত প্রাধান্য প্রভৃতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সম্মোহিনী শক্তির প্রভাব এড়াইয়া চলা বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মানির জাতীয় অপমান দূর করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জার্মান রাষ্ট্রের ও জার্মান জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার সংকল্প জার্মানির সকল শ্রেণীর লোকেরই সমর্থন লাভ করিল।

নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির সম্মোহিনী প্রভাব

হিট্‌লারের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং জার্মান পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে তাঁহার নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রচার ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বভাবতই জার্মানি সম্পর্কে এক ভীতির সঞ্চার করিল। জার্মান আক্রমণের ভীতি জার্মান রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের মধ্যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। জার্মানির পুনরুত্থান আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইল।

নাৎসি-নীতি ও প্রচার-কার্যের ফলে ইওরোপে ভীতির সৃষ্টি

জার্মানির পুনরুত্থান ও 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ফ্রান্স ও রাশিয়ার সর্বাধিক ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইলেও ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভের উল্লাস শেষ হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই ফ্রান্স নিজ জয়কে প্রকৃত জয় বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে ফ্রান্সের

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা

*"World-power or nothing" Hardy. p. 362.

চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু কোনভাবেই ফ্রান্স নিজ মনোমত কোন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বা শান্তি ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। লোকার্নো চুক্তি এবিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইলেও নিরাপত্তা সম্পর্কে ফ্রান্সের যে ধারণা ছিল তাহা ইহাতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার উপায় হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল মাত্র। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর অনাক্রমণ-চুক্তি ( Non-Aggression Pact ) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু হিট্‌লারের জার্মানির একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং তাঁহার সাম্যবাদ-বিরোধী নীতি সাম্যবাদী দেশ রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। জার্মানি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলে রাশিয়ার তথা সাম্যবাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই কারণে সোভিয়েত সরকার ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখিবার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে হিটলারের নীতি ও প্রকাশ্য উক্তিতে ফ্রান্সের ভীতি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি কর্তৃক লীগ ত্যাগ ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক প্রস্তুতি ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফলে ফ্রান্স রাশিয়াকে লীগের সদস্যপদভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল এবং ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও ইতালির উদ্যোগে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাশিয়া প্রথমে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ বিরোধী ছিল কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় লীগের সদস্যপদভুক্ত হইয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্য পরস্পর সামরিক সাহায্যের এক চুক্তিতে দৃঢ়তর হইল ( ১৯৩৫ )।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান—ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার ভীতির কারণ

রাশিয়ার লীগ-সদস্য পদভুক্তি—রুশ-ফরাসী পরস্পর সাহায্যের চুক্তি ( ১৯৩৫ )

নাৎসি জার্মানির উত্থান 'লিট্‌ল আঁতাত' ( Little Entente )-এরও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। প্রধানত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভার্সাই-এর শর্তাদি যাহাতে পরিবর্তন করিতে না পারে সেজন্যই 'লিট্‌ল আঁতাত' গঠিত

হইয়াছিল। জার্মানির আক্রমণ হইতে কেবলমাত্র চেকোস্লোভাকিয়া ভিন্ন অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রের (যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া) তেমন ভীতির কারণ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রুমানিয়ার ভীতির কারণ আর যুগোস্লাভিয়ার ভীতির কারণ ছিল ইতালি। লিট্‌ল আঁতাত-এর এই দুইটি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি অনভিপ্রেত ছিল না। ব্রেনার গিরিপথের দিকে জার্মানির বিস্তার ইতালি-অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ভীতি হইতে যুগোস্লাভিয়াকে কতকটা মুক্ত করিয়াছিল। অনুরূপ রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বেসারাবিয়ার অধিকার লইয়া মনোমালিন্য ছিল বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী জার্মানির অভ্যুত্থান রুমানিয়ার পক্ষে কাম্য ছিল। এমতাবস্থায় বাহ্যত 'লিট্‌ল আঁতাত'-এর সদস্যরাষ্ট্রবর্গ পরস্পর সৌহার্দ্য ও সাহায্য-সহায়তার কথা বলিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার আন্তরিক সমর্থন ছিল জার্মানির পক্ষে আর চেকোস্লোভাকিয়ার সমর্থন ছিল রাশিয়ার পক্ষে। এইভাবে বলকান অঞ্চলে নাৎসি জার্মানির সমর্থকের অভাব হইল না।

জার্মানির পুনরুত্থান— 'লিট্‌ল আঁতাতের' উপর প্রভাব

জার্মানির পুনরুত্থান ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে ফ্রান্স চিরশত্রু জার্মানির বিরুদ্ধে নিজ সীমারেখার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। বলা বাহুল্য জার্মানির পুনরুত্থান ফ্রান্সের পক্ষেই সর্বাধিক ভীতি ও ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বার্থো (Barthou) জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত পরস্পর সাহায্যের চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে সৌহার্দ্যমূলক দৌত্য-কার্যে গমন করিলেন। ইহার পর তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে পূর্ব-ইওরোপীয় শক্তিবর্গের একটি মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করিলেন। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া ও বাল্টিক রাজ্যগুলির মধ্যে লোকার্ণো চুক্তির অনুরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করা হইলে পোল্যাণ্ড উহাতে রাজী হইল না। কারণ,

জার্মানির পুনরভ্যুত্থান ফ্রান্সের ভীতির কারণ

ফ্রান্স কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের লোকার্ণো (Eastern Locarno) চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব

পোল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে ইতিমধ্যে একটি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া পোল্যাণ্ড জার্মান-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরে স্বীকৃত হইল না। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার প্রতি পোল্যাণ্ড ছিল শত্রুতাভাবাপন্ন, কারণ, পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দীর্ঘকাল রাশিয়ার অধিকারে ছিল, পোল্যাণ্ডবাসীরা সেকথা ভুলে নাই। পোল্যাণ্ডের বিরোধিতায় পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রবর্গের লোকার্ণো চুক্তি (Eastern Locarno) শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হইল না। যাহা হউক ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বার্থো গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া ও তুরস্ক—এই চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে অনুরূপ আঞ্চলিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জার্মানির বিরুদ্ধে আবেষ্টনী গড়িয়া তুলিবার কার্যে আরও উৎসাহিত হইলেন। বলকান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত উপরোক্ত মৈত্রী-চুক্তি 'বলকান চুক্তি' (Balkan pact) নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুলগেরিয়া বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হয় নাই। কারণ, বুলগেরিয়া প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু বলকান চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রবর্গ উহা রক্ষা করিয়া বিশেষভাবে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি বজায় রাখিয়া জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করিবার পক্ষপাতী ছিল। যাহা হউক, বার্থো তাঁহার চেষ্টায় দমিলেন না। কিন্তু বুলগেরিয়া ও ইতালি উভয়দেশই প্যারিসের শান্তি-চুক্তি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া এই দুই দেশে স্বভাবতই মিত্রতা স্থাপিত হইল। বুলগেরিয়া বলকান চুক্তিতে যোগ না দিয়া ইতালির সাহায্যের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিবার ফলে বলকান চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইল। কারণ এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ছিল বলকান অঞ্চলে জার্মানি তথা ইওরোপের কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের কোনপ্রকার প্রাধান্য বিস্তারে বাধা দান করা। বুলগেরিয়া-ইতালি সৌহার্দ্য এবং বুলগেরিয়া কর্তৃক বলকান চুক্তি প্রত্যাখ্যানের ফলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

পোল্যাণ্ডের বিরোধিতা—পূর্ব-ইওরোপের লোকার্ণো চুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ

বলকান চুক্তি (Balkan Pact) —বুলগেরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

বলকান চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ

এদিকে জার্মানির পুনরুত্থান পোল্যাণ্ডের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলে

পোল্যাণ্ড আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিতই অনাক্রমণ নীতি এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর সমস্যার সমাধানের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিল (জানুয়ারি, ২৬, ১৯৩৪)। জার্মানি ও রাশিয়ার রাজ্যাংশ কাড়িয়া লইয়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড গঠিত হইয়াছিল।

জার্মানি ও পোল্যাণ্ড

জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নাই এবং হিট্‌লার তথা নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উহার পরিবর্তন সাধন। এজন্য জার্মানি পোল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে একথা পোল্যাণ্ডবাসীদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু পূর্ব শত্রু রাশিয়ার সহিত পোল্যাণ্ডের মিত্রতা স্থাপনের প্রশ্নও ছিল অবান্তর। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে দশ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ড ও জার্মানি পরস্পর সমস্যা সমাধানে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও

জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর সমস্যা সমাধানের দশসালা চুক্তি

জার্মানির মধ্যে র‍্যাপ্যালো (Rapallo)-এর মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে পোল্যাণ্ডে ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ, রাশিয়া ও জার্মানি উভয় দেশই ছিল পোল্যাণ্ডের শত্রুদেশ। এই দুই শত্রুদেশ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাইবে একথা পোল্যাণ্ড-বাসীরা জানিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্রান্স ছিল পোল্যাণ্ডের একমাত্র মিত্র। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের দুর্বলতার কথাও পোল্যাণ্ডবাসীর অবিদিত ছিল না। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী নাৎসি জার্মানির উত্থান পোল্যাণ্ডের ভীতি কতক পরিমাণে দূর করিল। এইভাবে ক্রমে পোল্যাণ্ড জার্মানির দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সহিত পোল্যাণ্ডের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অন্তত দশ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ডের ভীতি যেমন কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল, তেমনি জার্মানিকে অপরাপর সমস্যার প্রতি পূর্ণমাত্রায় মনোযোগ দিবার সুযোগ দিয়াছিল।

জার্মানির পুনরুত্থান ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের আলোচনা হইতেই বুঝিতে

পারা যায়। মুসোলিনি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভার্সাই-এর চুক্তির পরিবর্তনের উপরই ইওরোপীয় শান্তি নির্ভরশীল। জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তি পরিবর্তন না করিয়া ছাড়িবে না একথা নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইতালির দিক দিয়াও প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার পক্ষেও শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইওরোপের নিরাপত্তা বা শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তনই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মুসোলিনি ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Four-Power Pact) প্রস্তাব করিলেন। ইওরোপের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা এবং প্যারিসের শান্তি-চুক্তির—অর্থাৎ ভার্সাই, সেন্ট জার্মেইন, নিউলি প্রভৃতি চুক্তির পরিবর্তন সাধনই ছিল এই চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য। ইওরোপের প্রধান শক্তিবর্গের—ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেনের জার্মানির প্রতি তোষণমূলক নীতি অনুসরণের প্রস্তাব 'লিট্‌ল আঁতাত' স্বাক্ষরকারী দেশগুলি—চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, এবং বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রেট ব্রিটেনেও এই চুক্তির বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশিত হইল। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের চাপে চতুঃশক্তি চুক্তির শর্তাদির এমন পরিবর্তন করা হইল যে, ফলে উহার মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া উহা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িল।

চতুঃশক্তি চুক্তি (Four-Power Pact)

১৯১৯ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বাবধি অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ লোকই জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তির (Anschluss) পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলন থামাইয়া দিল। কারণ, অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ—সোশিয়েল ডিমোক্রেটিক দল, ইহুদিগণ কেহই জার্মান জাতির ন্যায় নাৎসি স্বৈরাচারের অধীন হইতে রাজী হইল না। হিট্‌লারের ক্যাথলিক চার্চ-বিরোধী নীতির ফলে অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক চার্চ নাৎসি-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক

জার্মানি ও অস্ট্রিয়া

চার্চের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে, ক্যাথলিক চার্চও নাৎসি জার্মানির সহিত সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করিলে অস্ট্রিয়া কেবল জার্মানির সহিত সংযুক্তির বিরোধী হইল না নাৎসিদের প্রতিও শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে নাৎসি সরকার অস্ট্রিয়ায় জার্মানির পক্ষে এবং অস্ট্রিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইলেন এবং গোপনে অস্ট্রিয়ার নাৎসি দলকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইতে লাগিলেন। ফলে, অস্ট্রিয়ায় নাৎসি দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়া ইতালির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। ইতালি অস্ট্রিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিল, কিন্তু সেই সাহায্যের বিনিময়ে সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ফ্যাসিস্ট্ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসনব্যবস্থা অস্ট্রিয়ায় স্থাপন করিতে হইল। ফলে, অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইতালির প্রভাব বিস্তৃত হইল। এইভাবে হিট্লারের অস্ট্রিয়া নীতি বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মিত্রতা

হিট্লারের অস্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতা

হিট্লার তাঁহার অস্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া পরবর্তী দুই বৎসর (১৯৩৪-৩৬ খ্রীঃ) অস্ট্রিয়ার প্রতি কতকটা উদার নীতি অবলম্বন করিলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বন্ধ করা হইল, ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা জার্মানি কখনও ক্ষুণ্ণ করিবে না এরূপ ঘোষণাও হিট্লার একাধিকবার করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ইওরোপে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিলে ইওরোপীয় মহাদেশে মুসোলিনির প্রভাব হ্রাস পাইল। অস্ট্রিয়া এমতাবস্থায় জার্মানির সহিত এক সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইতালি-জার্মান সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিলে অস্ট্রিয়ার উপর ইতালি ও জার্মানির এক যুগ্ম প্রভাব বিস্তৃত হইল।

ইতালি-জার্মানি মৈত্রী

**রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গ (Rome-Berlin-Tokyo Axis):** ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকারের (১৯৩৬) পূর্বাবধি গ্রেট বিট্রেন, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মৈত্রী হিট্লারের অস্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এই মৈত্রী নাশ করিলে অস্ট্রিয়ার উপর জার্মান প্রভাব

বিস্তারের যেমন সুযোগ বৃদ্ধি পাইল, তেমনি ইতালি-জার্মানি মিত্রতার পথও উন্মুক্ত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়া নিজেকে একটি 'জার্মান রাজ্য' ( German State ) বলিয়া স্বীকার করিল এবং জার্মানি অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত একটি পরস্পর মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এদিকে আবিসিনিয়া অধিকারে ব্যস্ত থাকার ফলে ইতালি অস্ট্রিয়ার উপর নিজ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে আর তেমন আগ্রহান্বিত হইল না। ইতালি অস্ট্রিয়ায় নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসে আপত্তি না করিবার ফলে জার্মানির পক্ষে অস্ট্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইতালি ও জার্মানির পরস্পর বৈরীভাব দূরীভূত হইয়া উভয়ের মধ্যে মিত্রতার পথ উন্মুক্ত হইল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় অপরাপর দেশ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করিলেন। কিন্তু এই সমর্থন বাস্তব সাহায্যে রূপান্তরিত হইল না। মুসোলিনি অবশ্য প্রকাশ্যভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। হিট্‌লারও এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তাঁহার নব গঠিত বিমান বাহিনীর ( Luftwaffe ) যুদ্ধ-দক্ষতা এবং নূতন নূতন মারণাস্ত্রের শক্তি পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ সেই পরীক্ষার সুযোগ দান করিলে হিট্‌লার মুসোলিনির সহিত যুগ্মভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। উদারনৈতিক ইওরোপীয় দেশসমূহ একক অধিনায়কত্বের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহাও এই স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে যাচাই করা যাইবে ইহাও হিট্‌লারকে মুসোলিনির সহিত যুগ্মভাবে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে ইতালি-জার্মানি মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিট্‌লার ইতালির সহিত 'অক্টোবর প্রোটোকোল' ( October Protocol ) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর দুই দেশের সৌহার্দ্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে

ইতালি ও জার্মানির মধ্যে মিত্রতার পটভূমিকা

অক্টোবর প্রোটোকোল

হিট্‌লার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট-বিরোধী ( Anti-Comintern ) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া সাম্যবাদীদের অর্থাৎ কমিউনিস্ট্‌দের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং রাশিয়ার সহিত কোন প্রকার চুক্তিবদ্ধ না হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর বৎসর (১৯৩৭, নভেম্বর) ইতালি ও জার্মানির মধ্যে একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইল। এইভাবে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর মিত্রতা স্থাপিত হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোও হিট্‌লারের পক্ষে যোগদান করিলেন। এই শক্তিজোটের বিপক্ষে তখন ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া।

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের মিত্রতা

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানির সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত হইলে জার্মানির সামরিক শক্তিশকট যথেচ্ছভাবে চালনার কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সামরিক অধিনায়ক মাত্রেই হিট্‌লারের প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসরণেও কোন বাধা রহিল না। ঐ বৎসরেই (১৯৩৮ খ্রীঃ) হিট্‌লারের ইঙ্গিত ও প্ররোচনায় অস্ট্রিয়ায় নাৎসি দল এক দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে হিট্‌লার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর স্থচ্‌নিগ্‌ (Schuchnigg)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিট্‌লারের চাপে স্থচ্‌নিগ্‌ নাৎসি দলভুক্ত অস্ট্রিয়াবাসীদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থচ্‌নিগ্‌ হিট্‌লারের প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও অস্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত জার্মানির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অল্পকালের মধ্যেই হিট্‌লার সৈন্য প্রেরণ করিয়া বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়া স্পেনীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে অগ্রসর না হইবার ফলে এই সকল শক্তির পক্ষে জার্মানিকে বাধা দিবার শক্তি বা আগ্রহ তেমন নাই একথাই হিট্‌লার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি ভার্সাই চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল

অস্ট্রিয়ার পর আসিল চেকোস্লোভাকিয়ার পালা। চেকোস্লোভাকিয়ার

সুদেতেন অঞ্চল ছিল জার্মান জাতিঅধ্যুষিত অঞ্চল। হিট্‌লার ঐ অঞ্চলে তাঁহার 'পঞ্চম বাহিনী' (fifth column) অর্থাৎ অর্থভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানির সহিত সংযুক্তির সপক্ষে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করাইলেন। এই আন্দোলনের অজুহাতে হিট্‌লার জার্মানির সহিত সুদেতেন অঞ্চলের ( Sudeten Land ) সংযুক্তি দাবি করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি আরও দুইদিক হইতে আসিল। দানিউব নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দশলক্ষ ম্যাগিয়ার হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্তি দাবি করিল। পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে টেশেন (Teschen) দাবি করিয়া বসিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে চেকোস্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা দেখা দিল। হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি উপলব্ধি করিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার সীমায় সৈন্য সমাবেশ শুরু করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার এই জাতীয় বিপদে রাশিয়া ও ফ্রান্সের শরণাপন্ন হইলেন। এই দুই দেশ চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য-দানে রাজী হইলে এক বিরাট ইওরোপীয় যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) আসন্ন যুদ্ধ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মিউনিক ( Munich) নামক স্থানে হিট্‌লারের সহিত আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব আলোচনা করিলেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মসিয়েঁ দালাদিয়ার ( Daladiar ) তাঁহার সহিত এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে আসিলেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়া সরকারকে জার্মানির নিকট সুদেতেন অঞ্চল হস্তান্তর করিতে চাপ দিলে চেকোস্লোভাকিয়া সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন।* ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দুর্বলতাজনিত জার্মান তোষণ-নীতি হিট্‌লারের দাবি ও ঔদ্ধত্য

হিট্‌লারের সুদেতেন অঞ্চল দাবি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি প্রচেষ্টা

ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের জার্মান তোষণ-নীতি

---

* "This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary surgical operation." Carr, p. 270.

আরও বাড়াইয়া দিল। হিট্‌লার এখন কেবলমাত্র সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন তিনি সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়াই অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স বাধ্য হইয়াই স্থির করিল যে, হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা চেকোস্লোভাকিয়াকে সামরিক সাহায্য দান করিবে। চেম্বারলেন ইংলণ্ডের সামরিক দুর্বলতার কথা জানিতেন। তিনি এবিষয়ে মধ্যস্থতার জন্য মুসোলিনির নিকট আবেদন জানাইলে মুসোলিনির চেষ্টায় মিউনিক শহরে হিট্‌লার, চেম্বারলেন, দালাদিয়ার ও মুসোলিনির এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কোন প্রতিনিধিকে ইহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। চেম্বারলেন, দালাদিয়ার, মুসোলিনি প্রভৃতির অনুরোধে হিট্‌লার কেবলমাত্র সুদেতেন অঞ্চল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই আপোষ-মীমাংসা মিউনিক চুক্তিনামক একটি দলিলে (Munich Pact) সন্নিবিষ্ট হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসহ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দেশ চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেশেন দাবি এবং হাঙ্গেরী কর্তৃক ম্যাগিয়ার অধ্যুষিত অঞ্চলটির উপর দাবি চেকোস্লোভাকিয়াকে মানিতে হইল। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার এক বিশাল অঞ্চল জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী কর্তৃক অধিকৃত হইল।

মুসোলিনির মধ্যস্থতা

মিউনিক চুক্তি (Munich Pact, 1938)

মিউনিক চুক্তি ইঙ্গ-ফরাসী তথা ইওরোপের কূটনৈতিক পরাজয় ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এই চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে ইওরোপীয় যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইলেও চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মানির গ্রাস হইতে রক্ষা করা বা দীর্ঘকাল ইওরোপকে যুদ্ধ-মুক্ত রাখা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর সাময়িক কালের জন্য ইওরোপে যে শান্তি বজায় ছিল সেই সুযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময় পাইয়াছিল—ইহাই

ইঙ্গ-ফরাসী তথা ইওরোপীয় কূটনৈতিক পরাজয়

হইল মিউনিক চুক্তির স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি। বস্তুত, ইহা হিট্‌লার-তোষণ-নীতির এক অতি লজ্জাকর উদাহরণ।

মিউনিক চুক্তি মানিয়া চলা হিট্‌লারের ইচ্ছা ছিল না। চেকোস্লোভাকিয়ার শাসনাধীন জার্মান জাতির অবশিষ্ট প্রায় আড়াইলক্ষ লোকের নিরাপত্তার অজুহাতে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাচা (Hacha)-কে এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। এই বৈঠকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া হিট্‌লার হ্যাচাকে চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া নামক দুইটি প্রদেশ জার্মানির সংরক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানির কবলে আসিল।

হিট্‌লার-হ্যাচা বৈঠক

জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া কবলিত

ইহার পর চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লার লিথুনিয়াকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মেমেল (Memel) বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডানজিগ্ (Danzig) বন্দরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাংশের সহিত সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একখণ্ড সংযোগভূমিও (corridor) দাবি করিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড হইতে 'ডানজিগ' বন্দর ও সংযোগভূমি দাবি

হিট্‌লারের মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করা এবং অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হইল না। অচিরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিট্‌লার-তোষণ-নীতি পরিত্যাগে বাধ্য হইল। ডানজিগ ও সংযোগ পথ দখল করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে স্থির হইল। ইহা ভিন্ন রাশিয়াকেও দলে টানিবার চেষ্টা চলিল। এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হিট্‌লার-তোষণ-নীতি এবং জার্মানির কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপ ও প্রচারকার্য রাশিয়ার ভীতির সৃষ্টি করিল। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া, 'সুদেতেন ল্যাণ্ড', ক্রমে সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস, পক্ষান্তরে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক মিউনিক

ফ্রান্স ও ব্রিটেন কর্তৃক পোল্যাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান

চুক্তি স্বাক্ষর রাশিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া চলিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ রাশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন সম্পর্কে মোটেই মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন, বরঞ্চ কমিউনিস্ট-বিরোধী জার্মানির রাশিয়ার প্রতি শত্রুতা তাঁহাদের অনভিপ্রেত নহে, এই সব বিবেচনা করিয়া রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তাব করিল। জার্মানিও রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণের সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে উপলব্ধি করিয়া রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহান্বিত হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৪শে তারিখ রাশিয়া ও জার্মানি পরস্পর অনাক্রমণ ও তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরপেক্ষতার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। কয়েকদিন পরই (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (Russo-German Non-Aggression Pact, 1939)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থান : ফ্যাসিস্ট পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## (Rise of Fascist Italy : Fascist Foreign Relations)

**যুদ্ধোত্তর ইতালি : ফ্যাসিজম্‌-এর উদ্ভব (Post-war Italy : Rise of Fascism) :** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির জাতীয়তা-বিরোধী শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক একতা লাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা ইতালির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয়দিগের জাতীয়তাবোধ

ও দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিল। জাতীয় মর্যাদা বা জাতীয় আশঙ্কা বলিয়া কিছুই ইতালীয় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা যেমন ছিল স্ব স্ব প্রধান তেমনি ছিল হুজুগপ্রিয়। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষে যেসকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির কিছুই তাহাদের ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ইতালিতে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের অভাব

জাতির এই ধরণের অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফল মিলিত হইলে ইতালিতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যে স্বার্থনাশ হইয়াছিল এবং যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সেই তুলনায় প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে অতি সামান্য মাত্রই ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত লণ্ডন চুক্তিতে প্রতিশ্রুত স্থানসমূহ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। ফলে, প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালিবাসীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এই ধারণা ইতালি-বাসীদের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তন সাধন ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইতালি-বাসীদের মনোভাব যখন এইরূপ সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমস্যা-প্রসূত অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা দেশের সর্বত্র এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য জিনিসপত্রের অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধিতে মজুরদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিলে মজুরী বৃদ্ধিকল্পে তাহারা ধর্মঘট শুরু করিল। এমতাবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য স্বভাবতই উৎসাহিত হইল। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জন-সাধারণের উপর শ্রেণী বৈষম্যহীন, জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার মত উদারপন্থী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ এক সম্মোহনী শক্তির ন্যায় কাজ করিল। ফলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, রাশিয়ার ন্যায় ইতালিও উগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ সাম্যবাদী দেশে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির সাহায্যের বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর ক্ষতি-পূরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক দুর্দশা—সাম্যবাদী প্রচার-কার্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত

পরিণত হইবে এই আশঙ্কা সকলের মনেই জাগিল। 'রাজতন্ত্রের পতন হউক' ( Down with the King ), 'লেনিন দীর্ঘজীবী হউন' ( Long live Lenin ) প্রভৃতি ধ্বনি ইতালির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

বিপ্লবী পন্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ ইতালির সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকগণ জমিদাররের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কৃষকরা দখল করিয়া লইল। শহর এলাকায় শিল্পপতিগণ মজুরী হ্রাস না করিলে এবং শ্রমিকরা অধিক সময় কাজ না করিলে কারখানা চালু রাখা অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তেই গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিক ও কৃষকরা তাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা কারখানা বা জমি দখল করা গেলেও সেগুলি পরিচালনা করা তত সহজ নয়। অনভিজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকগণ ক্রমেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষক-মজদুর সরকার স্থাপন ও পরিচালন তেমন সহজ হইবে না। প্রচলিত পার্লামেন্টারী প্রথা যেমন দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজদুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অনুরূপ অক্ষম হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া ইতালিবাসী পুনরায় একটি কার্যকরী সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সমাজ ও যুব সমাজ ইতালির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সরকারের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নূতন কোন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) দলের উত্থান অতি সহজ হইল। ফলে জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং শাসনব্যবস্থায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুসোলিনি।

কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন

কৃষক-মজদুরদের অকৃতকার্যতা

সরকারের প্রতি শিক্ষিত ও যুব সমাজের অশ্রদ্ধা

মুসোলিনির নেতৃত্ব

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি যুদ্ধাবসানে কর্মচ্যুত সৈনিকদের ও দেশের

মঙ্গলার্থী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে সমবেত ব্যক্তিবর্গ এক বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সর্বসম্মতিক্রমে সমাজের প্রতি স্তর হইতে সংখ্যানুপাতে দেশের সকল প্রতিনিধি সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ, শ্রমিকদের দৈনিক আটঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর স্থাপন, মূলধনীদের উপর কর স্থাপন, ধর্মাধিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ, উর্ধ্ব কক্ষ সেনেট-এর বিলোপ সাধন, জাতীয় সভা আহ্বান, গোলাবারুদ তথা অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানাগুলির জাতীয়করণ, রেলপথ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের পরিচালনাধীনে স্থাপন প্রভৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈনিকদের জন্যই প্রচার করা হইতে লাগিল। মুসোলিনি যে সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন উহার অধিকাংশ সভ্যই Fasci'd azione নামে এক সংঘের সহিত জড়িত ছিল। এই সংঘের নাম হইতেই ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফ্যাসিস্ট্ আন্দোলনের সূচনা

ফ্যাসিস্ট্ দলের উৎপত্তি

মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্দল আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় শাসনব্যবস্থা তখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ফ্যাসিস্ট্দল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নিজ হইতেই গ্রহণ করিল। যেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা বা গোলযোগ দেখা দিল সেখানেই ফ্যাসিস্ট্ দল বলপূর্বক তাহা দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ বিপ্লব-বিরোধী ফ্যাসিস্ট্গণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুদ্ধ এই সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ দলের সহিত ফ্যাসিস্ট্দের বিরোধ

যুদ্ধোত্তর ইতালির শাসনভার ছিল প্রথমে মন্ত্রী নিটি (Nitti) এবং পরে মন্ত্রী গিওলিটি (Giolitti)-এর অধীনে। কিন্তু ইঁহারা কেহই দেশের

অরাজকতা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের যুদ্ধোত্তর দুর্দশারও কোন উপশম করিতে তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্‌দল দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্‌দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করিলে সরকার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিটি ও গিওলিটির মন্ত্রিত্ব

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট্‌দল সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ করিত এবং কাল পোশাক ( Black shirt ) পরিত। সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ তাহাদিগকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্‌দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ফ্যাসিস্ট্‌দলই জয়লাভ করিল। এইভাবে ফ্যাসিস্ট্‌দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ফ্যাসিস্ট্‌ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এদিকে ইতালীয় সরকারের দুর্বলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু মুসোলিনি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। কারণ তিনি এইভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ইতালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্‌ বাহিনীর সাহায্যে রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। এইজন্য তিনি মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনি তাঁহার ফ্যাসিস্ট্‌ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ইতালির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে মুসোলিনিই ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উপাধি হইল Il Duce। রাজা স্বভাবতই ক্রমে নেপথ্যে সরিয়া গেলেন।

মুসোলিনির 'Coup d'etat'

ফ্যাসিস্ট দলের ক্ষমতা লাভ

ফ্যাসিস্ট্‌দলের শাসনক্ষমতা লাভের পশ্চাতে জনমতের সক্রিয় সহায়তা না

থাকিলেও, জনমত উহার বিরোধী ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রচলিত শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট্ দল জনস্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং মুসোলিনি যখন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন ইতালীবাসীর সমর্থন যে তাহার পশ্চাতে ছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।*

জনমতের সমর্থন

মুসোলিনির ঘোষণা হইতেই ফ্যাসিস্ট্ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদাবৃদ্ধিই হইবে ফ্যাসিস্ট্ শাসনের মূল উদ্দেশ্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিক মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তি রাষ্ট্রের তথা সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার্থ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বীকৃত হইবে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হইবে। শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না। এই কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের পরিদর্শনাধীনে থাকিবে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা Laissez faire নীতি স্বভাবতই আর রহিল না। ধর্মের ক্ষেত্রেও মুসোলিনি ঐক্যনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্ দলের উদ্দেশ্য ছিল ইতালির মর্যাদা অর্জন এবং প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ।

ফ্যাসিবাদ তথা মুসোলিনির উদ্দেশ্য ও নীতি: আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ ও প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ

**ইতালির পররাষ্ট্র সম্পর্ক: ইতালি ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ: (Italian Foreign Relations: Italy & South-Eastern Europe):** প্যারিসের শান্তি-চুক্তি ইতালির ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া

* "It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had not enjoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant section of public opinion." Riker, p. 757.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত গুরুত্ব বা মূল্য দেয় নাই, এই ধারণা ইতালিবাসীর এক গভীর অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত লণ্ডন চুক্তি অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদানের বিনিময়ে ইতালিকে দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া প্রভৃতি আড্রিয়াটিক অঞ্চলের স্থানসমূহ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই চুক্তির তৃতীয় শর্তের* দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, আফ্রিকা মহাদেশে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিলে ইতালির আফ্রিকাস্থ উপনিবেশের এবং গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের উপনিবেশের সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে যাহাতে ইতালির স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয় এবং ইতালি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ লাভ করে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট্ ও ইস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল ইতালীয়দের হইতে ভিন্ন জাতির লোক। উইলসনীয়-নীতি অনুসারে সংখ্যালঘু ইতালীয় জাতির লোক অধ্যুষিত অঞ্চল ইতালির সহিত সংযুক্ত হওয়া অবৈধ ছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন লণ্ডনের গোপন চুক্তি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল বলিয়া উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, ইতালি দক্ষিণ-টাইরল লাভ করিবে। কিন্তু ইতালি একদিকে লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে টাইরল, ট্রিয়েস্ট প্রভৃতি স্থানগুলিতে ইতালীয়গণ সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও অধিকার করিতে চাহিল, অপরদিকে উইলসনের জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া যুগোস্লাভিয়া হইতে 'ফাইউম্' (Fium) নামক স্থানটিও দাবি করিল। কারণ, সেই স্থানে

ইতালি ও প্যারিসের চুক্তি

ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার বিরোধ

* "In the event of Great Britain and France increasing their colonial territories in Africa at the expense of Germany, Italy should obtain equitable compensation by a favourable adjustment of the frontiers between her existing African colonies and the contiguous colonies of Great Britain and France." Vide : Carr, p. 70.

ইতালি জাতির লোক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এইভাবে একই সময়ে উইলসনীয় নীতির বিরোধিতা ও সমর্থন দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ বরদাস্ত করিলেন না। কারণ, ফাইউম্ ছিল যুগোস্লাভিয়ার একমাত্র বাণিজ্য বন্দর। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া এই শহরটি ইতালির অধীনে স্থাপিত হওয়া যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ফলে, প্যারিস সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ, বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট উইলসন ইতালির দাবির বিরোধিতা করিলেন।

ইতালি কর্তৃক ফাইউম্ দাবি—প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

ফাইউমের উপর ইতালির দাবি প্রত্যাখ্যাত হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইতালীয় সরকারের ইঙ্গিতে ডি' এ্যান্থন্‌জিও ( D' Annunzio ) নামে জনৈক অবাস্তব ইতালীয় কবি একদল বেসরকারী সৈন্য লইয়া ফাইউম্ শহরটি দখল করিলেন। মিত্রশক্তিবর্গ যুগোস্লাভিয়া ও ইতালি ফাইউম্-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিজেরাই মিটাইয়া লইবে এই মনে করিয়া আর কোন কিছু এবিষয়ে করিতে চাহিল না। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে ফাইউম্ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল। অবশেষে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির চাপে পড়িয়া যুগোস্লাভিয়া এক চুক্তি দ্বারা ( ২৭শে জানুয়ারি, ১৯২৪ ) ফাইউম্ অঞ্চল ইতালির সহিত ভাগ করিয়া লইল। আর ফাইউম্ শহরটি যুগোস্লাভিয়া ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল। মুসোলিনি ফাইউমের নিকটস্থ ব্যারোস নামক বন্দরটি যুগোস্লাভিয়াকে ফিরাইয়া দিলেন। ফাইউমের বন্দরের মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়াকে বাণিজ্য পরিচালনার স্থযোগও দেওয়া হইল। এইভাবে দীর্ঘকালের বিবাদের মীমাংসা হইলে ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। পর বৎসর ( ১৯২৫ খ্রীঃ ) অপর একটি চুক্তিপত্রের দ্বারা—নেটিউনো চুক্তিপত্র (Nettuno Convention)—উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল।

ইতালি কর্তৃক ফাইউম্ দখল

ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার চুক্তি (১৯২৪)

ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনির অধীনে ইতালির পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব তথা পূর্ব-ইওরোপে ( Eastern Europe ) রাজ্য গ্রাস

এবং সেই অঞ্চলে ইতালির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন। এই নীতি অনুসরণের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, পশ্চিম ইওরোপের জাতীয়তার ভিত্তিতে সুগঠিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ইতালির রাজ্যগ্রাস নীতি কার্যকরী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অথচ পূর্ব-ইওরোপে নবগঠিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে এই নীতি সাফল্যলাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। যুগোস্লাভিয়ার প্রতি অনুসৃত নীতিও এই মূল নীতিরই অনুসরণ মাত্র। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কতকটা সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই মুসোলিনির আলবানিয়া নীতি সেই সৌহার্দ্য বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে ইতালিকে 'ভেলোনা' বন্দরটি ( Valona Port ) এবং আলবানিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলবানিয়ার উপর বা ভেলোনা বন্দরের উপর ইতালির অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। উপরন্তু আলবানিয়াকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইতালির বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই এই ধারণা ব্রিটেন ও ফ্রান্সেরও জন্মিয়াছিল। ফলে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান লীগ কাউন্সিল দ্বারা প্রস্তাব পাস করাইয়া লইল যে, কোন শত্রুশক্তিদ্বারা আক্রান্ত হইলে আলবানিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব ইতালি গ্রহণ করিবে। মিত্রশক্তিবর্গ ইতালিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে আলবানিয়ার উপর ইতালির প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। ইতালির এই কূটচাল যুগোস্লাভিয়ার গভীর সন্দেহ ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেটিউনো চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্কের কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু মুসোলিনির আক্রমণাত্মক নীতি এই সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দিল না। যে-কোনপ্রকারে আলবানিয়া কুক্ষিগত করা-ই ছিল ইতালির উদ্দেশ্য। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও আলবানিয়ার মধ্যে টিরানা চুক্তি

দক্ষিণ-পূর্ব-ইওরোপে ইতালীয় বিস্তার নীতি

ইতালি-আলবানিয়া সমস্যা

( Treaty of Tirana ) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। তদুপরি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করিল যে, যুগোস্লাভিয়া আলবানিয়া অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বৎসরই আলবানিয়ার জনৈক মন্ত্রীকে ইতালির অর্থভোগী একজন আলবানিয়াবাসী হত্যা করিলে মুসোলিনি যে-কোন উপায়ে আলবানিয়া গ্রাস করিতে এবং পরে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে ব্যগ্র একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ( এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আলবানিয়া অধিকার করিয়াছিল )। এদিকে বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সংযুক্তির চেষ্টা চলিতেছিল। মুসোলিনির ইঙ্গিতে বুলগেরিয়ায় যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু হইলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ঐ বৎসরই (১৯২৭) ইতালি ও হাঙ্গেরীর মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য এবং পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটমাট করিবার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে এবং মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্ ইতালি কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে আধিপত্য বিস্তার নীতি যুগোস্লাভিয়ার সমূহ বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যুগোস্লাভিয়াকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিবার উদ্দেশ্যেই ইতালি উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, এই ধারণা যুগোস্লাভিয়া-বাসীদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ইতালি-যুগোস্লাভিয়া পরস্পর সম্পর্কের অবনতি

ইতালি কর্তৃক যুগোস্লা-ভিয়াকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া সরকার যখন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নেটিউনো চুক্তিপত্র ( Nettuno Covention ) আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিবে কিনা বিবেচনা করিতেছে সেই সময়ে যুগোস্লাভিয়ায় এক ব্যাপক ইতালি-বিরোধী মারামারি শুরু হইলে যুগোস্লাভিয়া ও ইতালির পরস্পর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিল।

ইতালির সহিত দ্বন্দ্বে যুগোস্লাভিয়ার সাফল্য লাভ অসম্ভব একথা যুগোস্লাভিয়াবাসী তথা যুগোস্লাভিয়া সরকার ভাল ভাবেই জানিত। এজন্য যুগোস্লাভিয়া ইতালির সহিত মিত্রতা-নীতি অনুসরণে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ইতালির আক্রমণাত্মক নীতি সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। ফ্রান্সের

যুগোস্লাভিয়া কর্তৃক ইতালির প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণের চেষ্টা

সহিত যুগোস্লাভিয়া মিত্রতাবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার কালেও ইতালিকে সেই মিত্রতাচুক্তিতে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইতালি যুগোস্লাভিয়ার সহিত কোনপ্রকার মিত্রতার পক্ষপাতী ছিল না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে 'নাৎসি নেতা হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ও তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতির প্রকাশ্য বিশ্লেষণ অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বলকান অঞ্চল এমনকি ইতালিতেও ভীতির সঞ্চার করিল। ইতালি ও অস্ট্রিয়া পরস্পর বিরোধিতা ভুলিয়া মিত্রতা নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিল। ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতার স্থলে মিত্রতা নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। হাঙ্গেরী ও ইতালি পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইতে বিলম্ব করিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে তুরস্ক, গ্রীক, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া বলকান অঞ্চলে পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিল (১৯৩৪)। এই চুক্তি যুগোস্লাভিয়ার ইতালি ভীতি কতক পরিমাণে দূরীভূত করিল বটে, কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যে অক্টোবর (১৯৩৪ খ্রীঃ) ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বার্‌থে ও যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেক্‌জাণ্ডার মার্সাই (Marsseilles) বন্দরে আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলে যুগোস্লাভিয়াবাসী এই হত্যাকাণ্ড ইতালির ইঙ্গিতেই ঘটিয়াছে সন্দেহ করিল। এই বিষয়টি লীগ কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য যুগোস্লাভ সরকার প্রস্তুত হইলে ফরাসী সরকারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত উহা আর করা হইল না। ইতালির মিত্রতা নাশের আশঙ্কা হইতেই ফরাসী সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলা বাহুল্য। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক এইভাবে অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক এইরূপ তিক্ত ছিল।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান —ইতালি যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্কের অবনতি

মার্সাই হত্যাকাণ্ড

ফ্যাসিস্ট্ নেতা মুসোলিনি আড্রিয়াটিক সাগরের উপর ইতালির প্রাধান্য বিস্তার, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থবৃদ্ধি করিতে সাফল্যলাভ

করিয়াছিলেন তাহা উপরি-উক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত যুগ্মভাবে মরক্কোর পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত ট্যাঞ্জিয়ার শহরের উপর আন্তর্জাতিক সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত নৌ-সম্মেলনে ( Naval Conference, 1930 ) ফ্রান্সের সহিত সামরিক সমতা লাভের দাবি উত্থাপন ও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তনের দাবি প্রভৃতি এবং সাইরেনেইকা ও মিশরের মধ্যে সীমা নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে উহা ইতালির স্বপক্ষে মীমাংসিত হওয়া ইতালির আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ইতালির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

**ইতালি ও ফ্রান্স ( Italy & France ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছিল। এই কারণে বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাহ দিতেন। এদিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং প্রধানত জীবিকা অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ফরাসী সরকার এই সকল ইতালীয়কে ফরাসী নাগরিকত্ব দান করিয়া ইতালিবাসীকে ফ্রান্সে চলিয়া আসিতে পরোক্ষ-ভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের লোকক্ষয় এইভাবে পূরণ করিবার ইচ্ছাও ফরাসী সরকারের ছিল। এই বিষয় লইয়া ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইতালি ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের কারণ :

ফরাসী সরকার কর্তৃক ইতালিবাসীদের ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণে উৎসাহ দান

কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির মনোমালিন্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইতালির স্বার্থের উপেক্ষা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইতালিকে দক্ষিণ টাইরল, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া, ভেলোনা বন্দর, আলবানিয়ার উপর সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সুযোগ-সুবিধা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু

এই সকল শর্ত উইলসনীয় জাতীয়তাবাদী নীতির বিরোধী ছিল বলিয়া এবং বিশেষভাবে জাতীয়তার অজুহাতে ফাইউম শহরের উপর ইতালির দাবি প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সমর্থিত হয় নাই এজন্য ইতালি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। লণ্ডন চুক্তির সকল শর্ত রাজী না হইবার পশ্চাতে ফ্রান্সের দায়িত্বই বেশি ছিল একথা ইতালীয় সরকার তথা ইতালি-বাসী মনে করিত। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইতালির স্বার্থ নাশের জন্য ফ্রান্সকে তাহারা দায়ী করিয়াছিল। আফ্রিকায় ইতালির ঔপনিবেশিক শক্তিবৃদ্ধিও ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের অভিপ্রেত ছিল না। লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া শক্তি-সাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইতালির ক্ষমতা অত্যধিক যাহাতে বৃদ্ধি না পায় সেই উদ্দেশ্যে প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় কর্তৃক ইতালির ন্যায্য দাবি স্বীকৃত হয় নাই।

প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থ উপেক্ষিত

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্টবাদের অভ্যুত্থান এবং ফ্যাসিস্ট্ সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি ইতালি-ফ্রান্স বিরোধিতা আরও তীব্র করিয়া তুলিল। ফ্যাসিস্ট্‌গণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থহানির জন্য প্রধানত ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিলে এবং ফ্যাসিস্ট্ ইতালির আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিল। ইতালির ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার জন্য স্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল কাঁচা-মালের। ইতালীয় সাম্রাজ্য বিস্তার-ই ছিল এই উভয় উদ্দেশ্য সফল করিবার একমাত্র পন্থা। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তানুসারে যে রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হইয়াছিল উহার পরিবর্তনের মধ্যেই ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নিহিত ছিল। এজন্য ইতালি প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তন দাবি করিল। পক্ষান্তরে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ফ্রান্স প্যারিসের শান্তি-চুক্তি—ভার্সাই, সেণ্ট্ জার্মেইন প্রভৃতি চুক্তিসমূহ অপরিবর্তিত রাখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। এই পরস্পর-বিরোধী পররাষ্ট্র-নীতি

ইতালিবাসীর মতে প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থ-নাশের জন্য দায়ী ফ্রান্স

ফ্রান্স কর্তৃক প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অপরি-বর্তিত রাখিবার চেষ্টা —পক্ষান্তরে ইতালি কর্তৃক প্যারিসের শান্তি চুক্তির পরিবর্তন দাবি

স্বভাবতই ফ্রান্স ও ইতালির বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফ্যাসিস্ট্-বিরোধী যে সকল ইতালিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ফ্যাসিস্ট্-বিরোধী প্রচারকার্য এবং ফ্যাসিস্ট্-নেতা মুসোলিনিকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র স্বভাবতই ইতালি-ফ্রান্স-বিরোধ গভীর শত্রুতায় পরিণত করিল।* ইতালি ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের অপর কারণ ছিল ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস। পক্ষান্তরে ইতালি ছিল ফ্যাসিস্ট্ একক অধিনায়কত্বে বিশ্বাসী। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বও দুই দেশের সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন দানিউব অঞ্চল, উত্তর-আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ও বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতাও এই দুই দেশের বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল।* ফ্রান্স অধিকৃত স্যাভয়, নিস্, কর্সিকা ও টিউনিশিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালির দাবি-ই অধিকতর ন্যায় সঙ্গত বলিয়া ইতালীয়গণ মনে করিত। ট্যাঞ্জিয়ারের উপর আধিপত্য বিস্তার লইয়াও ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইতালিকে ট্যাঞ্জিয়ারের শাসন ব্যাপারে অংশ দান করিতে হইয়াছিল। সর্বশেষে, ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সহিত নৌবলের সমতা দাবি ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুত, ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে ইতালিকে নৌবলে ফ্রান্সের সহিত সমতাদান করিলে ফ্রান্স, তাহা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে নৌ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ফ্রান্স ইতালির সহিত সমতার বিরোধিতা করিতে শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইতালি এই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইভাবে ইতালি ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ইতালীয়গণ কর্তৃক ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ

ফ্রান্স ও ইতালির পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ

ভূমধ্যসাগর, বলকান, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিযোগিতা

ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সহিত নৌবলের সমতা দাবি

* G. Hardy, p. 161

উঠিলে উভয় দেশই ইওরোপ, বিশেষভাবে পূর্ব-ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সচেষ্ট হইল। ইতালি কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া ও চেকো-স্লোভাকিয়ার সহিত মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর এবং ফ্রান্স কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন ফরাসী-ইতালি প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পর্যায় বিশেষ। 'লিট্‌ল আঁতাত' ( Little Entente ) দেশসমূহ অবশ্য ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া থাকুক ইহা-ই ইচ্ছা করিত, কারণ তাহা হইলে এই দুই দেশের কোনটি-ই বলকান অঞ্চলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রলাভের জন্য প্রতি-যোগিতা চলিতে লাগিল। হাঙ্গেরী, আলবানিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, তুরস্ক, স্পেন, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ইতালি মিত্রতাবদ্ধ হইল, পক্ষান্তরে ফ্রান্স রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করিল। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইতালি এই সকল দেশের সহিত একচেটিয়াভাবে মিত্রতা লাভ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স একাধিক ক্ষেত্রে ইতালির সহিত যুগ্মভাবে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল।* ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরের কালে ফ্রান্সের এই মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। এমন কি, ফ্রান্সের মিত্রদেশ যুগোস্লাভিয়ার সহিত ইতালির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ইতালি ও ফ্রান্স নিজ নিজ সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিতেও ত্রুটি করিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হয় নাই।

উভয় দেশ কর্তৃক অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার প্রতিযোগিতা

ইতালির একচেটিয়া মিত্রতা লাভের ইচ্ছা

যুগোস্লাভিয়া-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে ইতালি ও ফ্রান্স কর্তৃক সৈন্য সমাবেশ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-ইতালীয় মনোমালিন্যের কতকটা লাঘব ঘটে। কারণ ঐ বৎসর ব্রিয়াণ্ড্ ও মুসোলিনি ইতালীয় নাগরিকগণ ফ্রান্সে এবং ফরাসী নাগরিকগণ ইতালিতে কিরূপ অধিকার ও মর্যাদা পাইবে তাহা বর্ণনা করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঐ বৎসরই ট্যাঞ্জিয়ারের

ব্রিয়াণ্ড-মুসোলিনি সৌহার্দ্য—ট্যাঞ্জিয়ারের শাসনব্যবস্থায় ইতালিকে অংশ দান

* *Ibid*, p. 165

শাসনব্যবস্থায় ইতালিকে অংশদানের ফলে ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্কের কতকটা উন্নতি ঘটে।

এদিকে দক্ষিণ-টাইরলে মুসোলিনী কর্তৃক জার্মান অধিবাসিবৃন্দকে ইতালীয়তে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা জার্মানির অসন্তুষ্টির কারণ হইলে স্বভাবতই ইতালি ও জামানির সম্পর্ক তিক্ত হইল। এদিকে লোকার্ণো চুক্তির ফলে (১৯২৫) জার্মানির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলে এবং ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিলে জার্মানি টাইরলের জার্মান জাতির লোকের উপর মুসোলিনির দমন-নীতির বিরোধিতা শুরু করিল। জার্মানি ইতালীয় জিনিসপত্র বয়কট করিলে মুসোলিনি 'আল্টো এডিজ'(Alto Adige) নামক স্থানের জার্মানগণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহারা সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক —এই বলিয়া ঘোষণা করিলে মুসোলিনি ইতালীয় অধিকার সেই অঞ্চলে বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর একথা জার্মানির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতালি-জার্মান বিরোধ দীর্ঘ স্থায়ী হইল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও জার্মানি পরস্পর সৌহার্দ্য, এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসার শর্তসম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহার পর হইতে ইতালি-জার্মান সম্পর্ক ক্রমেই সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান ও হিট্‌লারের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব প্রসূত আস্ফালন ইতালি ও ফ্রান্স—উভয় দেশেরই ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্ক ক্রমেই সৌহার্দ্যপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে একটি মিত্রতাচুক্তি (Rome Agreement) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা ইতালি ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান করিল। ফ্রান্স আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশের একাংশ ইতালিকে ছাড়িয়া দিল। জিবুতি-আদ্দিস-আবাবা রেলপথের ৭ শতাংশে শেয়ার ইতালিকে দিল। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলে উভয় দেশ পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করিবে স্থিরীকৃত হইল। রোম

দক্ষিণ-টাইরলের জার্মানদের উপর ইতালির দমন-নীতি—ইতালি-জার্মান শত্রুতা

নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান—ইতালি ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্যের কারণ

চুক্তির আলোচনাকালে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ইথিওপিয়ায় ইতালির স্বার্থবৃদ্ধির কোন বাধাদান করিবেন না এই প্রতিশ্রুতিও দিয়া আসিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইতালি ইথিওপিয়া অধিকার করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। ইথিওপিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করা-ই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। রোম চুক্তির ফলে ইতালির ইথিওপিয়-নীতি ফ্রান্সের সমর্থন লাভ করিবে এই ইঙ্গিত পাইবামাত্র মুসোলিনি ইথিওপিয়ার সহিত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত পরস্পর মিত্রতা ও অনাক্রমণ চুক্তি উপেক্ষা করিয়া ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলেন (১৯৩৫)। ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা এবং লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর দুর্বলতা মুসোলিনিকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে সাহসী করিয়াছিল। ইথিওপিয়ার রাজা হেইলি সেলাসি লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর শরণ লইলে ইতালিকে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু ইতালির মিত্রশক্তি ফ্রান্স লীগ কাউন্সিলে ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ সমর্থন না করায় ইতালি ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্য হ্রাস পাইল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ইতালির বিরুদ্ধে লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না।

ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ কর্তৃক ইতালির বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইথিওপিয়ার অধিকাংশ ইতালিকে অধিকার করিতে দিয়া এক ক্ষুদ্র অংশ হেইলি সেলাসির জন্য রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। মুসোলিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে সমগ্র ইথিওপিয়া দখল করিয়া লইলেন। সেই সময়ে হিট্‌লার ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া রাইন অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-প্রীতি স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বীকার করিয়া লইল। কেবলমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সাম্রাজ্যবাদী জবরদখল সমর্থন

জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-প্রীতি

হিট্‌লার কর্তৃক রাইন অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা গঠনের ফলে ইতালি-ফ্রান্স-ব্রিটেনের মিত্রতা বৃদ্ধি

করিল না। এমতাবস্থায় লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ইতালির বিরুদ্ধে যে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

ইতালি ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্য অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। মুসোলিনির ন্যায় হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্ব ক্রমে ইতালি ও জার্মানিকে মিত্রতাবদ্ধ হইবার পথে আগাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক ইতালির ইথিওপিয়া অভিযানের নৈতিক সমর্থন ক্রমে ইতালি ও জার্মানির পরস্পর সম্পর্ক মিত্রতা-পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে ইতালি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সামরিক সাহায্য দান করেন। পক্ষান্তরে স্পেনীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উদারনৈতিক দেশের কোন কার্যকরী সমর্থন লাভ করে নাই। এই সুযোগে হিট্‌লার তাঁহার নবগঠিত বিমান-বাহিনীর দক্ষতা পরীক্ষা করিবার এবং হিট্‌লারের আক্রমণাত্মক নীতি ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে মুসোলিনীর সহিত যুগ্মভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হন। এইভাবে ইতালি ও জার্মানির সৌহার্দ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জার্মানির শত্রু-দেশ ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠে। ইতালি ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্পর্কও ক্রমেই তিক্ত হইতে থাকে।

জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান : জার্মান-ইতালীয় মৈত্রী বৃদ্ধি

এদিকে ইতালি ও জার্মানি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করিলে জার্মানি-ইতালি-জাপান এই তিন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়, কারণ ইতিপূর্বে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে এই ধরণের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইতালি ও জার্মানির মিত্রতা যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ফ্রান্স ও ইতালির সম্পর্কের ততই অবনতি ঘটিতে লাগিল। মিউনিক চুক্তির ফলে পরিস্থিতির চাপে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইতালির মধ্যস্থতা গ্রহণ করিলেও ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্কের কোন উন্নতি তাহাতে ঘটে নাই। ইতালি কর্তৃক হিট্‌লারের অস্ট্রিয়া অধিকারের সমর্থন এবং জার্মানির সহিত সামরিক চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ইতালি কর্তৃক টিউনিসে বিদ্রোহের উস্কানি প্রভৃতি ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করিল।

ইতালির কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে যোগদান

ইতালি-জার্মানি মিত্রতা—ফরাসী-ইতালীয় শত্রুতার অন্যতম কারণ

# সপ্তম অধ্যায়

## ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## ( British Foreign Relations )

**ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি (Fundamental Principles of British Foreign Relations ) :** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতিগুলি মোটামুটিভাবে একইরূপ ছিল বলা যাইতে পারে। অবশ্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান, সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত একথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল সামুদ্রিক প্রাধান্য বজায় রাখা, ইওরোপীয় মহাদেশে কোন অত্যধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান রোধ করা, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিয়ন্তার পদে স্থাপন করা এবং গ্রেট ব্রিটেন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করিতে পারা যায় এরূপ ঘাঁটি স্থাপনে বাধা দান করা। সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থানের পর সাম্যবাদের বিরোধিতা এবং সেহেতু পরোক্ষভাবে নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থানে সমর্থন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি : সামুদ্রিক প্রাধান্য বজায়, শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান রোধ, শক্তি-সাম্য রক্ষা, শত্রুপক্ষ কর্তৃক ঘাঁটি নির্মাণরোধ ও সাম্যবাদের বিরোধিতা

**দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীযুগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক ( British Foreign Relations Between the two World Wars ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ ও ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি পরিলক্ষিত হয় এবং এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইয়াছিল

ব্রিটেন ও ফ্রান্স :

বটে,কিন্তু ফ্রান্স জার্মানির উপর জয়লাভকে প্রকৃত বিজয় বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে নাই। কারণ পরাজিত জার্মানির পুনরুজ্জীবন ও সম্ভাব্য আক্রমণ ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এজন্য ফ্রান্স ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতিদানে অস্বীকৃত হইলে ব্রিটেনও এককভাবে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইল না। ফলে, স্বভাবতই ফ্রান্স অসন্তুষ্ট হইল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সম্পর্কও কতকটা বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিল জার্মানির প্রতি এই দুই দেশের অনুসৃত নীতির বৈষম্য হেতু। ব্রিটেন জার্মানির সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির উপর বিশাল ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপান ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। প্রধানত ইঙ্গ-ফরাসী মতের অনৈক্য হেতুই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের প্রশ্নটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' ( Reparation Commission )-এর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জ-এর মতে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর সভ্যতার স্বার্থেই জার্মানির পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থান একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিবার আরও কারণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব-ন্যাশন্স্, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি প্রভৃতি সব কিছুতেই যোগ দিতে অস্বীকৃত হইলে ক্ষতিপূরণ কমিশনে ব্রিটেন এককভাবে ফ্রান্সকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। ফলে, ব্রিটেনের ইচ্ছা না থাকিলেও ফ্রান্সের প্রভাবে ক্ষতিপূরণ কমিশন জার্মানির উপর এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপাইতে বাধ্য হইল। এই ব্যাপারে এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার ক্ষমতা আছে কিনা সেই বিষয় লইয়া ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের দোষে অভিযুক্ত করিয়া রুহ্র অঞ্চল অধিকার করিলে ব্রিটেন উহার সমর্থন করিল না। এইভাবে

ক্ষতিপূরণ সমস্যা-সংক্রান্ত মতানৈক্য

ফ্রান্স কর্তৃক রুহ র অধিকার—ব্রিটিশ অসন্তুষ্ট

১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর একদিকে যেমন ফরাসী-জার্মান বিদ্বেষ কতকাংশে দূরীভূত হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে ইঙ্গ-ফরাসী তিক্ততাও হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি দেখা দিল। ইংলণ্ডের জনমত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের অনুগতভাবে পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এ ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধিও ইংলণ্ডের জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখিল না। ফলে ব্রিটিশ সরকার ফ্রান্স-তোষণ-নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার প্রমাণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হেইগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-বর্গের এক সভায় ব্রিটিশ চ্যান্সেলর লর্ড স্নোডেন ( Lord Snowden )-এর বক্তৃতায় পাওয়া যায়।

লোকার্ণো চুক্তি—ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের উন্নতি

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যের ফলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্কে যে পুনরায় তিক্ততা দেখা গিয়াছিল তাহার প্রমাণ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নৌ-সম্মেলনে পাওয়া গেল। ফরাসী প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায়ে অকৃতকার্য হইয়া ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সম-পরিমাণ নৌবল রাখিবার দাবির বিরোধিতা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান একটি ত্রি-শক্তি নৌ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হইলেও নৌ-বল হ্রাস ব্যাপারে উহার কোন প্রকৃত মূল্য রহিল না। ইহার পর জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহিত শুল্ক-সংঘ স্থাপনের চেষ্টা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের সম-পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি প্রধানত ফ্রান্সের বিরোধিতায় বানচাল হইয়া গেল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির দুর্বলতাই যে এজন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

লণ্ডন নৌ-চুক্তিতে ( ১৯৩০ ) ফরাসী-ইতালীয় বিরোধিতা—ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির দুর্বলতা

জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও নাৎসি নেতা হিট্‌লারের ঔদ্ধত্যও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না। নাৎসি জার্মানির

পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্ভবত জার্মানি কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে সাম্যবাদী রাশিয়ার বিরোধিতা ব্রিটেনকে ক্রমে জার্মানির প্রতি কতকটা উদার নীতি অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধ করিল। এমন কি, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা (Stresa) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইতালির সহিত যুগ্মভাবে নাৎসি জার্মানির সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদ করিলেও ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটেন ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি (Naval Agreement) স্বাক্ষর করিয়া জার্মানিকে ব্রিটেনের মোট নৌ-বলের ৩৫ শতাংশ গঠন করিবার অনুমতি দিল। ফলে ইহা ফ্রান্সের দিক দিয়া ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল, স্বভাবতই ইঙ্গ-ফরাসী বিদ্বেষও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির ফলে জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি ব্রিটেন পরোক্ষভাবে অনুমোদন করিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা-সম্মেলনে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি কর্তৃক যুগ্মভাবে নাৎসি জার্মানির সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদেরও কোন মূল্য রহিল না। ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক যখন এইভাবে পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ সেই সময়ে মুসোলিনি ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ সরকার ফরাসী সরকারের সহিত যুগ্মভাবে উহার বিরোধিতা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ইতালির বিরোধিতা করিতে অসম্মত হওয়ায় মুসোলিনিকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। সমগ্র ইথিওপিয়া রাজ্যটি ইতালির কুক্ষিগত হইল। ব্রিটেন কর্তৃক মুসোলিনির ইথিওপিয়া অধিকারে বাধাদান না করা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ব্রিটিশ মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু ক্রমেই নাৎসি জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে হিট্‌লার-তোষণে বাধ্য হইল। মিউনিক চুক্তিই ইহার প্রমাণ। অতঃপর, হিট্‌লার কর্তৃক ডান্‌জিগ্‌

ফ্রান্স-ব্রিটেন-ইতালি কর্তৃক জার্মানির সামরিক সাজ-সরঞ্জামের নিন্দাবাদ (স্ট্রেসা সম্মেলন, ১৯৩৫)

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি—ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের তিক্ততা

ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া জয়—ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য-হেতু মুসোলিনির পূর্ণ সাফল্য

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মান-তোষণ নীতি

-নামক শহর ও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়ার সহিত সংযোগ-ভূমি (Polish Corridor) দাবি করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্রমেই পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া মিত্রতাবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপিত হইল।

পোল্যাণ্ডের উপর হিট্লারের দাবি—ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী পুনঃস্থাপনের প্রত্যক্ষ কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হৃতমর্যাদা জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধের শাস্তিদানে ইচ্ছুক থাকিলেও এই শাস্তি অনুকম্পা মিশ্রিত হউক, ইহাই ছিল ব্রিটিশ মনোভাব। পুনরুজ্জীবিত জার্মানি ইওরোপীয় তথা মানব সভ্যতার খাতিরেও প্রয়োজন ছিল, একথাও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ মনে করিতেন। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনও ব্রিটেনকে জার্মানির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায়ও জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের অসন্তুষ্টি সাধন করিয়াও ব্রিটিশ সরকার জার্মানির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি-পূরণের কিস্তি দানে বিলম্ব করিয়াছে এই অজুহাতে ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত যুগ্মভাবে জার্মানির রুহ্‌র অঞ্চল দখল করিলে ব্রিটেন প্রকাশ্যভাবে উহার প্রতিবাদ করিল। কারণ জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনোভাব কতকটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্রিটিশ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে জার্মানিকে বিজেতা রাষ্ট্রগুলির সহিত সম-মর্যাদায় স্থাপন এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ দান প্রভৃতি জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতিরই প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

ব্রিটেন ও জার্মানির পরস্পর সম্পর্ক

জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের পর হইতে জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর শর্তাদি ভঙ্গ ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, 'হিটলার তাঁহার কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্যভাবে জানাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। জার্মানি ও জাপান কর্তৃক কমিউনিস্ট-বিরোধী মিত্রতা চুক্তিও ব্রিটেনের জার্মান প্রীতির অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা সম্মেলনে (Stresa

Conference) ফ্রান্স ও ইতালির—প্রধানত ফ্রান্সের চাপে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি নাৎসি সরকার কর্তৃক সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদ করিলেও ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রিটেন জার্মানির সহিত এক নৌ-চুক্তি (Naval Agreement) স্বাক্ষর করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই চুক্তির শর্তানুসারে ব্রিটেনের মোট নৌ-বলের ৩৫ শতাংশ জার্মানি গঠন করিতে পারিবে স্থিরীকৃত হয়। ইহা জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করিয়া সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির প্রকাশ্য সমর্থন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এইভাবে জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব আরও কিছুকাল পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনোভাবকে 'সহানুভূতিমূলক সমর্থন' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী চারি বৎসর (১৯৩৫-১৯৩৯ খ্রীঃ) ব্রিটেন জার্মানির প্রতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা 'তোষণ-নীতি' (Appeasement) ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

ব্রিটেনের জার্মান-প্রীতি

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি

ব্রিটেনের সহানুভূতিমূলক সমর্থন তোষণ-নীতিতে রূপান্তরিত

বল্ডুইন্ (Baldwin) ও চেম্বারলেন (Nevile Chamberlain)-এর প্রধান মন্ত্রিত্বকালে জার্মানির প্রতি ব্রিটিশ-নীতি যেমন ছিল দুর্বল তেমনি তোষণমূলক। নাৎসি জার্মানির ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি এবং রাজ্যগ্রাস স্পৃহা ব্রিটেন এবং অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদাসীনতা ও তোষণ-নীতির ফলে যখন মিউনিক চুক্তিতে পরিণতি লাভ করিল তখন ব্রিটেন ও অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চৈতন্যোদয় হইল। মিউনিক চুক্তি জার্মান তোষণ-নীতির চরম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার নিজ পররাষ্ট্র-নীতির অকর্মণ্যতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন। ব্রিটিশ জনমতও এই ধরণের জার্মান-তোষণ-নীতির বিরোধিতা শুরু করিল। এদিকে জার্মানি ডান্‌জিগ্ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' (Polish Corridor) দখল করিবার জন্য পোল্যাণ্ডকে চাপ দিলে ব্রিটেন দৃঢ়-নীতি অনুসরণে বাধ্য হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার জন্য যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে

জার্মান-তোষণ-নীতি: মিউনিক চুক্তি

সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতি পত্র স্বাক্ষর করিলেন। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটেন রুমানিয়া ও গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। ইহা ভিন্ন নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক, সুইট্জারল্যাণ্ডের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে ব্রিটিশ সরকার পশ্চাদ্‌পদ নহেন একথাও এই সকল দেশকে জানাইয়া দিলেন। ঠিক সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতির ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থচনা করিল। জার্মানির রাজ্য-গ্রাস-নীতি সোভিয়েত রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভীতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের জার্মান-তোষণ নীতি এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আরও বৃদ্ধি পাইলে সোভিয়েত সরকার নিজ নিরাপত্তার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আত্মরক্ষামূলক চুক্তির স্থযোগ উপস্থিত হইল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার ব্যাপারে ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক আলোচনায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অদূরদর্শিতাহেতু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া জার্মানির সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরাপত্তা ও সামরিক সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত আলাপ-আলোচনায় পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাহারা রাশিয়ার সাহায্য চাহিলেও ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার রাশিয়াকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দানে অগ্রসর হইলেন না। তাহারা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু জার্মানির তথা অপর কোন শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। সোভিয়েত রাশিয়া এই ধরণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় রাজী হইল না। সেই স্থযোগে জার্মানি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের সাফল্যের সর্ব প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহান্বিত হইল। রাশিয়া স্বভাবতই জার্মানির

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি

রাশিয়ার সহিত ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক আলোচনা

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯)—ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয়

আক্রমণাত্মক নীতির ভয়ে ভীত ছিল। এইজন্য রাশিয়াও জার্মানির সহিত দশবৎসরের জন্য পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল (আগস্ট, ২৩, ১৯৩৯)। এইভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবাস্তব এবং অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতির ফলে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি পাইল এবং জার্মানি রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবামাত্র পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল।

ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে উহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইতালি প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালি যে ন্যায্য ব্যবহার লাভ করে নাই ইহা ব্রিটেন উপলব্ধি করিয়া ইতালিকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ড ইতালির সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বেলজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্রিটেন ও ইতালি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বেলজিয়াম-ফ্রান্স-জার্মানির পরস্পর সীমারেখা রক্ষা করিবার দায়িত্বও অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেন ও ইতালি যুগ্মভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই অধিকতর মিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঞ্জিয়ার নামক শহরের শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেনের আগ্রহের ফলে ইতালিকেও অংশ দান করা হইয়াছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি নেতা হিট্লারের অভ্যুত্থানের ফলে ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ইতালি স্ট্রেসা সম্মেলনে সমবেত হইয়া নাৎসি জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির তীব্র নিন্দাবাদ করে। কিন্তু পর বৎসর (১৯৩৬ খ্রীঃ) মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকার উহার তীব্র নিন্দা করিলেন সেই সময় হইতে মুসোলিনি ক্রমেই নাৎসি নেতা হিট্লারের সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত হন। ব্রিটিশ সরকার ইতালিকে নিজপক্ষে রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স রোমে

সৌহার্দ্যপূর্ণ ইঙ্গ-ইতালীয় সম্পর্ক

ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার—ব্রিটেন-ইতালির মৈত্রী নাশ

মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রিটেন ও ইতালির মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি জার্মানি ও জাপানের সহিত যুগ্মভাবে মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষের মিত্র হিসাবে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের পূর্বাবধি ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক মিত্রতামূলকই ছিল। কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি কিরূপ হইবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা রাশিয়ার জনসাধারণের—এ বিষয়ে ব্রিটেনের কোন অংশ গ্রহণের ইচ্ছা নাই—এইরূপ প্রকাশ্য উক্তি করা সত্ত্বেও বল্‌শেভিক্ রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবে কোনপ্রকার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর 'বেল্‌ফার মেমোরেণ্ডাম্' (Balfour Memorandum)-এ তৎকালীন ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ইহাতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের নাই, একথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও সাইবেরিয়া, ট্রান্স ককেশিয়া, ট্রান্স কাস্‌পিয়া, শ্বেতসাগর ও আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে মিত্রপক্ষের সাহায্যে বল্‌শেভিক্-বিরোধী যে শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব একথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া বল্‌শেভিক্ সরকারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে চেকোস্লোভাকিয়ার নিরাপত্তা, এস্তোনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ব্রিটিশ সরকার সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন, এই ঘোষণা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জ করিয়াছিলেন। এস্তোনিয়ার নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে প্রেরিত ব্রিটিশবাহিনী উত্তর-রাশিয়ায় বল্‌শেভিক্ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল কারণে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক স্বভাবতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সোভিয়েত সরকারের সাম্যবাদী প্রচারকার্য এবং বিপ্লবের মাধ্যমে অপরাপর ধনতান্ত্রিক

বেল্‌ফার মেমোরেণ্ডাম্ (Balfour Memorandum) ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক বিশ্লেষণ

ব্রিটেনের সোভিয়েত-বিরোধী নীতি

শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার আগ্রহ রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রাশিয়া হইতে ব্রিটিশ তথা সকল বিদেশীয় সৈন্য অপসারিত হইলে ক্রমে ইঙ্গ-রুশ বিদ্বেষভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে দুই দেশের মধ্যে একদিকে যেমন বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয় অপর দিকে তেমনি সোভিয়েত সরকার ব্রিটেনে সাম্যবাদী কোনপ্রকার প্রচারকার্য চালাইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়যুক্ত হইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-নীতির কতকটা পরিবর্তন ঘটিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে আইনত স্বীকার করিলে ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক কতকটা প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও ব্রিটেনে সোভিয়েত সরকারের প্রচারকার্য গোপনে চলিতে লাগিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে রাশিয়া নানাপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য দান করিলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বাহ্যত ইঙ্গ-রুশ আদান-প্রদান বজায় থাকিলেও ব্রিটিশ জনসাধারণ রাশিয়ার প্রতি সর্বদাই এক বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে লাগিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট্-বিরোধী নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান রাশিয়াকে ব্রিটিশ-মিত্রতা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ রাশিয়াকে স্থান দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স এ বিষয়ে তৎপর হইলে রাশিয়াকে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারের সম-মর্যাদায় স্থাপন করা হইল। নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান ও রাজ্যগ্রাস-নীতিই ব্রিটেনকে রাশিয়ার প্রতি এইরূপ সৌহার্দ্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক অনুসৃত

রাশিয়া হইতে ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণ—ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের উন্নতি

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি (১৯২১)

ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েত সরকার আইনত স্বীকৃত

ব্রিটেনে রুশ প্রচার-কার্য—ইঙ্গ-রুশ তিক্ততা

নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান—ইঙ্গ-রুশ মিত্রতার পথ প্রস্তুত

জার্মান-তোষণ-নীতি রাশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী একথা ব্রিটিশ বা ফরাসী রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করিতেছেন না এই কারণে রাশিয়া এই দুই দেশের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিল। হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকার, সুদেতেন অঞ্চল অধিকার, সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রীস প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনায়কগণের অকর্মণ্যতা তথা মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দান রাশিয়াকে নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। অবশেষে হিট্‌লার ডান্‌জিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং রাশিয়াকেও ইওরোপের পূর্বাঞ্চলে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাতে স্বভাবতই আগ্রহান্বিত হইল না। কারণ, পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পর নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিলেও রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইহা পরস্পর নিরাপত্তার কোন প্রস্তাব ছিল না, কেবল মাত্র রাশিয়ার নিকট হইতে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায়েরই চেষ্টা করা হইয়াছিল মাত্র। এই বৈষম্যমূলক নীতি রাশিয়া স্বভাবতই সন্দেহের চক্ষে দেখিল। ফলে, আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সম্ভাব্য শত্রু জার্মানির সহিতই দশ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া বসিল। ব্রিটিশ কূটনীতির অবাস্তবতা ও অদূরদর্শিতা এবং সেহেতু উহার ব্যর্থতা এইভাবে প্রমাণিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি উপেক্ষা করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে, মিত্রশক্তিবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন সেই পরিস্থিতিতে সহজ হইল।

ব্রিটেনের হিট লার-তোষণ-নীতি—রুশ সন্দেহ

রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে অসাফল্য—ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতির ব্যর্থতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ও মিত্রশক্তিবর্গের সংঘবদ্ধতা

বেলজিয়ামের প্রতি ব্রিটিশ-নীতি ছিল সংরক্ষণমূলক। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা ব্রিটিশ সরকার নিজ নিরাপত্তার সামিল মনে করিতেন। ব্রিটেনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন রাষ্ট্রের প্রাধান্য বেলজিয়ামে স্থাপিত হইবার তীব্র বিরোধিতা ব্রিটিশ সরকার

ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের সম্পর্ক

চিরকালই করিতেন। এজন্য লোকার্ণো চুক্তিতে বেলজিয়ামের সীমারেখার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দিয়াছিলেন।

ব্রিটেনের তুরস্ক-নীতি দার্দানেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া ব্রিটিশ নৌবহরের অবাধ যাতায়াত ও কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রুমানিয়ার নিরাপত্তার জন্যও ব্রিটিশ সরকার এই পথে অবাধভাবে যাতায়াতের অধিকার বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন থে্রস, আনাটোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য স্থাপনের বিরোধিতা করাও ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ-নীতি।

ব্রিটেন ও তুরস্ক

[ বিশদ আলোচনা 'মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ]

---

# অষ্টম অধ্যায়

## ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## ( Foreign Relations of France )

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা (Problem of French Security after the First World War) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল সূত্রই ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। বস্তুত, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি চিরকালই ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফ্রান্সের উত্তর ও পূর্ব সীমারেখা বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে সহজ ছিল এজন্য এই দুই সীমারেখার সংরক্ষণ ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়ী হইলেও এই বিজয় ফ্রান্সের জার্মান ভীতি দূর করিতে পারে নাই। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সমগ্র রাইন অঞ্চল ফ্রান্স

ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান—নিরাপত্তা সমস্যা

দাবি করিয়াছিল। এই দাবি অবশ্য সমর্থিত হয় নাই। ফলে, ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিল।

ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিশ্রুতি

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই-এর সন্ধি বা লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র কোন কিছুই গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বভাবতই ভার্সাই-এর চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত ফরাসী-জার্মান সীমারেখার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বাতিল হইয়া গেল। এমতাবস্থায় ব্রিটেন এককভাবে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইল না। ফরাসী নিরাপত্তার প্রশ্ন পুনরায় জটিল আকারে দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্স ব্রিটেনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্রের (Covenant) উপর ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। এজন্য নিজ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে নিরাপত্তার উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত হইল। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ফ্রান্স বিভিন্ন দেশের সহিত পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বেলজিয়াম ফ্রান্সের ন্যায়ই জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। পুনর্গঠিত পোল্যাণ্ড জার্মানির সর্বনাশের কারণ ছিল, কারণ জার্মানির অংশ ছিন্ন করিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। স্বভাবতই পোল্যাণ্ড জার্মানির ভয়ে ভীত ছিল। এমতাবস্থায় বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড-এর সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপনের পথ প্রস্তুত ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে পশ্চিমে বেলজিয়াম এবং পূর্বে পোল্যাণ্ডের সাহায্যের ব্যবস্থা ফ্রান্স করিতে সমর্থ হইল। ঐ একই নীতি অনুসরণ করিয়া ফ্রান্স ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়ার সহিত এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল।

ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিশ্রুতি বাতিল

ফ্রান্স-বেলজিয়াম, ফ্রান্স-পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স-চেকো-স্লোভাকিয়া, ফ্রান্স-রুমানিয়া, ফ্রান্স-যুগোস্লাভিয়া পরস্পর নিরাপত্তার চুক্তি

এদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে ফ্রান্স ও

জার্মানির পরস্পর সীমারেখার নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ফ্রান্স পাইল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে আপাতদৃষ্টিতে ফরাসী-জার্মান শত্রুতা এবং ফ্রান্সের জার্মান ভীতি হ্রাস পাইল। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-জার্মান বিদ্বেষ পুনরায় দেখা দিল। ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানির অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার পাল্টা দাবি শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। জার্মানি কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ ও ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধি উত্তরোত্তর ফ্রান্সের ত্রাস বৃদ্ধি করিয়া চলিল।

লোকার্ণো চুক্তি

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন—ফরাসী-জার্মান বিরোধ

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে নিরাপত্তার প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যে মনোমালিন্য ও মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে একদিকে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ফ্রান্সের যেমন দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল অপর দিকে তেমনি জার্মানির পুনরুত্থানের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। [ইঙ্গ-ফরাসী পরস্পর সম্পর্কের আলোচনা ১৭৬ পৃষ্ঠায় এবং ফ্রান্স ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] হিট্‌লারের উত্থান এবং রাজ্যগ্রাস-নীতি যখন এক ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল তখন হইতে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইতে থাকিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে (১৯৩৯) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মৈত্রী ও পরস্পর নির্ভরশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

ইঙ্গ-ফরাসী ও ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্ক

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্ক প্রথমে মোটেই সৌহার্দ্যমূলক ছিল না। সোভিয়েত সরকারকে ফ্রান্স প্রথমে স্বীকারও করে নাই। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলে ফ্রান্স ও অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্র অনুরূপ স্বীকৃতি ঘোষণা করে। তথাপি রুশ-ফরাসী সম্পর্ক বেশ প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, একথা বলা চলে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি নেতা হিট্‌লারের উত্থান এবং তাঁহার রাজ্যগ্রাস-নীতি যখন ক্রমে রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশেরই ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল তখন স্বভাবতই

ফরাসী-রুশ সম্পর্ক

ফরাসী-রুশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে লাগিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা এবং একের রাজ্যসীমা আক্রান্ত হইলে অপরে সামরিক সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে—এরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই চুক্তি রাশিয়া এবং ফ্রান্সের নিরপত্তা বৃদ্ধি করিয়াছিল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার কোন মূল্য ছিল না। কারণ, পোল্যাণ্ড নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া রুশ সৈন্য ফ্রান্সের সাহায্যে যাইবার অনুমতি না দিলে ফ্রান্সের বিপদে রাশিয়ার সাহায্য-লাভ সম্ভব ছিল না। পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সুতরাং পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া রুশ সৈন্য যাতায়াতের অনুমতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই কারণে এবং ফরাসী সরকারের উদাসীনতার ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি ( ১৯৩৫ ) অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি (১৯৩৫)—ইহার ব্যর্থতা

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর করিলে রাশিয়া স্বভাবতই ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠে। ফ্রান্সের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—ম্যাজিনো লাইন (Maginot line ) ইতিপূর্বেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোনে (Bonnet ) জার্মানিকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, চেকো-স্লোভাকিয়ার উপর কোনপ্রকার আক্রমণ ফ্রান্সের উপর আক্রমণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরে ফ্রান্স সম্মত হইলে ফ্রান্সের প্রতি রাশিয়ার বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। তারপর হিট্‌লার যখন ডান্‌জিগ্‌ ও 'পোলিশ কোরিডোর' দাবি করিলেন তখন পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স পরস্পর সাহায্য-সহায়তার এবং নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। রাশিয়াকে নিজেদের দলে টানিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার নিকট হইতেও পোল্যাণ্ডের এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টা ফ্রান্স ব্রিটেনের সহিত যুগ্মভাবে শুরু করিল। কিন্তু রাশিয়ার নিরাপত্তা বা রাশিয়াকে সামরিক সাহায্যদানের কোন প্রতিশ্রুতির ব্যবস্থা হইল না। ফলে, রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায়

মিউনিক চুক্তি—ফরাসী-রুশ সম্পর্কের অবনতি

হিসাবে জার্মানির সহিত দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল। হিট্‌লার এইভাবে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের রুশ-নীতি অবাস্তবতা ও অদূরদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল।*

ফ্রান্সের অবাস্তব ও অদূরদর্শী রুশ-নীতি

---

# নবম অধ্যায়

## মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্ক

## ( American Foreign Relations )

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের মূলনীতি ( Fundamentals of the Foreign Relations of the U. S. A. ) :** প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র-সম্পর্ক ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার বিদায়ী ভাষণে ( ১৭৯৭ খ্রীঃ ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের নীতিগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র-সম্পর্কের আলোচনায় জর্জ ওয়াশিংটন উল্লিখিত নীতিগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া চলা। ইওরোপীয়

ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব

---

* ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিশদ আলোচনা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

মহাদেশের পরস্পর সমস্যা এবং সেই সকল সমস্যা-প্রসূত দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবান্তর। এজন্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত রাজনৈতিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক দিয়া কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সামিল। মার্কিন জাতির একত্ববোধ এবং সমগ্র জাতির অখণ্ড আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা সাধনের নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে তাহা হইলে ন্যায়, সততা ও মার্কিন জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন সরকার যুদ্ধ অথবা শান্তি—যে-কোন পন্থা বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিস্থিতি উহাকে পররাষ্ট্রের সহিত কোনপ্রকার স্থায়ী রাষ্ট্র-জোট গঠন হইতে বিরত থাকিবার ইঙ্গিত দিতেছে। অবশ্য কোন সম্মুখীন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সাময়িক-ভাবে পররাষ্ট্রের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করিবে।"*

জর্জ ওয়াশিংটন ঘোষিত মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা—অর্থ-নৈতিক যোগাযোগ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলা-ই ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল নীতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮২৩ খ্রীঃ) প্রেসিডেন্ট মন্‌রো ঘোষিত মন্‌রো-নীতি ( Monroe Doctrine ) জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্লেষিত মার্কিন পররাষ্ট্র-সম্পর্কেরই অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রেসিডেন্ট মন্‌রো ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখা এবং আমেরিকার কোন অংশে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা ঔপনিবেশিক স্বার্থ-সিদ্ধির স্থলে পরিণত হইতে না দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। মন্‌রো-নীতিতে একথাও বলা হইয়াছিল

মন্‌রো-নীতি (Monroe Doctrine)

*_George Washington's Farewell Address, 1797._ Quoted in Mahajan's _International Politics_. p. 211.

যে, ইওরোপীয় কোন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিবে না, দক্ষিণ আমেরিকার কোন অংশে কোন বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও বরদাস্ত করিবে না। মার্কিন স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে ওয়াশিংটন ও মন্‌রো ঘোষিত নীতি খুবই সহায়ক ছিল সন্দেহ নাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ জার্মানি কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ আক্রমণেরই ফলস্বরূপ। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি জার্মানি মার্কিন সরকারকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিল যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ব্রিটেনের চতুঃপার্শ্বের জলখণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন উল্লিখিত অংশে দেখা গেলে জার্মান ডুবোজাহাজ সেগুলি আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবে না। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন্ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট উইলসন্ অবশ্য "পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাহাতে রক্ষা পায় এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয়" সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিতেছে একথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন এক অভূতপূর্ব নৈতিক প্রাধান্য অর্জন করেন। তাঁহার সনির্বন্ধতায় ভার্সাই-এর চুক্তিতে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তিপত্র (Covenant) সন্নিবিষ্ট হয়। তাঁহার আদর্শবাদী চৌদ্দ দফা শর্ত ও চারি নীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন সেনেট (Senate) ভার্সাই-এর চুক্তি তথা লীগ-চুক্তিপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিয়া মার্কিন সরকার তথা মার্কিনজাতির আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বাড়াইতে অসম্মত হইলে লীগের গুরুত্ব প্রথমেই কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। লীগ-চুক্তিপত্রের ২১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে আঞ্চলিক রাষ্ট্র-জোট গঠন করা লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না। মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

অভিভাবকত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যেই ২১ ধারা সংযোজিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের বা নীতির কোন তারতম্য হইল না। মন্‌রো-নীতি ল্যাটিন আমেরিকা—অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহাতে বিস্তারলাভ করিতে না পারে সেজন্যই ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু মন্‌রো-নীতি ঘোষণা (১৮২৩ খ্রীঃ) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই একটি বিশাল রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্‌রো-নীতির ব্যাখ্যারও এমন পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল যে, এই নীতি ল্যাটিন আমেরিকার নিরাপত্তার কারণ না হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকার শোষণ এবং প্রাধান্যের অজুহাত হইয়া দাঁড়াইল।* মন্‌রো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূত্র এবং উপায়ে পরিণত হইল।

মন্‌রো-নীতির রূপান্তর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দক্ষিণ আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ না হইলেও দুর্বল রাষ্ট্রগুলির—বিশেষত মধ্য আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্র্যাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকাস্থ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল। এজন্য এই সকল রাষ্ট্র লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যতালিকাভুক্ত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ করিতে

*The Monroe Doctrine "...was intended to preserve the young weak republics of America from interference or exploitation by any of the Great Powers which, at that date, were to be found exclusively in Europe. This purpose it served admirably ; but the irony of fate had now raised the united states themselves to the position of a Great Power which was inclined to interpret the doctrine not as the palladium of the Latin American Republics, but as conferring upon herself a monopoly of exploitation and control." Hardy, p. 198.

চাহিল। একমাত্র মেক্সিকো ভিন্ন ল্যাটিন আমেরিকাস্থ সকল রাষ্ট্রই লীগের সদস্য হইল। মেক্সিকো সরকার তখনও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বলিয়া উহা লীগের সদস্যপদলাভে সমর্থ হয় নাই। ল্যাটিন আমেরিকা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির আশঙ্কা করিতেছিল তাহা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে চিলি, বোলিভিয়া ও পেরু নামক রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাক্না (Tacna) ও আরিকা (Arica) নামক স্থান দুইটি লইয়া পেরু, বোলিভিয়া ও চিলির মধ্যে বিবাদ শুরু হইলে পেরু ও বোলিভিয়া বিষয়টি লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেরুর উপর এমনভাবে চাপ দিতে লাগিল যে, পেরু শেষ পর্যন্ত অভিযোগটি লীগ কাউন্সিল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইল। বোলিভিয়ার অভিযোগ ছিল অনুরূপ। কিন্তু লীগ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটি এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পানামা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট কোস্টারিকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল। এইভাবে লীগ ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আস্থা হারাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকায় প্রসারিত হইবার পরিপন্থী ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। লীগ ইওরোপীয় মহাদেশের যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা মাত্র এই ধারণা ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বভাবতই জন্মিল। ফলে, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহ যেমন কিউবা, হাইটি ও ক্যারিবিয়ান প্রজাতন্ত্রসমূহ লীগের সদস্য-পদভুক্ত রহিল। ল্যাটিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিই লীগের সদস্যপদভুক্ত হইল না বা রহিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকায় লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব বিস্তৃতির বাধা সৃষ্টি

চিলি-পেরু-বোলিভিয়া ঘটনা

কোস্টারিকা-পানামা ঘটনা

ল্যাটিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির লীগ ত্যাগ বা লীগের সদস্যপদ-ভুক্তিতে অসম্মতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের প্রভাব যাহাতে মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ দ্বারা

অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরোধী না হইতে পারে সে বিষয়ে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মধ্যস্থতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে, এইভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। কোনপ্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণ করা ভিন্ন সাহায্য-সহায়তা দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত একথাও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলেন। ইহার পর লীগের বহু সংখ্যক অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শক হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই সকল দর্শক প্রতিনিধি মার্কিন সরকারের অভিমতও লীগের সদস্যদের নিকট ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ২২টি অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সেনেট কতকগুলি বিশেষ শর্তাধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে অংশগ্রহণে রাজী হইল। কিন্তু লীগের সদস্য না হইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার লাভের প্রস্তাব লীগ কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাটিন আমেরিকার উপর অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের নীতি পরিবর্তিত হইল। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ-নীতি পরিত্যাগ করাই এই সকল অঞ্চল হইতে অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের একমাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) প্রতি উদার-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। ফলে নিকারাগুয়া, হাইটি প্রভৃতির উপর হইতে মার্কিন আধিপত্যের অবসান ঘটিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সমগ্র পৃথিবী এবং বিশেষভাবে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি সৎ-প্রতিবেশী নীতি (Good Neigh-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের অধিবেশনে আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ

ল্যাটিন আমেরিকার উপর মার্কিন অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগ পরিত্যক্ত

bour Policy) অনুসরণ করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল সূত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নীতির সুফল মেক্সিকো কর্তৃক ব্রিটিশ-মার্কিন মূলধনে গঠিত তেলের কোম্পানিগুলির জাতীয়করণের কালে পরিলক্ষিত হয়। মেক্সিকো তেল কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ শুরু করিলে স্বভাবতই মার্কিন জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল। কিন্তু 'সৎ-প্রতিবেশী নীতি'র প্রয়োগের ফলে এইরূপ স্বার্থনাশের ক্ষেত্রেও মেক্সিকোর সহিত কোন বিবাদ বাধিল না। উভয় দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া মার্কিন কোম্পানিগুলি কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইবে তাহা স্থির করিলেন। বোলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের (Bolivia & Paraguay) মধ্যে সীমারেখা-সংক্রান্ত বিবাদও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মীমাংসা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নীতি অনুসরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে।

"সৎ-প্রতিবেশী নীতি" (Good Neighbour Policy)

কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার সহিত স্থায়ী সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল ল্যাটিন আমেরিকার মনরো-নীতির ভীতি দূর করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উপায় হিসাবে মনরো-নীতিকে Pan-Americanism-এ রূপান্তরিত করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Pan-American Conference ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বুয়েনোস্ এইরিস কন্‌ফারেন্স' (Buenos Aires Conference) বৃহত্তর মার্কিন ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিল। দুই বৎসর পর (১৯৩৮ খ্রীঃ) 'লিমা ঘোষণা' (Declaration of Lima) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্যের শপথ গ্রহণ করিল। এইভাবে মনরো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের রক্ষাকবচে পরিণত হইল। এদিকে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত ব্রিয়াণ্ড্-কেলগ্ চুক্তি-ও (Briand-Kellog Pact) আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)।

প্যান-আমেরিকানিজম্

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সহিত যুগ্মভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান

অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ তখনও আমেরিকা পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল সন্দেহ নাই। ইতালি যখন আবিসিনিয়া দখল করে তখন আমেরিকা ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সেগুলি অনুসরণ করিয়া চলিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মার্কিন পর-রাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

কিন্তু নাৎসি জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই-দুইটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন্ রুজভেল্ট্ ততই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষতার আইনগুলি বাতিল করা হইল। হিট্‌লারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর এই কথা বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট্ আমেরিকাকে সামরিকভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ( Lease & Lend Bill ) প্রণয়ন করিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর ( Pearl Harbour ) আক্রান্ত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।*

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

---

# দশম অধ্যায়

## মধ্য-প্রাচ্য

## ( The Middle East )

**মধ্য-প্রাচ্য ( The Middle East ):** ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর হইতে ভারতবর্ষের ( বর্তমানে পাকিস্তানের ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত যাবতীয় দেশ মধ্য-প্রাচ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এই নামের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। মিশর উপরি-উক্ত সংজ্ঞার আওতায় না আসিলেও মধ্য-প্রাচ্য বলিতে মিশরকেও যোগ করা হইয়া থাকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে

মধ্য-প্রাচ্য নামকরণ

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স আহ্বান ও অপরাপর নৌচুক্তিতে যোগদানের বিবরণ ১১১-১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১৯১৯—১৯৩৯) এই সকল দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশগুলি কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, আরব জাতির তীব্র জাতীয়তাবোধ ও ইহুদিদের (Zionist) পুনর্বাসন সমস্যা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যাগুলিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।
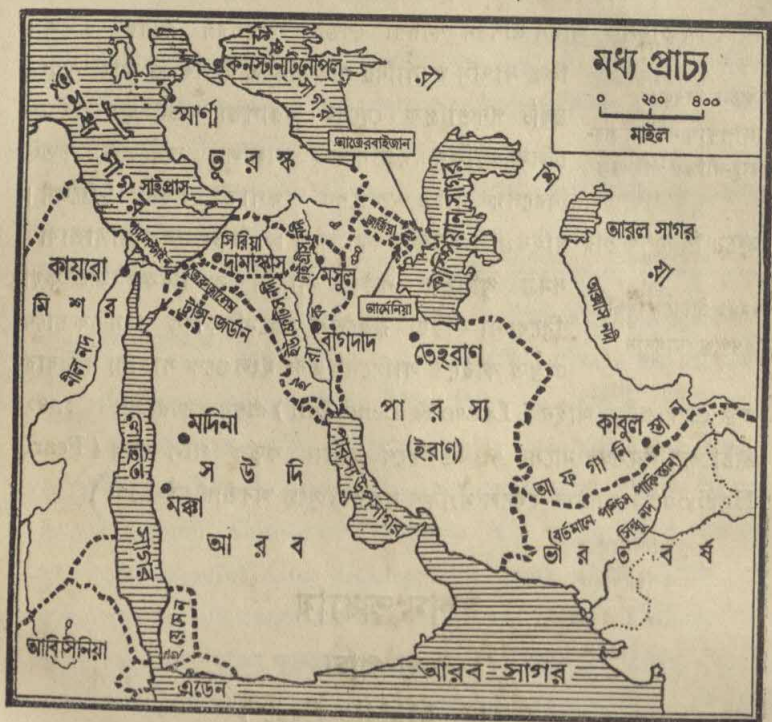
**তুরস্ক ( Turkey ) ঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রশক্তি হিসাবে তুরস্কের পরাজয় ঘটিলে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেভ্‌রে (Sevres)-এর সন্ধিদ্বারা মিত্রপক্ষ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল-সমন্বিত এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই চুক্তি কার্যকরী করা হইলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ নিজ দুর্বলতাহেতু হয়ত এই চুক্তি অনুমোদন করিতে দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই মুস্তাফা কামাল নামে জনৈক

সেভ্‌রে-এর সন্ধি ও তুরস্ক সাম্রাজ্য

দেশপ্রেমিক নেতার অভ্যুত্থান ঘটিলে মিত্রশক্তিবর্গ ( The Allies ) তুরস্কের উপর সেভ্রে-এর চুক্তি চাপাইতে পারিল না।

মুস্তাফা কামালের ন্যায় সামরিক প্রতিভা ও দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সেভ্রে-এর সন্ধির মত অপমানসূচক ও সর্বনাশাত্মক চুক্তি সমর্থন করা অসম্ভব ছিল। তিনি তুর্কী সরকারকে এই চুক্তিগ্রহণে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তুর্কী সরকারের আদেশে তাঁহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হইল। এই সময় তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। কামাল তুরস্কের সর্বত্র এই জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন।

মুস্তাফা কামালের জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাছে ইতালি আনাটোলিয়া অধিকার করিয়া লয় সেজন্য কামাল গ্রীসকে স্মার্ণা দখল করিয়া লইতে উৎসাহিত করেন। গ্রীক সেনাবাহিনী এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হইয়া স্মার্ণা দখল করিবার কালে নানা-প্রকার বর্বরোচিত অত্যাচার করিল। এই অত্যাচার কামাল আতাতুর্ককে সহজেই সমগ্র তুরস্কের দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন ও জাতীয়তা-বাদী ব্যক্তিগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার সুযোগ দিল। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এরজুরাম (Erzurum) নামক স্থানে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলন দুই মাস পর পুনরায় সিবাস (Sivas) নামক স্থানে দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া এরজুরাম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিল। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তুর্কী

গ্রীস কর্তৃক স্মার্ণা দখল—কামালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি

পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেণ্ট এরজুরাম ও সিবাস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয়টি শর্তসম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল এবং এই শর্তগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্তগুলির প্রথম তিনটি দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে যে সকল স্থান মিত্রপক্ষ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সেই সকল স্থানের

তুর্কী পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৯১৯)

স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হইল, অবশ্য দার্দানেলিস্‌ ও বস্‌ফোরাস্‌ প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পঞ্চম শর্তে তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ষষ্ঠ শর্তে বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা চলিবে না, এই কথা বলা হইল। এই শর্তটি যে তুরস্কের স্বাধীন দেশ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই কথাও বলা হইল।

মিত্রপক্ষের সহিত ছয়টি শর্তসম্বলিত চুক্তি গৃহীত

তুর্কী পার্লামেণ্ট উপরি-উক্ত চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করিলে ব্রিটিশ জেনারেল আর্চিবল্ড মিল্‌ন (Archibald Milne)-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেজ সেনবাহিনী কন্‌স্টান্‌টিনোপলে উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করিল। ইঁহাদের অনেককে আবার দেশের বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকে কন্‌স্টান্‌টিনোপল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন শুরু করিলেন। কন্‌স্টান্‌টিনোপলে জাতীয়তাবাদী সদস্য ভিন্ন অপরাপর সদস্যদের লইয়া তুর্কী সুলতানের অধীন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদ্বারা সংরক্ষিত পুরাতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট ও কন্‌স্টান্‌টিনোপল পার্লামেণ্ট নামে দুইটি পার্লামেণ্ট যেমন অধিবেশনে বসিল, তেমনি তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ব্রিটিশ জেনারেল আর্চিবল্ড্‌ মিল্‌ন কর্তৃক তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ এবং জাতীয় আন্দোলন দমনের চেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপই তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সুলতানের অধীন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল দ্বারা সমর্থিত জনসাধারণের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ লোকচক্ষুর অন্তরালে তীব্রবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট মুস্তাফা

ব্রিটিশ সৈন্যের কন্‌স্টান্‌টিনোপল দখল

এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট

তুরস্ক দুই ভাগে বিভক্ত

কামালকে ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিল এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিল (১৯২০)। পর বৎসর (১৯২১) এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট 'মূল গঠনতন্ত্রের আইন' ( Law of Fundamental Organisation ) নামে এক আইন পাস করিয়া তুর্কী শাসনতন্ত্র মূলত কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিল। এই আইনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পরবর্তী সময়ে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা তুর্কী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এঙ্গোরা পার্লামেণ্টকেই তুর্কী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল চারি বৎসর। আঠারো বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।* রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একজন প্রেসিডেণ্ট ও একটি দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভার হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি লইয়া একটি স্বাধীন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তুর্কীশাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কামাল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুই স্থান তুরস্কের সহিত সংযুক্ত করিলেন। সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলি দখলের জন্য গ্রীস তুরস্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ স্বার্থের কারণে গ্রীসকে কোন প্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন সময়ে (১৯২১) লণ্ডনের এক বৈঠকে সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু গ্রীস ইহা মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে ( মে, ১৯২১ )। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরস্কের খুবই সুবিধা হইল।

বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও তুর্কী সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কামালের যুদ্ধ

গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিয়া প্রথমে সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু সাখারিয়া

---

*১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়।

(Sakharia)-এর যুদ্ধে কামালের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বৎসর তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। গ্রীকবাহিনী বিতাড়ন-কালে ব্রিটিশবাহিনীর সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কামাল ফ্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং একমাত্র ব্রিটিশ শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত এক নূতন যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

সাখারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়

তুর্কী-ফরাসী-ইতালীয় মৈত্রী

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতির নূতন চুক্তি সম্পাদন

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জাপান, গ্রীস ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ ল্যসেন ( Lausanne ) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্‌রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যসেনের সন্ধি দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ছয় শর্ত-সম্বলিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইল। ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট রাজ্য ইরাক ও তুরস্কের সীমায় মসুল (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা তখন অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। এইভাবে একমাত্র মুস্তাফা কামালের একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ ও অক্লান্ত শ্রমে তুর্কী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

ল্যসেনের সন্ধি (১৯২৩)

ইতিমধ্যে ( ১৯২২, ১লা নভেম্বর ) তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং পরবৎসর ( ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩ ) তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মুস্তাফা কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত : কামাল সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

এইভাবে তুরস্ক সুলতান চতুর্থ মোহম্মদের অগ্রগতিহীন অকর্মণ্য শাসন-ব্যবস্থা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের উপর কঠোর শর্তসম্বলিত সেভ্‌রে-এর চুক্তি চাপাইবার চেষ্টা এবং শিক্ষিত তুর্কী যুবসম্প্রদায়ের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ কামাল

নূতন তুরস্কের উত্থান

আতাতুর্ক তথা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে নূতন তুরস্কের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল।

**ল্যসেন-এর সন্ধি ( Treaty of Lausanne ) :** এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা ( Maritsa ) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও আড্রিয়ানোপ্‌ল পুনরায় লাভ করিল। গ্রীসের আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কারাগাচ্ ( Karagach ) রেলনির্মাণ-কেন্দ্র তুরস্ক দখল করিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বসফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ শান্তি বা যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শত্রুশক্তির জাহাজ যুদ্ধকালে এই দুই প্রণালী ব্যবহার করিতে পারিবে না স্থির হইল। ইজিয়ান্ সাগরস্থ ইম্‌ব্রস্ (Imbros), টেনেডস্ (Tenedos) ও র‍্যাবিট্ দ্বীপপুঞ্জ ( Rabbit Islands ) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর দ্বীপগুলি ইতালি ও গ্রীসকে দেওয়া হইল। সীরিয়ার সীমা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ফরাসী চুক্তির শর্তানুযায়ী অনুমোদিত হইল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সীরিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্ক যাবতীয় দাবি ত্যাগ করিল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং তুর্কী সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এইভাবে সেভ্‌রে-এর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

শর্তাদি

**তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্ক ( Foreign Relations of Turkey ) :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি সম্পর্কে তুরস্ক স্বভাবতই সন্দিহান হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় রুশ-তুর্কী মৈত্রীতে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কমিউনিজমের প্রভাব তুরস্কে বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে তুর্কী সরকার ক্রমে রুশমৈত্রীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল রহিল না। অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুরস্কের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, ফরাসী

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি তুরস্কের সন্দেহ : রুশমৈত্রী

জাহাজ 'লোটাস্' (Lotus) তুর্কী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরস্ককে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুরস্কের মৈত্রীর পটভূমিকা রচনা করিল। ফলে ইতালি-তুর্কী মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সীরিয়ার সীমা-সংক্রান্ত তুর্কী-ফরাসী দ্বন্দ্ব তুরস্কের স্বপক্ষে মীমাংসিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি সন্দেহ দূর হইলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য হইল। আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ল্যাসেন-এর সন্ধির শর্তগুলির কতক পরিবর্তন দাবি করিল। ঐ বৎসর মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাসের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের সময় লীগ-অব-ন্যাশন্সের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল শক্তি যুদ্ধ করিবে কেবল মাত্র সেগুলির নিকট এই দুই প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি (Eastern Pact) দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) তুরস্ক গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বলকান আঁতাঁত নামে অপর এক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুই চুক্তির দ্বারা তুরস্কের শক্তি এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদ্‌পদ তুরস্ক রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ইতালি-তুর্কী মৈত্রী

তুরস্ক কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য-পদ গ্রহণ

দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর সামরিক নিরাপত্তা বিধান

বলকান আঁতাঁত, পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু (১৯৩৮)

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ইস্‌মেৎ ইনহু আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূলত কামাল আতাতুর্কের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেও কামালের আমলে যে-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, সেদিকেও তিনি মনোযোগ

দিতে ত্রুটি করিলেন না। পররাষ্ট্র-সম্পর্কে তাঁহার নীতি ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি স্বাদেশিকতাপূর্ণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টিতে আর 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) রহিল না। তুরস্কের মৈত্রী তখন সকলের নিকটই কাম্য হইয়া উঠিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত পরস্পর সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

নূতন প্রেসিডেণ্ট ইসমেৎ ইনমু

**আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism):** মধ্য-প্রাচ্যের আরবীয় দেশ ইরাক, সিরিয়া, আরব ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল তুর্কী সাম্রাজ্যাধীনে থাকিয়াও আরব জাতি তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভুলিতে পারে নাই। তুর্কী শাসনের প্রতি তাহারা যেমন ছিল বিদ্বেষভাবাপন্ন তেমনি তুর্কী সুলতানের 'খলিফা'-পদ গ্রহণের ফলে ধর্মের ব্যাপারে তাহারা ছিল তুর্কী জাতি ও সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী। মক্কার আরব বংশোদ্ভূত হুসেনকে তাহারা মোহম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং তুর্কী সুলতানের খলিফাপদ গ্রহণ ন্যায় এবং ধর্মের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য মনে করিত না।

আরব-তুর্কী বিদ্বেষ

আরব ও তুর্কীদের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব ব্রিটিশ রাজনীতির ফলে আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে আরবদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ কর্মচারীকে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইল; ইহাদের মধ্যে কর্নেল লরেন্স্ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হইলেও আরবদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ ক্রমেই এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইতে চলিল। কর্নেল লরেন্স্ও আরবদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হুসেনের পুত্র ফৈসল-এর সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুর্কী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার হুসেনের মাধ্যমে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র-পক্ষের আরব জাতীয়তাবাদের সহায়তা

করিলেন (১৯১৬)। হুসেনের অধীন হেজ্জাজ প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র আরব জাতির মধ্যে এক তীব্র জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিলে হুসেনের পুত্র ফৈসল কর্নেল লরেন্সের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করিলেন (১৯১৮)। এইভাবে আরবদের জাতীয়তাবাদ যখন আরব-স্বাধীনতার পথে ধাবিত হইতেছিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তি আরবদের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া আরব দেশগুলিকে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandates)-এ পরিণত করিল। ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় হুসেনের পুত্র ফৈসলকে ইরাকের রাজা এবং অপর পুত্র আবদুল্লাকে ট্রান্স্‌জর্ডানের আমীরপদে স্থাপন করা হইল। হুসেনকে হেজ্জাজের স্বাধীন আরব রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। তথাপি প্যালেস্টাইন ও ইরাক ব্রিটিশের অধীনে এবং সিরিয়া ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করায় আরবদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। আরবদের অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ হইতে ক্রমে আরব-ব্রিটিশ, আরব-ফরাসী গোলযোগ উপস্থিত হইল।* ঐ সকল অঞ্চলের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের উপরও আক্রমণ চলিল।

হুসেনের বিদ্রোহ

আরবীয় দেশগুলির 'ম্যাণ্ডেট্-এ পরিণত'

ফৈসলকে ইরাক, আবদুল্লাকে ট্রান্স-জর্ডান এবং হুসেনকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া স্বীকার

অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ ইংরেজ ও ফরাসী বিদ্বেষে পরিণত

**ইরাক (Iraq)ঃ** ইরাকের রাজা ফৈসল ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও সুচতুর কূটনৈতিক। তিনি ইরাকের আরবদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ চুক্তি দ্বারা ইরাকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ব্রিটেন ও ইরাকের

ইরাকের স্বাধীনতা লাভ (১৯৩২)

---

*"(But) Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discomfiture of the Turk on many occasions after the war brought Arab peoples into conflict both with the Mandatory Powers and with non-Arab minorities living in their midst."—Vide E. H. Carr. p. 234.

মধ্যে একটি পরস্পর সামরিক সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ইরাকে ব্রিটিশ সরকারকে কতকগুলি বিশেষ অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইল।

**ট্রান্স্জর্ডান ( Transjordan ) :** ট্রান্স্জর্ডান-এর আমীর আবদুল্লা ফৈসলের ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে তিনি ক্রমেই ব্রিটিশ সাহায্যের উপর অধিকতর-ভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। স্বভাবতই তাঁহার রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন খুব মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রান্স্জর্ডানের ব্রিটিশ নির্ভরশীলতা

**হেজ্জাজ : সাউদি আরব ( Hejjaz : Saudi Arabia ) :** হেজ্জাজের রাজা হুসেন প্রথম দিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সহকারেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহারই এক পুত্র ফৈসল ছিলেন ইরাকের রাজা, অপর পুত্র আবদুল্লা ছিলেন ট্রান্স্জর্ডানের আমীর। হুসেন স্বয়ং 'খলিফা' উপাধি ধারণ করিয়া মুসলমান জগতের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তায় তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের এক প্রকার তাঁবেদার হইয়া পড়িলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবজাতি ইহা ক্ষমা করিল না। হুসেন ক্রমেই জনগণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে ইব্‌ন সউদ নামে একজন ওহাবি-নেতা হুসেনকে পদচ্যুত করিয়া হেজ্জাজের রাজা হইলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন সউদ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হুসেন ইতিপূর্বেই জেরুজালেমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুসেনের রাজত্বকাল : জনসাধারণের অশ্রদ্ধা

ইব্‌ন সউদ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ (১৯২৫)

রাজা ইব্‌ন সউদ পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলিকে পরাজিত করিয়া আরব উপদ্বীপের সমগ্র স্থানের উপরই নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারেই হেজ্জাজের নাম হইল সাউদি আরব ( Saudi Arabia )। রাজা ইব্‌ন সউদ খুব ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তাঁহার সামরিক ক্ষমতার বলে যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার সুশাসনে দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থা দূর হইয়া আরব রাজ্যে এক প্রগতিশীল সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন সউদ

সাউদি আরবের জন্ম

নিজ রাজ্যে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশীদের বিশেষ সুবিধা যাহা হুসেন দান করিয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিয়া আরবদের মধ্যে এক নব জাগরণ আনয়ন করেন। তিনি ইরাক ও ট্রান্স্জর্ডানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বংশধর-ই বর্তমানে সাউদি আরবে রাজত্ব করিতেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাউদি আরব, ট্রান্স্জর্ডান, ইরাক, মিশর, লেবানন ও ইয়েমেন প্রভৃতি আরব জাতি-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে 'আরব লীগ' ( The Arab League ) নামে এক মিত্রসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই মিত্রসঙ্ঘের মূল শর্ত হইল এই যে, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে।

ইব্ন সউদের শাসন-দক্ষতা

আরব লীগ (১৯৪৫)

**প্যালেস্টাইন সমস্যা ( Palestine Problem ):** ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-সম্মেলন যখন প্যালেস্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' ( Mandate ) হিসাবে স্থাপন করে তখন উহার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরবজাতির লোক ছিল। মোট সাত লক্ষ অধিবাসীর অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক তখন ছিল ইহুদি। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আর্থার বেলফার ( Arthur Balfour ) ইহুদিদের স্বপক্ষে টানিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। অপর দিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের সহায়তা লাভের জন্য আরব-নেতা হেজ্জাজের হুসেনকে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থার দ্বারা আরবদের স্বাধীনতার বদলে তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল মাত্র। অবশ্য 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপিত হইলেও অদূর-ভবিষ্যতে আরবদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দানের ফলে এক অতিশয় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিস-সম্মেলন প্যালেস্টাইনকে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করিবার কালে ১৯১৭

ইহুদি ও আরবদের নিকট ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতিদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন

খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবার এবং সেখানকার অপরাপর বাসিন্দাদের ধর্মনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ইহুদি সেখানে বসবাসের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল।

আরবদের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট

অপর দিকে হেজ্জাজের হুসেনের নিকট আরব সহায়তার বিনিময়ে আরব স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দান করিয়াছিলেন, আরব-অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনও স্বভাবতই সেই সকল সুযোগ প্রত্যাশা করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলীতে সন্নিবিষ্ট স্বায়ত্তশাসন অধিকারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই প্যালেস্টাইনের আরবগণ স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য হুসেনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ম্যাক্‌মাহন (Macmahon) যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহাতে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ ছিল না এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন এড়াইয়া চলিলেন।

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ

যাহা হউক, ইহুদিদের দলবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইন আগমনে আরব জাতীয়তাবোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। আরবগণ নীতির দিক দিয়াই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের দাবি স্বীকার করিত না। ইহা ভিন্ন বিত্তশালী ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইহুদিগণকে প্যালেস্টাইনে জমি কিনিবার অধিকার দান করিবার ফলে আরবগণ ক্রমেই প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ইহুদিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র আরবদের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইতেছিল। আরবদের কমলা লেবুর চাষ ও অপরাপর ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমেই ইহুদিদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। আরবগণ নিজ দেশেই বিদেশীতে পরিণত হইতে লাগিলে তাহারা ইহুদিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদিদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হইল। আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতে অনেক সময়েই সক্ষম হইত না। ফলে, উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা হইত

খুব বেশি। এই কারণে প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্যে আরব-ইহুদি হানাহানি বন্ধ করিতে হইত।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করিলেন এবং এই কমিশনের উপর আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ও তদনুযায়ী সুপারিশ করিবার ভার দিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশন তাঁহাদের সুপারিশে প্যালেস্টাইনকে আরব অঞ্চল, ইহুদি অঞ্চল এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত জেরুজালেম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা ইহুদি বা আরব কোন পক্ষই সমর্থন করিল না। ক্রমেই আরব-ইহুদি বিবাদ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল।

রয়েল কমিশন: প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা

ইহুদি স্বার্থ, আরব জাতীয়তাবোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবর্তে পড়িয়া প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। প্যালেস্টাইনের বিমানঘাঁটি ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য দখলে রাখা প্রয়োজনীয় ছিল, ইহা ভিন্ন মসুলের খনিজ তেলের পাইপ প্যালেস্টাইনে আসিয়া শেষ হইয়াছিল। সেজন্য তেলের বণ্টন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও ব্রিটিশ সরকার মসুলের উপর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইতালি হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া আরবগণ ইহুদি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইল। এমন কি যে-সকল আরব ইহুদিদের সহিত মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল তাহাদিগকেও আক্রমণ করা হইল। একজন ব্রিটিশ কমিশনার এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারাইলে আরবদের উপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলিল। জেরুজালেমের মুফ্‌তি আমিন এল-হুসেনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি পুনর্বাসন বন্ধ করিবার এবং অপরাপর আরব রাজ্যগুলির সমপর্যায়ে প্যালেস্টাইনকে স্থাপনের দাবি করিলেন।

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ বৃদ্ধি: ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি দ্বিতীয় কমিশন নিয়োগ করিলেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হইল। ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিবর্গকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহ্বান করা হইল (১৯৩৯)। তাঁহাদিগকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগ ব্রিটিশ পক্ষকে জানাইবার কথা বলা হইল এবং যদি আপোষ-মীমাংসা সম্ভব বলিয়া

দ্বিতীয় কমিশন: প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

মনে হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষের যুগ্ম বৈঠক বসিবে স্থির হইল। কিন্তু এইবারও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল না। ব্রিটিশ সরকার নিজ হইতেই একটি আপোষ-মীমাংসার পরিকল্পনা কার্যকরী করিলেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য বৎসরে দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই নীতি গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন কঠোর সামরিক পরিদর্শন দ্বারা শান্তি রক্ষার ব্যবস্থাও করা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি প্রশ্নের কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না।

আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ চেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সমাধানের প্রশ্ন স্থগিত

**ইয়েমেন ( Yemen ) :** আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়েমেন রাজ্য অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন মাত্র ৭৪ হাজার বর্গমাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়েমেনবাসী তুর্কী আধিপত্য অবসানের জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইতালি ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া সৈয়দ মোহম্মদ-ইবন্-অল্-ইদ্রিস্ তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইতালির সাহায্যে বিদ্রোহ করিয়া ইয়েমেনকে একপ্রকার স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এই স্বাধীনতা দৃঢ়তর হয় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্পৃহা : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা-লাভ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন রাশিয়ার সহিত, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সহিত, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়েমেন নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে ইতালীয় মেডিকেল মিশনকে ইয়েমেন হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন আরব লীগের এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ( United Nations )-এর সদস্যপদ লাভ করে।

স্বাধীন ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

**সিরিয়া ও লেবানন (Syria and Lebanon) :** ইরাক প্যালেস্টাইন ভিন্ন আরব জাতীয়তাবাদের অপর কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে

সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপিত হয়। ফরাসী সরকার সিরিয়ার সংখ্যালঘু জাতি-অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চলকে আরব-প্রধান অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। উপকূল অঞ্চলের লাটাকিয়া ( Latakia ) এবং জেবেল ড্রুস্ ( Jebel Druse ) অঞ্চল ফরাসী সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, উত্তর দিকে আলেকজান্দ্রেতা (Alexandretta) তুর্কীজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া উহাকে সিরিয়ার অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হইল। আলেকজান্দ্রেতার অধিকাংশই অবশ্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি

ফরাসী সরকার কর্তৃক সিরিয়ার বিচ্ছিন্নীকরণ-নীতি আরবদের বিদ্বেষের কারণ হইল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবগণ নিজ দেশের সংহতি-নাশ সহ্য করিল না। তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসীদের আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিদ্রোহ এক দারুণ আকার ধারণ করিলে ফরাসী সরকার কামান ব্যবহার করিয়া দামাস্কাস নগরীতে নিজ আধিপত্য-রক্ষায় সমর্থ হইলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া তথায় ফরাসী শাসন প্রবর্তন করিলেন। এই সকল কার্যের ফলে সামরিক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যেটুকু শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ততটুকুই হইল, কিন্তু আরবগণের সন্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হইল না। বরঞ্চ আরবগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। লেবাননেও ফরাসী সরকার মারো নাইটস্ ( Maro Nites ) নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরবদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে লাগিলেন।

আরবদের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার আরবদের সহিত মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আপোষ-মীমাংসার আলোচনা ফলে ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির অনুকরণে ফ্রান্স ও সিরিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে সিরিয়ার

ফ্রান্স ও সিরিয়া এবং লেবাননের চুক্তি (১৯৩৬)

সরকারের হস্তে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করা, আলওয়াই ও দ্রুজ অঞ্চলের সিরিয়ার সহিত সংযুক্তি এবং ফরাসী সরকারের সহিত এক ভিন্ন চুক্তির দ্বারা ফরাসী সৈন্য সিরিয়াতে স্থাপন করা স্থির হইল। লেবাননের সহিতও অনুরূপ এক চুক্তি সম্পাদন করা হইল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুমোদনে ফ্রান্সের বিলম্ব

এই চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হইল। কিন্তু ফরাসী সরকার সিরিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন লাটাকিয়া, দ্রুজ, জেবেল প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী কর্মচারীদের উস্কানির ফলে এক স্ব-স্ব প্রাধান্যের মনোবৃত্তি দেখা দিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রেতার অধিকাংশ ফরাসী সরকার তুরস্ককে দান করিলেন। এই সকল কারণে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে ফরাসী সরকার পুনরায় সিরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন।

সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত (১৯৪৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী শাসন প্রচলিত রহিল। হিট্‌লারের হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। ঐ বৎসরই (১৯৪১) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ( Lytlleton-de-Gaulle Agreement ) দ্বারা সিরিয়া ও লেবাননকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৪১)

## মিশর ঃ

[ আদি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল মিশর দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ফ্যারাওদের অধীনে ছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিশটি ফ্যারাও বংশ মিশরে রাজত্ব করিয়া ৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের অধীন হয়। পারসিক প্রাধান্যের আমলেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজত্ব করিতেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক প্রাধান্যের অবসান ঘটাইয়া গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশর দখল করেন। তিনি মিশর দেশে আলেকজাণ্ড্রিয়া নামে তাঁহার এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। আলেক-

পূর্বকথা

জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের অন্যতম টলেমি মিশরের অধিকার প্রাপ্ত হন। টলেমির বংশ রাণী ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (৩০ খ্রীঃ পূঃ) লুপ্ত হয়। ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সময় হইতে মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে রোমান সাম্রাজ্য এবং পরে বাইজাণ্টাইন বা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মিশর দেশ দীর্ঘকাল থাকে এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতির অধিকারে আসে। আরবদের অধীনে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিবার পর মিশর ঐ বৎসর তুর্কী সুলতান সেলিম কর্তৃক বিজিত হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর আইনত তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বলিয়াই বিবেচিত হইত। প্রকৃত শাসনব্যাপারে অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানাপ্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মিশরকে যাইতে হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্রিটিশ ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশর জয় করেন। পিরামিডের যুদ্ধে মিশর জয় করিলেও ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-তুর্কী যুগ্মবাহিনী মিশর হইতে ফরাসী আধিপত্যের অবসান ঘটায়। আলবানিয়া-বাসী এক দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা মোহম্মদ আলি ফরাসী অধীনতা হইতে মিশর দেশকে মুক্ত করিতে তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন তিনি মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগেও তুর্কী সুলতানের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই তুর্কী সুলতান মিশরের পাশা (Viceroy) পদে নিযুক্ত করেন। মোহম্মদ আলি মামলুক নামক এক শ্রেণীর বিদেশী ক্রীত-দাস-সম্ভূত সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার হইতে মিশর দেশকে রক্ষা করেন। মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা আরবের ওহাবি বংশের নিকট হইতে বহুস্থান জয় করেন। ইহা ভিন্ন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুদান জয় করেন এবং ব্লু-নাইল নদীর তীরস্থ সেনার (Sennar) নামক স্থান পর্যন্ত নিজ সৈন্য মোতায়েন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানকে গ্রীক স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনে তিনি সাহায্য দান করেন। কিন্তু ইহার কিছুকালের মধ্যেই মোহম্মদ আলির সহিত তুর্কী সুলতানের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই সূত্রে মিশর-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর

ফরাসী-অধিকৃত মিশর (১৭৮৮-১৮০১)

মোহম্মদ আলি মিশরের পাশা নিযুক্ত

মিশর-তুর্কী দ্বন্দ্ব

প্রভৃতি তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিয়া কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় মোহম্মদ আলি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আনাটোলিয়া প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সকল স্থান ত্যাগ করিলেও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মোহম্মদ আলিকে বংশপরম্পরায় মিশরের শাসনাধিকার দান করিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহাকে নিউবিয়া, সেনার, দারফুর ও কর্‌ডোফান্ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেরও গবর্ণর নিযুক্ত করা হইল।

মোহম্মদ দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের রাজত্বকালে (১৮০৫—'৪৯), আধুনিক মিশরের গোড়া পত্তন হইয়াছিল। শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা মোহম্মদ মিশর দেশকে একটি প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করেন। সুদক্ষ সামরিক বাহিনী, মেডিকেল স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বন্দর, নৌ-নির্মাণ-কেন্দ্র প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি মিশর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মিশরে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার (Long-staple cotton) চাষ আরম্ভ হয় এবং সেচকার্যের সুবিধার জন্য কাইরো বাঁধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়।

মোহম্মদ আলির পর যথাক্রমে প্রথম আব্বাস্ (১৮৪৯—'৫৪) সৈয়দ (১৮৫৪—'৬৩) ও ইস্‌মাইল (১৮৬৩—'৭০) মিশরের পাশা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দের শাসনকালেই সুয়েজ খাল খনন সুরু হয় এবং ইস্‌মাইলের আমলে তাহা শেষ হয় (১৮৬৯)। ইস্‌মাইল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে 'খেদিভ্' (Khedive) উপাধি প্রাপ্ত হন।

মিশরের অর্থনৈতিক বিপর্যয়: ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপন

খেদিভ্ ইস্‌মাইল তাহার পিতামহ মোহম্মদ আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের উন্নতিমূলক কার্যাদি চালাইলেন। তিনি ডাক-বিভাগ, শুল্ক-ব্যবস্থা, রেলপথ, বন্দর, ইক্ষুচাষ প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতা, রাজ্যবিস্তার-নীতি প্রভৃতির ফলে তিনি দিন দিনই ঋণগ্রস্ত হইতে থাকিলেন। অবশেষে এক আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে ইস্‌মাইল ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই দেশ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর এক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থাপন করিল। মিশরীয় সরকার ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত প্রভাবাধীন হইল।

পরবর্তী পাশা তাওফিক্-এর আমলে আহ্‌মদ আরবী পাশা নামে একজন দেশপ্রেমিক দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশসৈন্য কায়রো দখল করে। ঐ সময় হইতেই মিশরে ব্রিটিশ সামরিক শাসন স্থাপিত হয়। লর্ড ক্রোমার ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট ও কন্‌সাল-জেনারেল। ঐ সময়ে মাহাদি নামে একজন নেতার অধীনে সুদান মিশরের অকর্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িলে জেনারেল গর্ডনকে বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন খার্টুম-এ প্রবেশ করিলে মাহাদির সেনাবাহিনী তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া খার্টুম দখল করে এবং গর্ডন স্বয়ং ও তাঁহার সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক লোক প্রাণ হারান। কাইরো হইতে গর্ডনকে সামরিক সহায়তা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী তের বৎসর মাহাদি স্বাধীনভাবে সুদানে রাজত্ব করেন। ১৮৯৬-'৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদান পুনরায় মিশরের অধিকারে আসে এবং সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যুগ্ম শাসন স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ফ্যাসোডা নামক স্থানটি দখল করে। এই স্থানটি ব্রিটিশ আওতার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। অবশেষে ফরাসী সৈন্য ফ্যাসোডা হইতে অপসারিত হইলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ও মিশরের উপর ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া লয় এবং ব্রিটেনও মরক্কোর উপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকার করে। ঐ বৎসর মিশরের উপর হইতে বিদেশী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হয়।

লর্ড ক্রোমারের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

গর্ডনের হত্যা

'ফ্যাসোডা' সংঘর্ষ

লর্ড ক্রোমারের দক্ষতার ফলে মিশরের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দেখা দিল। মুস্তাফা কামিল নামে একজন নেতার নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইতিমধ্যে ক্রোমার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে সার এলডন্ গর্স্ট্ (Eldon Gorst, 1907-'11) এবং তাঁহার পর লর্ড কিচেনার (১৯১১-'১৪)-এর আমলে মিশরীয়গণ

মিশরীয়দের শাসন-তান্ত্রিক অধিকার লাভ

শাসন-ব্যবস্থায় কতক পরিমাণ স্বাধিকার লাভ করে। লর্ড কিচেনার পূর্বেকার দুই-কক্ষযুক্ত পার্লামেন্টের স্থলে এক-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া ইহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ব্রিটেন মিশর দেশকে ব্রিটিশ 'সংরক্ষিত দেশ' (Protectorate) বলিয়া ঘোষণা করে। প্রধানত সুয়েজ খালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ওয়াফ্‌দ (Wafdists) মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের সম্মুখে উত্থাপন করিতে চাহিলে বলপূর্বক তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইল। 'ওয়াফ্‌দ' দলের নেতা জগ্‌লুল পাশা কাইরোতে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধি-বর্গের সহিত এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া সরাসরি শান্তি-সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদলসহ উপস্থিত হইবেন স্থির করিলেন। ব্রিটিশ সরকার জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার তিন জন প্রধান অনুচরকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং মাল্টায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ফলে, সমগ্র মিশর দেশে এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করিলেন। অল্পকাল পরেই লর্ড এলেন্‌বি মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আসিলে জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরগণ প্যারিসে গমন করিলেন, কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার কোন সুযোগ তাঁহারা পাইলেন না। ইহার ফলেও মিশরে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সরকার এইবার বাধ্য হইয়াই মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিল্‌নার (Lord Milner) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: মিশর ব্রিটিশ সংরক্ষিত দেশ বলিয়া ঘোষিত

ওয়াফ্‌দ দলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

লর্ড মিল্‌নার মিশন আলাপ-আলোচনার পরও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রধান মন্ত্রী আদ্‌লি যগন পাশাকে ব্রিটিশ সরকার আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবারও আলাপ-

আলোচনার পর কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না।

ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ

আদ্‌লি মিশরে ফিরিয়া আসিয়া প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় মিশরে এক আন্দোলন শুরু হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহকারী পাঁচ জন নেতাকে দেশ হইতে অন্যত্র নির্বাসনে প্রেরণ করা হইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিতে না পারিয়া এক ঘোষণার দ্বারা মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' ( Protectorate )-এর অবসান করিলেন। সামরিক আইন

মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' অবসান—ফুয়াদ মিশরের রাজপদে অধিষ্ঠিত (১৯২২)

উঠাইয়া দেওয়া হইল কিন্তু সুদান ও মিশরের সামরিক নিরাপত্তা, মিশরস্থ বিদেশীদের স্বার্থ প্রভৃতি রক্ষার ভার ব্রিটিশদের হস্তেই রাখা হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সুলতান ফুয়াদ ( Sultan Fuad ) মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পর বৎসর মিশরে এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ( ঐ বৎসরই ১৯২৩ ) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। পার্লামেণ্টে জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। জগ্‌লুল পাশা প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী

জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা : ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষের ব্যর্থ চেষ্টা

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি লণ্ডন হইতে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে মিশরে এক গোলযোগের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে সুদানের ব্রিটিশ গবর্ণর জেনারেল সার লী স্ট্যাক্ ( Sir Lee Stack ) ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্দারকে কাইরোর রাজপথে হত্যা করা হইল। ফলে পরবর্তী কয়েক বৎসর মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জগ্‌লুল পাশার মৃত্যু হইলে নাহাস্ পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু রাজা ফুয়াদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং মিশরীয় শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নির্বাচনে নাহাস্ পাশা পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন

করিলেন এবং রাজক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিলেন। রাজা অবশ্য এই আইন অনুমোদন করিলেন না। ফলে নাহাস্ পাশা পদত্যাগ করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা নিজ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সিদ্‌কি পাশার সাহায্যে শাসন চালাইলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশা পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া পূর্বেকার শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস পাশার আমলে তৃতীয়বার চেষ্টা চলিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কোন ফল হইল না। ১৯৩৫-'৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসরই ( ১৯৩৬ ) শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে মিশরে ব্রিটিশের সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র সুয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ট্রিও ( Montreux ) চুক্তি দ্বারা ব্রিটিশ ও অপরাপর বিদেশীদের বিচারালয়, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মিশর লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ লাভ করে।

মিশরের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৩৬)

মণ্ট্রিও চুক্তি (১৯৩৭)

মিশরের লীগ-অব ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ লাভ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে-ই রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্র ফারুক্ মিশরের রাজা হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

ফারুক্-এর সিংহাসন লাভ

**পারস্য বা ইরাণ ( Persia or Iran ):** খনিজ তৈল-সম্পদে সম্পদশালী পারস্যদেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিদেশী স্বার্থপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পারসিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়া যুগ্মভাবে পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ

রাশিয়া ও ইংলণ্ড কর্তৃক শোষণ

শোষণের উদ্দেশ্যে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। ঐ বৎসর ইঙ্গ-রুশ চুক্তি দ্বারা পারস্যের উত্তর অংশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন (under the sphere of influence) বলিয়া স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য বজায় রাখা ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল।

ইরানীদের জাতীয় মর্যাদা ইঙ্গ-রুশ নীতির ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই সূত্রে প্রথমে পারস্যের শাহ্‌কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনে বাধ্য করা হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রুশ সেনাবাহিনী পারস্যের উত্তরাংশ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। এমন কি পারস্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে রুশগণ বাধা দান করে। তাহাদের চাপে পারস্য সরকার নিজ অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। ইনি ছিলেন একজন আমেরিকাবাসী অর্থনীতিক।

ইরানী জাতীয়তাবাদ: রাশিয়া কর্তৃক পারস্যের উত্তরাংশ দখল

এইভাবে বিদেশী স্বার্থপরতার বিষময় ফল যখন ইরানীরা ভোগ করিতেছে তখন শুরু হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রুশ-তুর্কী-ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবমাননা করিয়া পারস্যের সীমার অভ্যন্তরে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। দুর্বল পারস্য সরকার বিদেশীদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পারস্য সরকার ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে পরিণত হইবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পারসিকগণ সরকারের এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজাখান পহ্‌লভি নামক একজন সামরিক নেতা বলপূর্বক অকর্মণ্য সরকারকে পদচ্যুত করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: রেজাখান পহ্‌লভির বলপূর্বক শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ

রেজাখান পারস্যের শাহ্‌পদে অধিষ্ঠিত

পারসিক 'মজ্‌লিস্' অর্থাৎ পার্লামেণ্ট রেজাখানকে পারস্যের সিংহাসনে স্থাপন করিল। তিনি রেজাশাহ্ পহ্‌লভি উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

রেজাশাহ্ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ক্ষমতাশালী সেনানায়ক। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধন করা-ই ছিল তাঁহার শাসনের মূল নীতি। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায়-ই জনকল্যাণকর কার্যের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতালাভের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

রেজাশাহের শাসনে জনকল্যাণ সাধন

তিনি প্রথমে পারস্য রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। তারপর বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করিয়া তিনি এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। বিদেশী প্রভাব মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশীয়দের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি বিদেশী অর্থনীতিকদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানিকে তিনি নূতন শর্তে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিলেন। পরিবহনের সুবিধা-বৃদ্ধির জন্য রাস্তা ও রেলপথ তিনি প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশরক্ষার্থে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। একটি নৌবাহিনীও তিনি গঠন করিলেন। সমাজে নারীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি, রাজনৈতিকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু সাধন করিয়া তিনি দেশে এক নব যুগের সূচনা করিলেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পারস্য' নামের পরিবর্তে ইরানী জাতির নামের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের নামকরণ করা হইল ইরান।

রেজাশাহের কার্যাদি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেজাশাহ্ জার্মান-প্রীতি প্রদর্শন করিলে ইঙ্গ-রুশ সৈন্য ইরানে প্রবেশ করিয়া খনিজ তৈলের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি দখল করিল। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে রেজাশাহ্ নিজ পুত্র মোহাম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : রেজাশাহের পদত্যাগ (১৯৪১)

---

# একাদশ অধ্যায়

## সুদূর প্রাচ্য

## ( The Far East )

**জাপানের অভ্যুত্থান ( Rise of Japan ):** ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের জাতীয়-বিপ্লবের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে জাপান আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে উন্নত ও অগ্রগতিশীল এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপানের যুদ্ধে চীনের ন্যায় বিশাল দেশের উপর জাপানের জয়লাভ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের মিত্রতালাভ এবং ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য জাপানকে সুদূর প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিল। পৃথিবীর রাষ্ট্র-পরিবারেও জাপান নিজ আসন মর্যাদার সহিত গ্রহণে সমর্থ হইল। এই দ্রুত অগ্রগতি এবং উত্তরোত্তর সাফল্য জাপানবাসীদের মনে যেমন এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করিল তেমনি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিল। চীনদেশের বিরুদ্ধে জাপান এক অন্যায়মূলক প্রসার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানের আত্মপ্রত্যয় ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা

**জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ( Japanese Imperialism ):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিল। জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি-বর্গের পক্ষে যোগদান করিয়া চীনদেশে অবস্থিত জার্মানি অধিকৃত অঞ্চল সান্টুং, কিয়াও-চাও প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। এইভাবে সাম্রাজ্য গ্রাসলিপ্সা আরও বৃদ্ধি পাইলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের নিকট 'একুশ দাবি' ( Twenty-one Demands ) সম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই সকল দাবি মানিয়া লওয়া হইবে কি না সেবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য চীনদেশকে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার সময় দেওয়া হইল।

চীনদেশের বিরুদ্ধে জাপানের সাম্রাজ্য-বাদী নীতি

এই 'একুশ দাবি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল সাণ্টুং অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপন-সংক্রান্ত দাবি, দ্বিতীয় ভাগে ছিল বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া-সংক্রান্ত দাবি, তৃতীয় ভাগে ছিল চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহশিল্প-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার দাবি, চতুর্থ ভাগে চীনদেশ নিজ বন্দর, উপকূল বা প্রণালী কোন বিদেশী (ইওরোপীয়) শক্তির নিকট ত্যাগ করিবে না এই দাবি করা হইয়াছিল, এবং পঞ্চম ভাগে ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য- পরিচালনায় জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান প্রভৃতি দাবি করা হইয়াছিল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'একুশ দাবি' তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানকে দৃঢ়ভাবে বাধাদান করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। দুর্বল চীন সরকার বাধ্য হইয়াই 'একুশ দাবির' অধিকাংশ-ই (ষোলটি) স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল শর্ত স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা হইল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল। ইহা ছাড়া রেলপথ প্রস্তুত করিবার, চীনদেশকে ঋণ দিবার নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগও লাভ করিল। দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া এবং কিরিণ-চাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ৯৯ বৎসর পর্যন্ত দখলে রাখিবার অধিকারও জাপান লাভ করিল।

চীন কর্তৃক একুশ দাবির অধিকাংশ স্বীকৃত

'একুশ দাবি' সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সন্দেহ নাই। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থপর বিস্তার-নীতি নৈতিকতা-বর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'একুশ দাবি'র চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগের শর্তগুলিতে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থনৈতিক সুযোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই নীতিও পরিলক্ষিত হয়।

'একুশ দাবি'— 'এশিয়ার মনরো-নীতি'

এই কারণে 'একুশ দাবি'কে 'এশিয়ার মন্‌রো-নীতি' ( Asiatic Monroe Doctrine ) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকটজনক মুহূর্তে যখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট জাপানী সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরপত্তা নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি' সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। যুদ্ধশেষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে সকল স্থান ছিল তাহা চীনদেশ প্রত্যর্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিল না। ফলে চীনা প্রতিনিধি শূন্যহস্তে প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনের আশা ভঙ্গ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ দেশগুলির নৌশক্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিবর্গের পরস্পর স্বার্থ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌবলের ৬০ শতাংশ নৌবহর রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। জাপানের পক্ষে ইহা অতিশয় সুবিধাজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোন দেশই আর কোন রকম নূতন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে না স্থির হওয়ায় এই অঞ্চলে জাপান-ই সর্বাধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইল। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জাপানী শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলে মার্কিন-জাপানী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে জাপান ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলে আমেরিকায় জাপানী শক্তিবৃদ্ধিতে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার অনুরোধে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে (১৯২১), উহা আর পুনঃ/স্বাক্ষরিত হইল না, ফলে, ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির অবসান ঘটিল। ইহার পরিবর্তে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে এক চতুঃশক্তি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিবে না এবং এই সকল স্থান-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ যুগ্ম

ওয়াশিংটন-কন্‌ফারেন্স (১৯২১-২২) : নৌশক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যার সমাধান

কন্‌ফারেন্সে মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। চীন সম্পর্কে উন্মুক্ত-দ্বার নীতিই স্বীকৃত হয়। চীন-জাপানের মধ্যে শাণ্টুং অঞ্চল লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল উহা চীনের স্বপক্ষে মীমাংসিত হয়। জাপান কিয়াও-চাও এবং শাণ্টুং-এর অপরাপর জার্মান অধিকৃত অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইয়াপ ( Yap ) দ্বীপ লইয়া আমেরিকার সহিত জাপানের বিরোধের মীমাংসাও ঐ সময়ে করা হয়।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপানকে শাণ্টুং অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল এবং চীনদেশের অখণ্ডতা ( Integrity of China ) নীতি মানিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ইত্যাদি কেহই বৃদ্ধি করিবে না এই স্বীকৃতির ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে জাপান এই প্রাধান্য নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়াছিল।

জাপানের প্রাধান্য

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থ নৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছিল উহার ফলে জাপানের অর্থ নৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করিয়া তথাকার প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে মনস্থ করিল। বস্তুত, জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসমাজের প্রসারের একমাত্র স্থান ছিল চীন। কারণ, ইতিপূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সিঙ্গাপুরে এক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলে জাপানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। স্বভাবতই মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের দৃষ্টি পড়িল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিউ-নিস্ট্‌দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে এবং অর্থ নৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিলে জাপান 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি তখনও চীনদেশ হইতে আদায় করা হয় নাই সেগুলির দাবি পুনরায় উত্থাপন করিল এবং সেই সূত্রে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক তাঁবেদার রাজ্য গঠন করিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার লীগ চুক্তিপত্রের শর্ত-বিরোধী ছিল বলা বাহুল্য। লীগের সদস্য হিসাবে এইরূপ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১) : মাঞ্চুকুয়ো তাঁবেদার রাজ্য গঠন

আক্রমণ হইতে বিরত থাকা জাপানের নৈতিক কর্তব্য ছিল। ইহা ভিন্ন ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপান চীনের অখণ্ডতার নীতি মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাপান নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট আবেদন এবং একাধিক কমিটির সুপারিশের অপেক্ষা করিয়াও শেষ পর্যন্ত চীনদেশ এই আন্তর্জাতিক সংঘ হইতে কোন সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ জাপানের সহিত টাংকু ( Tangku ) নামক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তরদিকে অপসরণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং চীন ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিতে স্বীকার করিল।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—লীগচুক্তি-পত্র ও ওয়াশিংটন প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন

টাংকু-এর শান্তি-চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিল। সমগ্র সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান করিয়া জাপান এশিয়ার অভিভাবকত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইল। চীনদেশকে ইওরোপীয় শোষণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপান চীনদেশের দ্বার পুনরায় ইওরোপীয়দের নিকট রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। এই কারণে জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং-কাই-শেকের অপসারণ অপরিহার্য ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে যে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিনাশ করা প্রয়োজন ছিল। এইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে জাপান তথাকথিত 'নূতন পরিকল্পনা' ( New Order ) প্রস্তুত করিল। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারই ছিল জাপানের 'নূতন পরিকল্পনা'র মূল উদ্দেশ্য।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত

'নূতন পরিকল্পনা'—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষা এবং দেশকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া

তুলিতেছিল। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের আশঙ্কার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

জাপান-জার্মান চুক্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিপিং-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে 'মার্কো পোলো পুল' ( Marco Polo Bridge )-এর নিকটে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ ঘটিলে সেই অজুহাতে জাপান চীন-দেশ আক্রমণ করিল। জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চীনের কমিউনিস্টদল চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিং-তাং সরকারের সহিত সহযোগিতা শুরু করিল। কিন্তু জাপানকে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল অধিকারে বাধা দান করা সম্ভব হইল না। চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অবশ্য তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিল। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চীনা কমিউনিস্টগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে কমিউনিস্ট কুয়োমিং-তাং ঐক্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল। চীনের যে অংশ তখনও স্বাধীন ছিল উহা কমিউনিস্ট অধিকৃত অঞ্চল এবং কুয়োমিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং কুয়োমিং-তাং শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল চুং-কিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান রোম-বার্লিন-জাপান অক্ষশক্তি-বর্গের রাষ্ট্রজোটে অংশ গ্রহণ করিল।

জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭)

কমিউনিস্ট ও কুয়োমিং-তাং অনৈক্য—ইনান ও চুংকিং-এ পৃথক সরকার স্থাপন

**চীন ( China ) :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা ছিল প্রধানত তিনটি : (১) চীন ও জাপানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীনা সাম্রাজ্য গ্রাসের প্রতিযোগিতা এবং চীন সাম্রাজ্যের অধীনে বহুস্থান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক চীন ও জাপান হইতে অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার ( Extra-territorial Rights ) ভোগ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্ত্য

প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামরিক জ্ঞান জাপান পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায়ই এক সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন নিজ নিজ সুবিধামত চীনদেশকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিতেছিল, তখন জাপান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণনীতি গ্রহণ করে। চীন-জাপান যুদ্ধ ( ১৮৯৪-৯৫ ) এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) জাপানের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কর্তৃক জাপানের সহিত মিত্রতা স্থাপন জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগস্থল ছিল চীন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ ভিন্ন রাশিয়াও চীনদেশ গ্রাস করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা এবং চীনের দ্বার সকল দেশের নিকট উন্মুক্ত রাখিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। এদিকে চীনবাসীদের চরম দুর্বলতা ও বিদেশীয়গণ কর্তৃক চীনের শোষণের প্রতিকার হিসাবে উদারপন্থী জননেতা সান-ইয়াৎ-সেন সমগ্র চীনে এক তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালাইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া চীনকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত করিল ( ১৯১২ )। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল প্রথম সাফল্যলাভ করিলে তাহারা সান-ইয়াৎ-সেনকে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীন প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইলে সান-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন এবং জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন। য়ুয়ান্-শি-কাই ছিলেন এক অতি শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশলী। সান্-ইয়াৎ-সেন মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু সান্-ইয়াৎ-সেনের সেই আশা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া য়ুয়ান্-শি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। বিদেশী বণিকদের নানাপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দান করিয়া তিনি

প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা

তাহাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজে সম্রাট-সুলভ ক্ষমতা অর্জন করিয়া একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করিবেন। সেইজন্য য়ুয়ান্ চীনদেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিস্তৃতি সহজ হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বহির্মঙ্গোলিয়া ( Outer Mongolia ) চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলি চীনদেশকে ঋণ দান করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে চাহিল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া সহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ লিপ্ত হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া শক্তিশালী করিবার নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই জাপানের পক্ষে চীন গ্রাসের চরম সুযোগ উপস্থিত হইল।

রাশিয়া ও জাপানের চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের সুযোগ

জাপান ইওরোপের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীন সাম্রাজ্যে জার্মান অধিকৃত শাণ্টুং অঞ্চল দখল করিল এবং জার্মানির অপরাপর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও আত্মসাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট 'একুশ দাবি' ( Twenty-one Demands ) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন স্থান দখল করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা, জাপান হইতে চীনদেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বীকার করিয়া লইলে চীনদেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইল বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন য়ুয়ান্-শি-কাই। জাপান য়ুয়ান্-শি-কাইকে তাঁহার সম্রাট-পদ লাভে সাহায্য দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। য়ুয়ান্-শিং-কাই প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব বিলোপের সম্ভাবনা ছিল সেগুলি ভবিষ্যতে বিচারের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। এইভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই-ও মৃত্যুর সামান্য পূর্বে হাং-সিয়েন (Hung-Shien) নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অল্পকালের মধ্যে (১৯৩৬) য়ুয়ানের মৃত্যু ঘটিলে চীনা প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাইল।

আমেরিকা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপান যখন 'একুশ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল তখন কেহ-ই চীনদেশের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। জাপান মিত্রপক্ষকে সাহায্য দানের বিনিময়ে 'একুশ দাবি'র সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের সংহতি রক্ষা নীতির সমর্থক আমেরিকার সহিত জাপানের লান্‌সিং-ইশাই (Lansing-Ishii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে মার্কিন সরকারের চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি যে কেবল মুখের কথা তাহা প্রমাণিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা আমেরিকা শান্টুং-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

ইওরোপীয় শক্তি ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দাবি সমর্থন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে এই ভয় চীনা সরকারের প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপানের সুযোগ নাশ করিবার ইচ্ছায়-ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাধাদানে এবং মিত্রপক্ষ চীনদেশের যুদ্ধে যোগদানে তাহাদের হস্ত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব তেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' দ্বারা শান্টুং অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করিবার পর চীনদেশও জার্মানির শত্রুদেশে পরিণত হউক ইহাই চাহিল। কারণ, চীন ও জার্মানির

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

সদ্ভাব জাপানের শান্টুং দখল করিয়া রাখিবার পরিপন্থী হইতে পারে এই ভয় জাপানের ছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ই আগস্ট) চীনদেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্রপক্ষ চীনদেশের এই সহায়তার জন্য তাহাকে কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল না। তবে বক্সার-বিদ্রোহের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চীনদেশের দেওয়ার কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণের বাকি অংশ চীনকে দিতে হইবে না ও যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকগণ কত শুল্ক দিবে সেই প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা হইবে এইটুকুমাত্র আশা চীনকে দেওয়া হইল।

চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) ও স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল তাহাতে চীনবাসীর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি শান্টুং চীনদেশকে ফিরাইয়া দেওয়া, বিদেশী প্রাধান্যের অবসান, বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীনা সরকারের চরম অধিকার, বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রিয়' অধিকার (Extra-territorial Rights)-এর অবসান দাবি করিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া হুম্‌কি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত শান্টুং-এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাহ্য করা হইল। ফলে চীনা প্রতিনিধি প্রায় শূন্যহস্তেই প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক মিত্রতা নীতি বর্জন করিল।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের স্বার্থ অবহেলিত

প্যারিস সম্মেলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরূপ অবহেলা প্রদর্শনের ফলস্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল, জাপানী সামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হইল। এমতাবস্থায় জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ

চীনে ইওরোপীয় ও জাপান-বিরোধী আন্দোলন

অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপান চীনদেশের সহিত বিবাদ মিটাইয়া লইতে চাহিল। কিন্তু চীন সরকার জাপানের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসার পূর্বে শাণ্টুং ফেরৎ চাহিলেন। এইভাবে উভয় সরকারের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এবং নৌশক্তি হ্রাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য এক সম্মেলন (Washington Conference) আহ্বান করিলেন।

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনদেশের 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনরায় স্বীকার করা হইল। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশের বিভিন্ন অংশকে 'প্রভাবিত অঞ্চল' (Sphere of Influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিষিদ্ধ হইল এবং যুদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিবেচনা করিবার নীতি গৃহীত হইল। জাপান একটি ভিন্ন চুক্তি দ্বারা কিয়াও-চাও এবং শাণ্টুং-এ জার্মানির সর্বপ্রকার অধিকার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। শুল্ক নির্ধারণ নীতি প্রভৃতি আরও কয়েকটি অধিকার চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইল। ঐ সময় হইতেই চীনদেশে বিদেশী প্রাধান্য অবসানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইল।

চীনের লাভ

চীনদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত: চীনের স্বাধীনতা-ইতিহাসের সূচনা

সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক দল তিনটি বিশেষ আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া চীনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এই তিনটি আদর্শের বিশ্লেষণ সান্-ইয়াৎ-সেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মুক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আমরা চাই শান্তি, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নহে।" তিনি দক্ষিণ-চীনের সামরিক নেতৃবর্গের সাহায্যে তাঁহার জাতীয়াবাদী কুয়োমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু

সান্-ইয়াৎ-সেনের নীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি

ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। রাশিয়া সান্-ইয়াৎ-সেনকে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্য দান করিল। সান্-ইয়াৎ-সেন ইওরোপীয় দেশগুলি চীন হইতে যে সকল অ-ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা, অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার (Extra-territorial Rights) আদায় করিয়াছিল সেগুলি নাকচ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত তিনি সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তিনি গণতন্ত্র কার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দান করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দলের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। ইহাতে কুয়োমিং-তাং-এর সভ্যপদ চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহারই শিষ্য চিয়াং-কাই-শেক-এর উপর। চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নান্‌কিন্, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

জাতীয়তাবাদী চীনের রুশ সাহায্য লাভ

চীনদেশের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সান্-ইয়াৎ-সেনের অমর দান রহিয়াছে। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণ্য মাঞ্চু-শাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত তাঁহার কর্মপন্থা চীনবাসীর মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি চীনের জাতীয়তার উৎসস্বরূপ।

সান্-ইয়াৎ-সেনের দান

সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পূর্বেই কুয়োমিং-তাং দলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। বামপন্থীদল কমিউনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, অপর দিকে দক্ষিণপন্থী দল কমিউনিস্ট নীতিবিরোধী ছিল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী অবসানের পক্ষপাতী ছিল। সান্-ইয়াৎ-সেনের জীবদ্দশায় দুই দলের বিভেদ প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৯২৭

খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া কুয়োমিং-তাং-এর কমিউনিস্ট্ সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার শুরু করিলেন।

চীন ও রাশিয়ার মনোমালিন্য

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য চিয়াং-কাই-শেক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রায় সমগ্র চীনদেশ কুয়োমিং-তাং-শাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২৭) তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে বল্‌শেভিক প্রচারকগণ কর্তৃক চীনদেশে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার লইয়া চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রেও কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে চীনের ঐক্য বিধানের জন্য

কমিউনিস্ট্-কুয়োমিং-তাং দ্বন্দ্ব

জাতীয়তাবাদী দল (কুয়োমিং-তাং) নান্‌কিং দখল করিলে কমিউনিস্টগণ বিদেশী দূতাবাস ও বিদেশীয়দের সম্পত্তি আক্রমণ ও লুঠ করিল। এই বিষয় লইয়া বিদেশী সরকারগুলির সহিত চীন সরকারের গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা চীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিল। জাপান নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ চীনের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার সৈন্য প্রেরণ করিল। এমতাবস্থায় বিদেশীয় বণিকদের সহায়তায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের দমনে কতকটা কৃতকার্য হইলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং দখল করিয়া উত্তরাঞ্চলের পৃথক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিলেন। নান্‌কিং ঐক্যবদ্ধ চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের রাজধানী হইল। ঐ বৎসরই কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি (Kuoming-tang Executive Committee) আইন প্রণয়ন করিয়া এক জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই নূতন ব্যবস্থা

সমগ্র চীনে জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন: চিয়াং-কাই-শেক চেয়ারম্যান নির্বাচিত

অনুযায়ী কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি-ই চীনের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সমিতির নির্দেশাধীনে দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার দেওয়া হইল স্টেট্ কাউন্সিল (State Council)-এর উপর। চিয়াং-কাই-শেক এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন। চেয়ারম্যানই চীনের প্রেসিডেণ্ট নামে সর্ব সাধারণ্যে

পরিচয় লাভ করিলেন। এই বৎসরই (১৯২৮) চিয়াং-কাই-শেক নান্‌কিং ঘটনায় (Nanking Affairs) ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশী সরকারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও জাপান চিয়াং-কাই-শেকের শাসনব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল।

চিয়াং-কাইং-শেক চীনের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকার্যে মার্কিন ও জার্মান সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে তখনও বামপন্থীদের আন্দোলনের অবসান না হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়ই যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইল। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে চিয়াং-কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য সহজ হইল। তাহারা চিয়াং-এর জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসন স্থাপন করিতে চাহিল। কমিউনিস্টপন্থিগণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণাংশে সোভিয়েট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইলে চিয়াং-কাই-শেক তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অপর দিকে এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া চীনের কোন কোন সামরিক নেতাও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে (১৯২৯) রাশিয়ার সহিত চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের এক তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। অবশেষে খাবারোভ্‌স্ক প্রোটোকোল (Khabarovsk Protocol) দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা স্থির হইল। এই বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা : কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার

দক্ষিণ-ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকায় কমিউনিস্ট প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদী চীন ও রাশিয়ার বিরোধ

মাঞ্চুরিয়া চীনদেশের একটি অতিশয় বর্ধিষ্ণু ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে উন্নত অংশ ছিল। চীনদেশের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া হইতেই প্রেরণ করা হইত। ইহা ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সরকার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে চীনদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ঐ স্থানের মোট বাসিন্দার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল চীনা জাতির লোক। অপর দিকে মাঞ্চুরিয়ায়

মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব

বিদেশী সরকারগুলির, বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়া-ভ্লাডিভস্টক রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার মধ্যদিয়া প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ ছিল জাপানের অধীনে। মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ রপ্তানি দ্রব্যাদি জাপানী-অধিকৃত দাইরেন ( Dairen ) বন্দর দিয়া প্রেরণ করা হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর জাপানের এক আশাতীত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিলে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনও বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেই স্থলে দেখা দিল বেকারত্ব ও আর্থিক দুর্দশা।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ায় অর্থনৈতিক শোষণ

এমতাবস্থায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া এই অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি অপূর্ণ রহিয়াছিল সেইগুলি জাপান এখন ( ১৯৩১ ) দাবি করিল।

এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জাতীয়তাবাদী সরকার ও কমিউ-নিস্ট্‌দের পরস্পর বিরোধে তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তখন অনাহারে, অর্ধাহারে দিন-যাপন করিতেছে। স্বভাবতই জাপান এইরূপ অবস্থায় চীনের বিরুদ্ধে নিজ

জাপানের মাঞ্চুরিয়া-আক্রমণ

স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের অজুহাতও পাওয়া গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় ( Inner Mongolia ) একজন জাপানী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানী সম্পত্তি সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের একাংশ বিস্ফোরক দ্বারা বিনষ্ট হইলে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। চীনদেশ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ও মার্কিন সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে করিতেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী ব্যবসায়ের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া লইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী প্রাধান্যাধীনে মাঞ্চুরিয়াকে 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত

করা হইল। এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইল সিং কিং (Hsing King)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা মারিয়ার, মুকুডেন ও অপরাপর শহর দখল করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশে এক জাপান-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। চীনাবাসীরা জাপানী দ্রব্যাদি বর্জন করিল। জাপানী সামগ্রীর দ্বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা-দেশ ছিল চীন। সুতরাং চীনদেশের জাপানী সামগ্রী বর্জনের ফলে জাপানী বাণিজ্যস্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাংহাই-এ অবস্থিত জাপানী বণিকগণ জাপান সরকারকে নৌবলের সাহায্যে সাংহাইয়ের চীনাদের জাপান-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। জাপান সাগ্রহে একটি নৌবাহিনী সাংহাই বন্দরে প্রেরণ করিলে চীনবাসীরা সেই নৌবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করিল। জাপান ইহাকে চীনদেশের আক্রমণাত্মক আচরণ (!) বলিয়া বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে লীগ-অব-ন্যাশন্স চীন-জাপানী বিরোধের মীমাংসাকল্পে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করিল। লিটন্ কমিশন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রাধান্যাধীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্য স্থাপনের সুপারিশ করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অব-ন্যাশন্স লিটন্ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্স যখন কমিশনের পর কমিশন নিয়োগ করিয়া চীন-জাপানী বিবাদের মীমাংসার উপায় নির্ধারণে কালক্ষেপ করিতেছিল তখন জাপান উত্তর-চীনের বহু স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। ঐ বৎসরই জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ ত্যাগ করিল। এদিকে চীন লীগ-অব-ন্যাশন্স হইতে কোনপ্রকার সাহায্য না পাইয়া একপ্রকার হতাশ হইয়াই জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী জাপানী সৈন্য চীনের প্রাচীরের উত্তরে অপসরণ করিতে রাজী হইল। জাপানী-অধিকৃত স্থানসমূহ ও চীনের অধীন অঞ্চলের সীমার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলকে নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকার্য চীনা কর্মচারীদের হস্তেই থাকিবে বটে, কিন্তু শাসনকার্যে জাপানের

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল

লর্ড লিটন্ কমিশন

লীগ-অব-ন্যাশন্স-এর বিফলতা

টাংকু-এর সন্ধি

ক্ষতিকারক কোন কিছু করা হইবে না সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কার্যত-অবশ্য জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি পূর্ণোদ্যমেই চালাইল। চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার চীনের কমিউনিস্ট্ দমনে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার তেমন চেষ্টা করিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে চীনা কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং ও অপরাপর নেতৃবর্গ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইলেন এবং নিজেরাও জাপানী শক্তি প্রতিহত করিবার কার্যে সরকারকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। চিয়াং-কাই-শেক জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা অপেক্ষা কমিউনিস্ট্দের দমন করিবার কার্যেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। এমন সময় চিয়াং-কাই-শেকের নিজ অধীন কর্মচারিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুই সপ্তাহকাল এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই আকস্মিক ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং-কাই-শেককে দেশরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট্ দলের সহিত বিরোধ মিটাইতে বাধ্য করা। দুই সপ্তাহ পর বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্দের সহিত অন্তর্যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন।

চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট্ দমন নীতি

কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ মৈত্রী

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ যুগ্মশক্তি জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কার্যে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কুয়োমিং-তাং দল কমিউনিস্ট্দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এই সন্দেহ হইতেই ক্রমে দুই দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াসিং ও ফুকিন অঞ্চলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ সৃষ্টি হইলে চিয়াং-কাই-শেকের মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে এই অন্তর্যুদ্ধের অবসান হইল। ঐ বৎসরই পার্ল হারবার (Pearl Harbour) জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ই চীনের কমিউনিস্ট্গণ কুয়োমিং-তাং পক্ষকে পরাজিত করিয়া চীনের বিপ্লব সংঘটিত করে, ফলে নূতন চীনের উথান ঘটে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ ঐক্য: চীনের বিপ্লব

# দ্বাদশ অধ্যায়

## তোষণ নীতিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

## ( Policy of Appeasement : Second World War )

**জাপান-ইতালি-জার্মানি তোষণ ( Appeasing Japan, Italy and Germany ) ঃ** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সজ্ঘবদ্ধভাবে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার যে চেষ্টা লীগ-অব-ন্যাশন্স করিতেছিল উহার প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রথমে জাপান শুরু করে। ক্রমে ইতালি ও জার্মানি একই পন্থা অনুসরণ করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স-এর নৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্সের ক্ষমতা এইভাবে বিলুপ্ত হইলে উহার স্থলে আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া জাপান, ইতালি ও জার্মানির ক্রমবর্ধমান রাজ্য-গ্রাসনীতি প্রতিহত করিবার চেষ্টাও তখন করা হয় নাই। ফলে, শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া উহাকে তোষণ করিবার মনোবৃত্তি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে যখন তোষণ-নীতিও জাপান, ইতালি ও জার্মানিকে আর তুষ্ট করিতে পারিল না তখন বাধ্য হইয়াই এই সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। এইভাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

সজ্ঘবদ্ধভাবে নিরাপত্তা রক্ষার নীতির ব্যর্থতা

জাপান-ইতালি-জার্মানি তোষণ

**জাপান ১৯৩১-১৯৪৫ (Japan 1931-1945) ঃ** ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান লীগ চুক্তিপত্র ( League Covenant ) এবং ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া সেখানে একটি তাঁবেদার সরকার স্থাপনে জাপানের বিলম্ব ঘটিল না। মাঞ্চুরিয়ার নূতন নামকরণ হইল মাঞ্চুকুয়ো। মাঞ্চুরিয়া দখল ছিল জাপানের সমগ্র চীন তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়া গ্রাস করিবার প্রথম

জাপান-তোষণ নীতি

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)

পদক্ষেপ ইহা কাহারো অবিদিত ছিল না। মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়ারও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং চীন ও রাশিয়ার সহিত মাঞ্চুরিয়া লইয়া জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান উহা গ্রাস করিয়া জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করিতে চাহিল। বস্তুত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রিটিশ সরকার সিঙ্গাপুরে একটি শক্তিশালী সামরিক ও নৌ-ঘাঁটি গঠন করিলে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারনীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। জাপানের বিস্তারের একমাত্র স্থল ছিল এশীয় মহাদেশ। মাঞ্চুরিয়ায় কৃষি ও খনিজ সম্পদ জাপানের শিল্পোৎপাদনের সহায়ক হইবে, উপরন্তু উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে মাঞ্চুরিয়া জাপানের অর্থ-নৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে—এই সকল কারণও জাপানকে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কমিউনিস্ট্-বিরোধী জাপান চীনদেশে কমিউনিস্ট্ প্রভাব বিস্তৃতি এবং চীনবাসীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—উভয়ই ভীতির চক্ষে দেখিত। জাপানের পদাতিক ও নৌবাহিনীর দক্ষতা এবং 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে উৎসাহিত করিয়াছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাপানের সরকার ও জাপানী জনসাধারণকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বে-সামরিক বিভাগ অপেক্ষা বহু-গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল কারণ জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের পট-ভূমিকা রচনা করিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ায় চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হইলে জাপানীরা তাহা দমন করে। চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে জাপান স্বভাবতই কোরিয়াবাসীদের পক্ষ গ্রহণ করিত বলা বাহুল্য। এইভাবে মাঞ্চুরিয়া চীন ও জাপানের এক দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হইলে কতিপয় চীনা সৈন্য জনৈক জাপানী সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই মুকডেন অঞ্চলে সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেল-পথের সামান্য একাংশ চীনাগণ বিস্ফোরক দ্বারা উড়াইয়া দিলে জাপান

মাঞ্চুরিয়া দখলে জাপানের স্বার্থ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের মিথ্যা অজুহাত

মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। গ্যাথোর্ণ হার্ডি প্রমুখ লেখকগণ সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথ উড়াইয়া দিবার কাহিনীটিকে অলীক বলিয়া মনে করেন। নিছক অজুহাত হিসাবেই এই মিথ্যা রটনা করা হইয়াছিল। বস্তুত, যে স্থানে রেলপথ ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই পথ দিয়া ঐ দিন রেলগাড়ী নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি চলাচল করিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—লীগ-এর কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে চীন লীগ কাউন্সিলের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করে। লীগ কাউন্সিল উভয়পক্ষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে অর্থাৎ সশস্ত্র দ্বন্দ্ব হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলে জাপান মুখে সেই অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল বটে, কিন্তু লীগ কর্তৃক জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় মাঞ্চুরিয়া দখলের কাজ পূর্ণোদ্যমেই চালাইতে লাগিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার জাপান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তির শর্ত-বিরোধী ছিল।

মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী

প্রথমত, ইহা ছিল, লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী এবং মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ লীগ কর্তৃক শাস্তি পাইবার যোগ্য ছিল।

ওয়াশিংটন চুক্তির বিরোধী

দ্বিতীয়ত, জাপান ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি পরিত্যাগের এবং চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সেই প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তির বিরোধী ছিল।

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি বিরোধী

তৃতীয়ত, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে বা সমস্যা ও বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানে শান্তিপূর্ণ পন্থা অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল। জাপান এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া জাপান এই চুক্তির শর্তাদিও লঙ্ঘন করিয়াছিল।

এইভাবে জাপান লীগ-এর চুক্তিপত্র এবং লীগের বাহিরে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে

স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলেও যখন লীগ কাউন্সিল বা ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কোন দেশই জাপানকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধের অধিক কিছু করিতে অগ্রসর হইল না, তখন জাপানও উৎসাহিত বোধ করিল। লীগের প্রকৃত দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া লীগ কাউন্সিলে প্রস্তাব করা হইল যে, মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হউক। লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে জাপানে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্বেই জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করিয়া আইনের চক্ষে ধূলা দিতে সমর্থ হইল। মাঞ্চুরিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। লিটন কমিশনের রিপোর্টে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইলেও লীগ কাউন্সিল জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল না। লিটন কমিশন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার জাপানের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় এই যুক্তি অস্বীকার করিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি-প্রসূত কার্য একথা স্পষ্টভাবেই বলিলেন। মাঞ্চুকুয়ো সরকার জাপান কর্তৃক স্থাপিত তাঁবেদার সরকার—মাঞ্চুরিয়াবাসী কর্তৃক স্বেচ্ছায় স্থাপিত নহে একথাও লিটন কমিশনের রিপোর্টে বলা হইল। মাঞ্চুরিয়াকে চীনের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা উচিত হইবে এই সুপারিশও লিটন কমিশনে করা হইল। কিন্তু জাপান আক্রমণকারী দেশ এবং উহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সুপারিশ না থাকায় জাপান মাঞ্চুরিয়া নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্রগঠন আইনত স্বীকার করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাহায্য চাহিল। কিন্তু ব্রিটেন সুদূর প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে জাপানের সহিত

লীগ কাউন্সিলের দুর্বলতা

জাপান কর্তৃক মাঞ্চু-কুয়ো তাঁবেদার সরকার গঠন

লিটন কমিশন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার চেষ্টার ব্যর্থতা

শত্রুতার পথ যথাসম্ভব এড়াইয়া চলা-ই উচিত ভাবিয়া জাপানকে অনুরোধ-উপরোধের অধিক কিছু করিতে চাহিল না। ফলে জাপানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক বা অর্থ নৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। জাপানও আক্রমণনীতি অপ্রতিহতভাবে চালাইবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিল।

ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপরতা

জাপানী সেনাবাহিনী চীনের প্রাচীর ছাড়াইয়া 'জেহল' (Jehol) নামক খনিজ তৈলে সমৃদ্ধ স্থানটি অধিকার করিয়া পেকিং অভিমুখে অগ্রসর হইলে চীন সরকার জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

জাপান কর্তৃক জেহল অধিকার

এই চুক্তির শর্তানুসারে জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তর দিকে অপসরণ করিল এবং ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন দক্ষিণস্থ একখণ্ড ভূমি চীন নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল (১৯৩৩)। লীগ কাউন্সিল জাপানকে চীনের সহিত বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইল এবং এই বিবাদ সম্পর্কে লীগের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিশন নিযুক্ত করিল। এই সময়ে লীগ কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে লিটন কমিশন রিপোর্ট গ্রহণ করিলে জাপান লীগ পরিত্যাগের ইচ্ছা লীগ কাউন্সিলকে জানাইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কোন প্রকৃত চেষ্টার অভাব জাপানকে চীন গ্রাসে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য শত্রু জাপানকে দমন করা বা সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলে বাণিজ্য-স্বার্থ কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল না। স্বভাবতই চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি মুখের কথায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আর ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্স জাপানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে এবং জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইবে একথা হয়ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ততটা বুঝিতে পারে নাই।

টাংকু-এর সন্ধি

জাপান কর্তৃক লীগ ত্যাগ

ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদূরদর্শিতা

মাঞ্চুরিয়া দখল ব্যাপারে সাফল্যলাভ এবং টাংকু-এর সন্ধি দ্বারা চীনের আরও একাংশ অধিকার জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি করিল। ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পদ্ধতি (New Order) অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করা। এজন্য চীনের সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় রাষ্ট্রগুলি যে 'উন্মুক্ত দ্বার-নীতি' ( Open Door policy ) অনুসরণ করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা প্রয়োজন হইল। একই কারণে চীনের জাতীয়তাবাদী দল ও উহার নেতা চিয়াং-কাই-শেক-এর পতন ঘটান প্রয়োজন ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে রুশ প্রাধান্যনাশও এজন্য অপরিহার্য ছিল। এই নূতন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ ছিল এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের স্থলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ইচ্ছাপ্রসূত।

জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবাদ (New Order)

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষার এবং দেশবাসীকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে বিরোধিতা তখন চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইলেও বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে কুয়ো-মিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ ( কমিউনিস্ট্ ) দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে এবং রাশিয়াও চীনরক্ষার জন্য সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইবে বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী (Anti-Comintern) এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান সমগ্র চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পিপিং* (Peiping)-এর অনতিদূরে লুকোচিয়াও বা 'মার্কো পোলো পুল' (Lukouchiao or Marco Polo Bridge) নামক স্থানে চীনা ও

জাপান-জার্মান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি

লুকোচিয়াও বা 'মার্কো পোলো পুল'-এর ঘটনা—জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

* Langsam, p. 434

জাপানী সৈন্যদের কয়েকজনের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটিলে জাপান সেই অজুহাতে চীন আক্রমণ করিল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭) চীনের কুয়ো-মিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলকে দেশরক্ষার কার্যে ঐক্যবদ্ধ করিল। নানকিং, হাংকাও, ক্যান্টন প্রভৃতি স্থান জাপান অধিকার করিয়া লইল বটে, কিন্তু চীন জয় করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হইল না। জাপান চীনদেশে অধিকৃত অঞ্চল লইয়া নানকিং-এ একটি জাপান-নিয়ন্ত্রিত 'চীন প্রজাতন্ত্র' স্থাপন করিল। কিন্তু চীনবাসী জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়া চলিল। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ মুখে চীনদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন ত্রুটি করিল না, কিন্তু প্রকৃত সাহায্যদানে কেহই অগ্রসর হইল না। রাশিয়ার নিকট হইতে ইন্দো-চীনের মাধ্যমে সামান্য যুদ্ধ-সামগ্রী চীনদেশে অবশ্য আসিল। জাপান ব্রিটিশ বা মার্কিন সম্পত্তি নাশ ও সেই সকল দেশের নাগরিককে আক্রমণ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইল না। জাপানী বোমারু বিমান 'প্যানে' নামক মার্কিন কামানবাহী জাহাজ (gunboat) ও একটি তৈলবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিলে ঐ সঙ্গে কয়েকজন মার্কিন নাগরিকও প্রাণ হারাইল।* মার্কিন সরকার ইহার প্রতিবাদ জানাইলে জাপান এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিল এবং উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে প্রতিশ্রুত হইল। ব্যাপারটি এইভাবেই মিটমাট হইয়া গেলে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতার ভয় হইতে মুক্ত হইল। এমতাবস্থায়ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িগণ জাপানকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিয়া অর্থলাভ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিও জাপানের নিকট এই ধরণের সামগ্রী বিক্রয় করিতে লাগিল। মুখে এই দুই দেশ চীন দেশের অখণ্ডতার কথা আওড়াইলেও ব্রিটিশ ও মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। জাপান-তোষণের কুফল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দেই স্পষ্ট হইয়া উঠিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন দেশকে আর্থিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জার্মানির

জাপান কর্তৃক ব্রিটিশ ও মার্কিন সম্পত্তি আক্রমণ

জাপান-তোষণ নীতি

* Ibid p. 435

আক্রমণে দুর্বলীকৃত ফরাসী সরকারের নিকট হইতে জাপান ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুতের অধিকার আদায় করিল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশকে অর্থ সাহায্য দিতে লাগিল। অপর দিকে জাপানী সেনাবাহিনী হংকং-এর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে ব্রিটেনও চীনকে অধিক পরিমাণ ঋণদান করিতে লাগিল এবং জাপানকে উহার অগ্রসর নীতি হইতে বিরত হইবার জন্য জানাইল। জাপান ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রকার অনুরোধ-উপরোধ বা সতর্ক-বাণীতে কর্ণপাত করিল না। উপরন্তু বিমান আক্রমণ দ্বারা মার্কিন সম্পত্তি বিনাশ করিতে লাগিল। এমতা-বস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত যে 'সৌহার্দ্য ও বাণিজ্যের চুক্তি'(Treaty of Amity and Commerce) ছিল তাহা নাকচ করিবার ইচ্ছা জাপানকে জানাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন জাপানকে খনিজ তৈল সরবরাহ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী সামগ্রী আমদানি উপরও নানাপ্রকার বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হইল। এই ব্যাপার লইয়া জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খনিজ তৈল আমদানির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের শর্তে ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে জাপানী সৈন্য অপসারণে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করিতে এবং নিজ ইচ্ছামত শান্তি-চুক্তির শর্তাদি স্থির করিয়া চীনের সহিত যুদ্ধ মিটাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। মার্কিন সরকার হইতে পাল্টা প্রস্তাব করা হইল যে, জাপান চীন ও ইন্দোচীন হইতে পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী অপসারণ করিলে এবং চীনের অধিকৃত অঞ্চলে যে জাপান-সরকার-আশ্রিত চীন সরকার গঠন করা হইয়াছে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে স্বীকার করিলে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি সকল দেশের সহিত জাপান এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলে মার্কিন

জাপান কর্তৃক ইন্দোচীন দখল

জাপানের প্রতি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ-উপরোধ নীতি অনুসরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ত্যাগ

জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আপোষের আলাপ-আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে খনিজ তৈল সরবরাহ করিবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানী বাণিজ্য পুনঃস্থাপনে রাজী হইবে। ইতিপূর্বে জাপান রাশিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া ( ১৩ এপ্রিল, ১৯৪১ ) জার্মানি-সোভিয়েত যুদ্ধ বাধিলেও যাহাতে জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া অস্ত্রধারণ না করে সেই ব্যবস্থা করিয়াছিল। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা প্রস্তাবের জবাব দিবার পূর্বেই জাপান 'পার্ল হার্‌বার' (Pearl Harbour) আক্রমণ করিয়া (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত করিল। এই আক্রমণ শুরু হইবার পরই জাপান মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। এইভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুদূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হইল। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে রোম-বার্লিন-জাপান অক্ষশক্তিবর্গের চুক্তির শর্তানুসারে হিট্‌লার ও মুসোলিনী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফলে জাপানও ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ন্যাদার-ল্যাণ্ড্‌স্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।*

রুশ-জাপানী অনাক্রমণ-চুক্তি

জাপান কর্তৃক আকস্মিকভাবে পার্ল হারবার (Pearl Harbour) আক্রমণ

যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপান হংকং, গুয়াম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, ডাচ্ ইণ্ডিজ (Dutch Indies) প্রভৃতি জয় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে জাপানের পরাজয়ের সূচনা হইল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুইটি শহরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহর এ্যাটম বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করিলে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

জাপানের জয় ও পরাজয়

**ইতালি-তোষণ ( Appeasement of Italy ) :** দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কেবল জাপান ও জার্মানির প্রতিই তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল এমন নহে। ফ্যাসিস্ট-শাসিত ইতালির প্রতিও সে-সকল দেশ তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়া ইতালিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রসারকার্যে উৎ-

* Vide Schuman : *International Politics*, pp. 372-73.

সাহিত করিয়াছিল। নাৎসি নেতা হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ইতালির ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড স্ট্রেসা কন্‌ফারেন্স-এ (১৯৩৫) সম্মিলিত হইয়া নাৎসিনীতির নিন্দাবাদ করিয়াছিল। কিন্তু জাপান ও জার্মানির লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর সদস্যপদ ত্যাগ, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার, হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া জার্মান জাতিকে সমরসজ্জায় সজ্জিত-করণ প্রভৃতি লীগের দুর্বলতা প্রকট করিয়া তুলিলে ইতালি রাজ্যগ্রাস-নীতির অনুসরণকারী জার্মানির সমর্থকে পরিণত হইল। ইহা ভিন্ন ইতালি নিজেও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতে শুরু করিল।

ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নীতি উৎসাহিত

মুসোলিনির সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নীতি ইতালিবাসীদের আন্তরিক সমর্থন যাহাতে লাভ করিতে পারে সেজন্য মুসোলিনি বৈদেশিক যুদ্ধ-নীতির মাধ্যমে ইতালির মর্যাদাবৃদ্ধির একমাত্র পন্থা ব্যাপক প্রচার কার্যের দ্বারা এই ধারণার সৃষ্টি করিলেন। ইতালির সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নীতি যাহাতে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল না হয় সেজন্য মুসোলিনি আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হইলেন। এদিকে হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসি জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ঔদ্ধত্যের ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ফ্রান্স ইতালির মিত্রতালাভে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ওয়াল-ওয়াল (Wal-Wal) নামক স্থানে ইতালি ও ইথিওপিয়ার সৈন্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন ইতালীয় সৈন্য প্রাণ হারাইলে ইতালি এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতালি-ইথিওপিয়া আবিসিনিয়ার চুক্তির শর্তানুসারে এই দুই দেশের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটাইবার প্রতিশ্রুতি উভয় দেশই দিয়াছিল। কিন্তু ইতালি সেই চুক্তি অমান্য করিয়া মধ্যস্থতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ইথিও-পিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট আবেদন করিল। ইতালীয় প্রতিনিধি ইতালি-ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্বটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটান হইবে জানাইলেন। লীগ কাউন্সিল ইতালির মৌখিক

ওয়াল-ওয়াল (Wal-Wal) ঘটনা

ইথিওপিয়া কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট আবেদন

প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখিলেন। ইথিওপিয়ার আবেদন সত্ত্বেও কোন প্রকার কার্যকরী পন্থা অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র ইতালীয় প্রতিনিধির মুখের কথার উপর নির্ভর করা ও লীগের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখা ইতালির প্রতি তোষণ নীতি অনুসরণেরই ফল, বলা বাহুল্য। এদিকে ইতালি বিনা বাধায় ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী নিজ উপনিবেশগুলিতে সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করিতে লাগিল। ইথিওপিয়া পুনরায় লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেদন জানাইলে ইতালি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মধ্যস্থতায় কোন ফল হইল না, কারণ যাঁহারা মধ্যস্থতা করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন তাঁহারা ওয়াল-ওয়াল ঘটনার জন্য ইতালি কিংবা ইথিওপিয়া কোন দেশই দায়ী নহে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি যাহাতে তাঁহার পরিকল্পিত ইথিওপিয়া আক্রমণ হইতে বিরত হন সেজন্য ইথিওপিয়ার নিকট হইতে ওগাডেন (Ogaden) প্রদেশটি ইতালিকে আদায় করিয়া দিবার এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইথিওপিয়াকে জীলা (Zeila) বন্দরটি গ্রেট ব্রিটেন দান করিবার এই প্রস্তাব করিল। মুসোলিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপরন্তু ইতালির প্রতি ব্রিটেনের তোষণ-নীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত হইলেন। যাহা হউক, ইতালি-ইথিওপিয়ার বিবাদের মীমাংসার উপায় হিসাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ প্যারিসে সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন যে, ইথিওপিয়া লীগ-অব-ন্যাশনস-এর নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করিবে এবং সেই সূত্রে লীগ ইথিওপিয়া রাজ্যে ইতালির কতক বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিবে। ইতালি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিল। এমতাবস্থায় ব্রিটেন লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে ইতালি-ইথিওপিয়ার বিবাদের মীমাংসার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত এই ঘোষণা

লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর ঔদাসীন্য

ব্রিটেনের ইতালি-তোষণ-নীতি

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্তাব—মুসোলিনি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

করিল। প্রয়োজনবোধে ইতালির বিরুদ্ধে লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রিটেন পশ্চাৎপদ নহে একথা প্রকাশ করাই ছিল ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসোলিনি এই সব কিছু উপেক্ষা করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপনে ইথিওপিয়ার অধিকাংশ মুসোলিনীকে দান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা (হোর-লাভাল পরিকল্পনা, ( Hoare-Laval Plan ) জানাজানি হইয়া গেলে উহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যামুয়েল হোরকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পরও ইতালির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। লীগ-অব-ন্যাশন্স ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিলেও ফ্রান্স জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির মিত্রতালাভের আশায় ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক অবরোধ আন্তরিকভাবে কার্যকরী করিতে রাজী হইল না। ব্রিটেন ইতালিকে দমন করিবার জন্য প্রথমে বদ্ধপরিকর ছিল বটে কিন্তু অপরাপর ইওরোপীয় শক্তি-বর্গের ঔদাসীন্য শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের উৎসাহও হ্রাস করিল। অবশেষে ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ উঠাইয়া লইয়া ইতালি তোষণ-নীতির নূতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল। লীগ-চুক্তিপত্রের অবমাননা, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ঔদাসীন্য ইতালির সাম্রাজ্য স্পৃহা বর্ধিত করিল। তদুপরি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এই আচরণ ও লীগের দুর্বলতা জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতির উৎসাহ দান করিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মুসোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া ইতালির রাজাকে ইথিওপিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ইতালি তোষণ-নীতি ও জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালি ও জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি স্বভাবতই এই দুই দেশকে পরস্পর মিত্রে পরিণত করিয়াছিল। এই মিত্রতা স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল।

মুসোলিনির ইথিওপিয়া আক্রমণ

হোর-লাভাল পরিকল্পনা

ইতালির বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক অবরোধ ঘোষণা—ইহার অকার্যকারিতা

ইতালি-তোষণ-নীতির প্রত্যক্ষ ফল

**স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া (Spanish Civil War : Stage-Rehearsal of the Second World War) :** লীগ কাউন্সিল কর্তৃক ইতালির অর্থনৈতিক অবরোধের ঘোষণা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে ফ্রান্স, কার্যকরী করিতে প্রস্তুত না হইলে শেষ পর্যন্ত লীগ সেই অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইলে (১৭ই জুলাই, ১৯৩৬) সঙ্গে সঙ্গে (১৯শে জুলাই) স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের অন্যতম ছিল স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ।

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের সূচনা

ইতালি ও জার্মানির তোষণের যে নীতি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় অনুসরণ করিতেছিল তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে পরিলক্ষিত হইল। ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখলের ব্যাপারে লীগ কাউন্সিলের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে স্পেনের অন্যতম সমর নায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কিংবা মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তির আধিপত্য নাশ করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন—কোন কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে প্রজাতান্ত্রিক সরকার যেমন দুর্বল তেমনি অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছিল। যাহা কিছু উন্নয়নমূলক কাজে প্রজাতান্ত্রিক সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তাহারা সরকারের বিরোধিতা শুরু করিল। পক্ষান্তরে উগ্র সংস্কারপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সুস্থ, সুসংগঠিত এবং সকলের সমমর্যাদার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে অযথা কালক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ্যে, একথা-ই রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, কমিউনিস্টগণ ও রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমন সময়ে এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। সংস্কারপন্থীদের কার্যক্রমে বিশ্বাসী জনৈক পুলিশ কর্মচারীকে

অন্তর্যুদ্ধের পটভূমিকা

অন্তর্যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

রাজতন্ত্রের জনৈক সমর্থক হত্যা করিলে তাহারা রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সরকার এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী-দল সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের শুরু হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রজাতন্ত্রের বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি স্পেনীয় মরক্কোস্থিত তাঁহার অধীন সেনাবাহিনীকে নিজপক্ষে টানিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া (১৭ই জুলাই, ১৯৩৬) স্পেন আক্রমণ করিলেন। স্পেনের একাংশ তিনি সহজেই জয় করিতে সমর্থ হইলেন। জার্মানি ও ইতালি ফ্রাঙ্কোকে সামরিক সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে হিট্‌লার ও মুসোলিনির অংশ গ্রহণের পশ্চাতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এবং বিশেষভাবে, জার্মানির যুদ্ধ-প্রস্তুতির মহড়ার উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। হিট্‌লার, মুসোলিনির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অধীন স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে, এই উদ্দেশ্যও হিট্‌লার ও মুসোলিনির ছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যেমন হিট্‌লার ও মুসোলিনির সাহায্যলাভ করিয়া-ছিলেন, স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারও তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইওরোপ ও আমেরিকাস্থ কমিউনিস্টদের সাহায্য-সহায়তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো হিট্‌লার ও মুসোলিনির নিকট হইতে যে পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার তুলনায় কমিউনিস্টদের নিকট হইতে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। কমিউনিস্ট রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্টগণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্যদানের ফলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে কমিউনিস্ট-বিরোধী দেশগুলির নৈতিক সমর্থন লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি কমিউনিস্টদের গ্রাস হইতে স্পেনকে রক্ষা করিতেছেন একথা প্রচার করিয়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের এমন কি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরোক্ষ সমর্থনলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইলে ইতালি ও জার্মানির সহিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে

জেনারেল ও ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ

হিট্‌লার মুসোলিনির বিদ্রোহীদের সাহায্য দান

রাশিয়ার ও ব্রিটিশ-ফরাসী-মার্কিন সাম্য-বাদীদের স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য দান

একথা ভাবিয়াও ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার একক বা যুগ্মভাবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। ফলে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার নীতির পরিপূরক হিসাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জেনারেল ফ্রাঙ্কো বা প্রজাতান্ত্রিক সরকার কাহাকেও কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে রাজী হইল না। এইভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এবং স্পেনের বৈধ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সম-পর্যায়ে স্থাপন করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে লীগ স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ব্রিটেনও স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং বিদেশী সৈন্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর যাবতীয় অধিকার (Status of Belligerents) দানে স্বীকৃত হইল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ যখন সুনিশ্চিত তখন ইতালি ও জার্মানি স্পেন হইতে তাহাদের সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) ব্রিটেন ও ফ্রান্স জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো অল্পকালের মধ্যেই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ দখল করিলে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাব

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত সরকার স্বীকৃত

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব : স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের গুরুত্ব স্পেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

(১) হিট্‌লার-মুসোলিনির শক্তিবৃদ্ধি

প্রথমত, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান ও জয়লাভ হিট্‌লার ও মুসোলিনির অধীনে যে একক অধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(২) উদার-নীতির বিরুদ্ধে একক অধিনায়কত্বের জয়লাভ

দ্বিতীয়ত, স্পেনে একক অধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা একক অধিনায়কত্ব ও উদার-নীতির আদর্শগত দ্বন্দ্বে উদারনীতির পরাজয় ও প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ সূচিত করিয়াছিল। হিট্‌লার-মুসোলিনির পক্ষে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ তাঁহাদের অনুসৃত নীতির-ই জয়ের সামিল ছিল।

(৩) ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেন ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার হিট্‌লার ও মুসোলিনির সামরিক সুযোগ বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, হিট্‌লার-মুসোলিনির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেন ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার লাভের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত হিট্‌লার-মুসোলিনির সম্ভাব্য যুদ্ধে আফ্রিকা ও এশিয়াস্থ ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশসমূহের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পথ সহজতর হইয়া রহিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের (৪) হিট্‌লার-মুসোলিনি তোষণ ও রুশ ভীতি

চতুর্থত, স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা একদিকে যেমন এই দুই দেশের সরকারের হিট্‌লার-মুসোলিনি তোষণ-নীতি প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অপর দিকে তাহাদের রুশ-ভীতিও সুস্পষ্ট করিয়াছিল।

(৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া

পঞ্চমত, হিট্‌লার-মুসোলিনির, বিশেষভাবে হিট্‌লারের পক্ষে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ার কাজ করিয়াছিল। জার্মানির বিমানবাহিনীর দক্ষতা ও মারণাস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এবং ইতালি-জার্মানির যুদ্ধ-নীতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কিভাবে গ্রহণ করে তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ এক স্বর্ণ সুযোগ দান করিয়াছিল।

**জার্মানি-তোষণ ( Appeasement of Germany ) ঃ** নাৎসি নেতা বা ফুহ্‌রার হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের সময় হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি-তোষণ নীতি হিট্‌লারের ঔদ্ধত্য ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছিল। হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে সুদেতেনল্যাণ্ড দাবি এবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর, চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ দখল এবং শেষপর্যন্ত পোল্যাণ্ডের নিকট ডান্‌জিগ নামক শহরটি ও পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাংশের মধ্যে সংযোগ ভূমি (Corridor) দাবি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হিট্‌লার তোষণ-নীতিরই পরিণতি বলা বাহুল্য। ডান্‌জিগ ও পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে সংযোগ ভূমি (Polish Corridor) দাবির প্রশ্ন হইতেই শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। [এবিষয়ে বিশদ আলোচনা ১৫৩-১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

জার্মানির রাজ্য গ্রাস-নীতি ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ-নীতি

**রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (Russo-German Non-aggression Pact) :** ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-জার্মান তোষণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ক্রমেই সোভিয়েত সরকারের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিল। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া এবং ক্রমে সুদেতেনল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল রাশিয়ার নিরাপত্তা অচিরেই ক্ষুণ্ণ করিবে এই আশঙ্কা সোভিয়েত সরকারের মনে স্বভাবতই জাগিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নির্দেশাধীনে লিথুয়ানিয়া কর্তৃক শাসিত মেমেল বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং ডান্‌জিগ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' ( Polish Corridor ) দাবি করিয়া বসিলেন। হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস-নীতি এইবার ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনও জার্মানি-তোষণ নীতির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন একথা উপলব্ধি করিলেন। সামরিক দিক দিয়া ব্রিটেন তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, একথা বলা যায় না। কিন্তু হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস-নীতি ক্রমেই প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া ব্রিটেন জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য দানে কৃতসংকল্প হইল। ফ্রান্স জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে সর্বদাই ভীত ছিল, এই জার্মানির সীমাহীন শক্তি সঞ্চয় ও ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য স্বভাবতই ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেজন্য ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সও হিট্‌লারের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল। ডান্‌জিগ ও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সংযোগ ভূমি ( Polish Corridor ) দখল করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ফলে পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের একটি পরস্পর নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সাহায্য-সহায়তা দানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার ব্যাপারে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আগ্রহ স্বভাবতই জার্মানির অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইল। হিট্‌লার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি-পোল্যাণ্ড-এর মধ্যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যে

জার্মানির রাজ্যগ্রাস-নীতি—রাশিয়ার ভীতির কারণ

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর

অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি (১৯৩৫) নাকচ করিয়া ব্রিটেনের প্রতি তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। হিট্‌লার তখন ডানজিগ্‌ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দখল করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার প্রধান মিত্র মুসোলিনিও রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে-ছিলেন। তিনি আল্‌বানিয়া দখল করিয়া লইলে গ্রীস, রুমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কা করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই দুই দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়াকেও জার্মানির বিরুদ্ধে দলে টানিবার উদ্দেশ্যে এক নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব করা হইল। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির ক্রম-বিস্তার নীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের জার্মানি তোষণ-নীতির ফলে রাশিয়ার দিকে জার্মানির ক্রম-বিস্তার রাশিয়ার ভীতি আরও বাড়াইয়াছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে যে উদাসীন তাহা জার্মানি-ইতালি তোষণ-নীতিতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত এক ত্রি-শক্তি চুক্তির প্রস্তাব করিল। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যে কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ফ্রান্স বা ব্রিটেন উহাতে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করিল না। এমতাবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিতই অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করা একমাত্র পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইল। তথাপি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তর যদি দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত সোভিয়েত রাশিয়াকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে টানিতে পারা যাইত। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্যবাদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও দূর হইল না। তাহারা রাশিয়ার নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপন করিল তাহাতে পরস্পর নিরাপত্তার (mutual security) কোন শর্ত ছিল না। কেবলমাত্র পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস প্রভৃতির

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড-জার্মানি অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৪) ও ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি (১৯৩৫) নাকচ

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি-তোষণনীতি রাশিয়ার ভীতির কারণ

ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের অদূরদর্শিতা

নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করাই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য। অথচ ফ্রান্স ও ব্রিটেন পোল্যাণ্ড-এর সহিত পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। পোল্যাণ্ড, গ্রীস বা রুমানিয়ার স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে অথচ রাশিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি রাশিয়াকে সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে না, এইরূপ প্রস্তাব স্বভাবতই রাশিয়ার নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। এদিকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সহিতও যুদ্ধ শুরু হউক ইহা হিট্লারের অভিপ্রেত ছিল না। রাশিয়াও জার্মানির আক্রমণ অন্তত কিছু কালের জন্য এড়াইবার জন্য সচেষ্ট ছিল। ফলে, ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যখন রাশিয়ার সহিত মিত্রতাচুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন তখন ( ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯ ) সকলকে বিস্মিত করিয়া দশ বৎসরের জন্য রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির এক গোপন শর্তে সমগ্র পূর্ব-ইওরোপকে জার্মানির প্রভাবাধীন ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করা হইল।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির রাজনৈতিক তথা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যেমন ছিল সুদূরপ্রসারী তেমনি চমকপ্রদ। প্রথমত, এই চুক্তি ছিল হিট্লারের কূট-নীতির সাফল্যের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবাস্তব ও অদূরদর্শী নীতির তুলনায় হিট্লারের সাফল্য তাঁহাকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

হিট্লারের কূটনীতির সাফল্য

দ্বিতীয়ত, সামরিক দিক্ দিয়া বিচার করিলেও হিট্লারের সাফল্য তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। ডানজিগ্ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' বলপূর্বক দখল করিতে গেলে এক ব্যাপক যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে অন্তত নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে ইঙ্গ-ফরাসী সাহায্যপুষ্ট পোল্যাণ্ড জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, একথা হিট্লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার তেমন আগ্রহ না থাকিলেও ১৯৩৯

হিট্লারের সামরিক দূরদর্শিতা

খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি রাশিয়ার সাহায্য লাভ করিতে পারিলে হিট্‌লারের সামরিক সাফল্য অসম্ভব না হইলেও বিলম্বিত হইবে, তাহা হিট্‌লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে হিট্‌লারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের সুবিধা ও সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তৃতীয়ত, রাশিয়ার দিক্ হইতে বিচার করিলে রুশ-জার্মান চুক্তির প্রধান যুক্তি ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের সাম্যবাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা। জার্মানি ও ইতালির কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। জার্মানি-তোষণ বা ইতালি-তোষণের পশ্চাতে সাম্যবাদী রাশিয়ার অনমনীয় শত্রুকে কতকটা বরদাস্ত করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটেন বা ফ্রান্সের প্রতি সন্দিহান ছিল। হিট্‌লারের প্রতি যে মনোভাব সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল প্রায় অনুরূপ মনোভাবই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতি ছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু জার্মানির রাজ্যগ্রাস-নীতির কোন বিরোধিতা না করিয়া উপরন্তু মিউনিক চুক্তিতে তাহার সমর্থন প্রভৃতি কার্য-কলাপ ক্রমেই রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাশিয়া জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার বিপদে রাশিয়াকে সাহায্য দানের কোন পাল্টা শর্ত উহাতে ছিল না। রাশিয়া এইরূপ শর্ত চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হউক এই দাবী করিলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন উহাতে স্বীকৃত হন নাই। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারও রাশিয়াকে জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতালি ও জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে পর্যায়ের ব্রিটিশ প্রতিনিধি রোম বা বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই পর্যায়ের কোন ব্যক্তিকে রাশিয়ার সহিত চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় নাই।

রাশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান সন্দেহ

রাশিয়ার প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির ইহাও একটি অমার্জনীয় ত্রুটি হিসাবে বিবেচ্য। এমতাবস্থায় রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের স্বপক্ষে একটি কথাই বলিবার আছে। ইহা হইল এই যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দীর্ঘকাল রুশ শাসনাধীনে থাকিবার ফলে পোল্যাণ্ডবাসীদের মনে যে রুশ-বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল উহার ফলে রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের কোন মৈত্রীচুক্তি তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু শুধু ইহার ফলেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে নাই, একথা বলা চলে না। পোল্যাণ্ডবাসীদের রাশিয়া-বিদ্বেষ ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের রুশ-নীতি সামান্য পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল এইটুকুই মাত্র বলা যাইতে পারে।

রাশিয়ার সহিত মিত্রতায় পোল্যাণ্ডের আপত্তি—একমাত্র যুক্তি

চতুর্থত, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির একটি গোপন শর্তে পূর্ব-ইওরোপকে সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চল ও জার্মানির প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দিক্ দিয়া জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া একই পর্যায়ভুক্ত ছিল তাহা বলা যাইতে পারে।

রুশ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নীতি

পঞ্চমত, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হিট্‌লারের যুদ্ধ-নীতি অনুসরণের পথে যে বিরাট বাধা ছিল তাহা দূরীভূত করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণে উৎসাহিত করিল। রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদে সমগ্র পৃথিবীতে আসন্ন যুদ্ধের সূচনা ঘোষিত হইল। কয়েক দিন পর (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) জার্মান সৈন্য পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

হিট্‌লারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের বাধা দূরীভূত

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে, কিংবা রাশিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিলেও হিট্‌লারের উদ্ধত রাজ্যগ্রাস-নীতি বাধাপ্রাপ্ত হইত না, কিন্তু তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপ উভয় দিক্ দিয়াই শক্তিশালী শত্রুর সহিত হিট্‌লারকে একই সঙ্গে যুঝিতে হইত। অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে হিট্‌লারের প্রাথমিক সাফল্যের

উপসংহার

ইওরোপ ১৯৩৯
জার্মানি ও জার্মান মিত্রশক্তিবর্গ
মিত্রশক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি)
মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক সংরক্ষিত অঞ্চল
নরওয়ে
ফিনল্যাণ্ড
সুইডেন
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
গ্রেট ব্রিটেন
ডেনমার্ক
রা শি য়া
জার্মানি
পোল্যাণ্ড
চেকোশ্লোভাকিয়া
ফ্রান্স
সুইৎজারল্যাণ্ড
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
ইতালি
যুগোশ্লাভিয়া
পোর্তুগাল
স্পেন
কৃ-ষ্ণ-সা-গ-র
বুলগেরিয়া
গ্রীস
তুরস্ক
মরোক্কো
আলজিরিয়া
টিউনিসিয়া
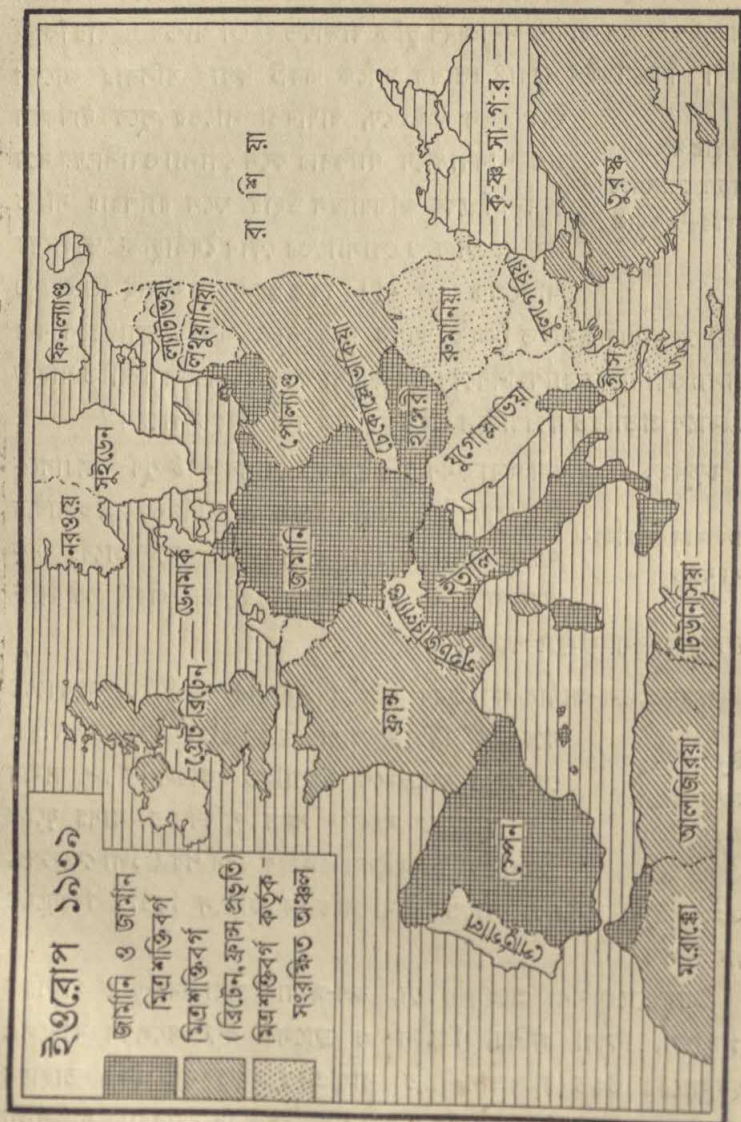
পথ সহজতর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই চুক্তি রাশিয়াকে ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সামরিক প্রস্তুতির সুযোগ দান করিয়াছিল।

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ( Causes and Effects of the Second World War ) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ দলের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই-এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী লোকঅধ্যুষিত স্থান জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা, ইওরোপের উপর একক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ইওরোপকে এবং ক্রমে সমগ্র পৃথিবীকে জার্মানির এক বিশাল উপনিবেশে পরিণত করা* এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করা ছিল ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ তথা নাৎসি সরকারের উদ্দেশ্য। ভার্সাইয়ের শান্তি চুক্তিতে জার্মানিকে চিরকালের মত হৃতমর্যাদা ও দুর্বল করিয়া রাখিবার ইচ্ছা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর অংশের সংযোগ নাশ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্মানি কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের নীতির বিরোধিতা করিয়া জার্মানির ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তদুপরি ষোড়শ শতাব্দী হইতে সামরিক শক্তি হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান রাষ্ট্রের নৌবল ও সৈন্যবল অত্যধিকভাবে হ্রাস করিয়া জার্মানির জাতীয় মর্যাদায় যে আঘাত হানা হইয়াছিল তাহা জার্মান জাতির পক্ষে দীর্ঘকাল মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। পদানত, পরাজিত জার্মানির উপর মিত্রশক্তিবর্গ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতে

জার্মানির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

* "...He planned to turn the world into a German Colony", *Hitler's Second Book* ( Vide a news item from Munich published in the A. B. Patrika, 18. 1961. )

এই শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি জার্মান জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধোত্তর কালে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক মোতায়েন সৈন্য কর্তৃক জার্মান জনসাধারণের প্রতি রূঢ় আচরণ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানিতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল উহার প্রতি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহানুভূতির অভাব জার্মানির গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার কোন সুযোগ দান করে নাই। ফলে জার্মানিতে একক প্রাধান্যের উদ্ভব ঘটিয়া জার্মান জাতি ক্রমেই এক অনমনীয়, উদ্ধত এবং সর্বাত্মক প্রাধান্যের নীতি অনুসরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতার সুযোগে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ও সর্বাত্মক প্রাধান্য নীতির অনুসরণ

দ্বিতীয়ত, জার্মানি যখন নাৎসি দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিতে শুরু করিয়াছিল সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার-দ্বয়ের দুর্বলতা প্রদর্শন নাৎসি নেতার সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। জার্মানির সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স কতকটা প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিল, ইহাও জার্মানির প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকার-দ্বয়ের তোষণমূলক নীতি অনুসরণের অন্যতম যুক্তি হিসাবে বিবেচ্য। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, মিউনিক চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক দখলের স্বীকৃতি, জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার, মেমেল বন্দর দখল প্রভৃতি স্বীকৃতি জার্মানির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণেরই ফলস্বরূপ। জার্মানি ভিন্ন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) জয় প্রভৃতিও ঐ একই নীতির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর দুর্বলতা লীগের প্রভাবশালী সদস্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি, জাপান ও ইতালি তোষণেরই ফল, বলা বাহুল্য। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে ব্রিটেন বা ফ্রান্স দণ্ডায়মান না হইবার ফলেও হিট্‌লার মুসোলিনির একক অধিনায়কত্ব-নীতি গণতন্ত্রের

জার্মানি, ইতালি, জাপান তোষণ : ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতা

বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। গণতন্ত্রের এই নৈতিক পরাজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গের মৈত্রী একক প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই বাহ্য প্রকাশ, বলা বাহুল্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে যখন জার্মানি ডানজিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনমতের চাপে এবং জার্মানির রাজ্যলিপ্সা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধা-দানে কৃতসংকল্প হইল। পক্ষান্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির যুদ্ধ শুরু করিবার পথে শেষ বাধা দূরীভূত হইল এবং জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গ

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, পোল্যাণ্ড আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্রের পরস্পর আদর্শগত দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর প্রধান শক্তিবর্গ তখন এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানি, ইতালি, জাপান অক্ষশক্তিবর্গ একক অধিনায়কত্ব, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্য-বাদের ধারক ছিল আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অন্যরূপ। গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্ব উভয়ই ছিল সাম্যবাদের শত্রু। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যে শত্রু হইতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে উহার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে কিছুকাল যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শেষে একক অধিনায়কত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া গণতন্ত্রের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষেও রুশ সাহায্য তখন প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত গণতন্ত্র ও একক অধি-নায়কত্বের আদর্শগত দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচ্য। এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিলই এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

একক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

চতুর্থত, জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল এবং সেই সূত্রে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ লীগের দুর্বলতা সর্ব-সমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। অনুরূপ ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল এবং তাহা প্রতিহত করিতে লীগের অকর্মণ্যতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অপরাপর শক্তিবর্গের দুর্বলতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া জার্মানি-ইতালি-জাপানের ঔদ্ধত্য এবং আত্মপ্রত্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল দেশের নিজ শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা তাহাদিগকে স্বভাবতই যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপান ও ইতালি কর্তৃক যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা

পঞ্চমত, জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বটে, কিন্তু এই আক্রমণ যদি কেবল পোল্যাণ্ড জয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিত তাহা হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ দেশ। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। পোল্যাণ্ড লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তি অমান্য করিয়া চলিয়াছিল। এই সকল কারণে জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অসন্তুষ্টির কারণ হইত না, কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণ হিট্‌লারের অপরিতৃপ্ত রাজ্যগ্রাস-স্পৃহার অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এই রাজ্য-গ্রাস নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়াই ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত একযোগে জার্মানিকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইবার কারণ

**যুদ্ধাবসান ও শান্তিচুক্তিসমূহ (End of the War: Peace treaties):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর চালু ছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যাক আর্থারের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল।

যুদ্ধাবসান, ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৫)

ইহার পূর্বেই ( ৭ই মে, ১৯৪৫ ) জার্মানি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল। নাৎসি ফুহ্‌রার হিট্‌লার অবশ্য ইহার কয়েকদিন পূর্বেই ( ১লা মে, ১৯৪৫ ) আত্মহত্যা করিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে অপমানিত হইবার আশঙ্কা এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহের জনসাধারণ দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান পবিত্রকার্য বলিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল সেইরূপ কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে বাস্তবতার প্রভাবই অধিক ছিল। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যোগদানই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তথাপি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদানে বাধ্য হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে পৃথিবীর সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পজাত সামগ্রী এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণের প্রাণ এবং সম্পত্তিনাশের পরিমাণ স্বভাবতই ছিল অভাবনীয়।

দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চাদর্শ অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর প্রভাব

যুদ্ধের পদ্ধতির দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তথা অপরাপর যে-কোন যুদ্ধ অপেক্ষা পৃথক ছিল। উন্নত ধরণের বিমানবহর, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহার ভিন্ন আণবিক বোমার ব্যবহার এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচ্য। প্রচারকার্য এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। রেডিও, প্রচারপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা এবং শত্রুদেশের জনসাধারণের মনে ভীতির সৃষ্টি করা ছিল এই যুদ্ধকালীন প্রচারকার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনাকীর্ণ শহরাঞ্চলে (anti-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-পদ্ধতির পার্থক্য

প্রচারকার্যের প্রভাব

personnel ) বোমা নিক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে শহরাঞ্চল ত্যাগে বাধ্য করা এবং তাহার ফলে শত্রুদেশের সামরিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও জিনিসপত্রের দ্রুত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করাও ছিল এই যুদ্ধ-পদ্ধতির অন্যতম নীতি।

**শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে-সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে যে-সকল ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরাজিত শক্তিবর্গের সহিত শান্তিচুক্তি রচিত হইয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট্‌ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন্‌ চার্চিলের মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরে এক জাহাজে সাক্ষাৎকারের পর উভয়ে যে ঘোষণাপত্র জারি

'আট্‌লান্টিক চার্টার'

করিয়াছিলেন তাহা 'আট্‌লান্টিক চার্টার' ( Atlantic Charter ) নামে অভিহিত। এই চার্টার বা সনন্দে ব্রিটেন ও আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পররাষ্ট্রের কোন অংশ গ্রাস করিবে না, পৃথিবীর সকল অংশের লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবে, নাৎসি শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে, পৃথিবীর সকল অংশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য-অধিকার স্বীকার করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি-রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবে—এই সকল

ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা কন্‌ফারেন্স ( ১৯৪৩)

শর্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কা নামক স্থানে রুজভেল্ট ও চার্চিলের মধ্যে পুনরায় যে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাতে সামরিক আলাপ-আলোচনা

ব্রিটেন্‌-আমেরিকা-সোভিয়েত পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলন

ভিন্ন ইতালি ও সিসিলি আক্রমণ ও অক্ষশক্তিবর্গকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ সম্মিলিত হইয়া শত্রুপক্ষকে

মস্কো ঘোষণা

বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ইতালিকে ফ্যাসিজমের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে ইতালির শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করেন। মস্কো হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে হিট্‌লার কর্তৃক

অস্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গ মানিবে না এবং অস্ট্রিয়াকে জার্মানির অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাইরোতে রুজভেল্ট, চার্চিল ও চিয়াং কাইশেক্ মিলিত হইয়া জাপানকে পরাজিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার নীতি গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রসার হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন বিরত থাকিবে বলিয়া রুজভেল্ট, চার্চিল ও চিয়াংকাইশেক প্রতিশ্রুত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে সকল স্থান বা দেশ অধিকার করিয়াছে এবং চীন হইতে মাঞ্চুরিয়া, পেস্কাডোরিস, ফরমোজা প্রভৃতি যে সকল স্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাপান দখল করিয়া লইয়াছিল সেই সকল স্থান হইতে জাপানকে বিতাড়নের নীতিও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার, ফরমোজা, মাঞ্চুরিয়া ও পেস্কাডোরিস প্রভৃতি চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছিল।

কাইরো সম্মেলন (১৯৪৩)

কাইরো সম্মেলনের অল্পকালের মধ্যেই রুজ্ভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন্ তেহরাণে এক সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলনে এই তিন দেশের সমর অধিনায়কগণও উপস্থিত ছিলেন। সামরিক দিক্ দিয়া এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহাতেই জার্মানিকে পরাজিত করিবার সামরিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ইরাণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান, যুগোশ্লোভিয়াকে সাহায্য দান এবং নরওয়ের উপকূলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া কর্তৃক নরওয়ে আক্রমণ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়।

তেহরাণ সম্মেলন (১৯৪৩)

উপরি-উক্ত সম্মেলনের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (২১শে জুলাই) ডাম্বার্টন ওক্স্ (Dumbarton Oaks) নামক স্থানে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কন্ফারেন্সে মোট পঁচিশটি প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মূল নীতি ছিল এই যে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার কার্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের

ডাম্বার্টন ওকস্ কন্ফারেন্স (১৯৪৪)

যুগ্ম চেষ্টা, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে স্থাপিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। শান্তিরক্ষার কার্যে যুগ্ম চেষ্টা, মধ্যস্থতা, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সামরিক বলপ্রয়োগ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন জার্মানির পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিত তখন রজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও স্টালিন ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নামক স্থানে সমবেত হইয়া ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনাইটেড ন্যাশনস্‌ সম্মেলন (United Nations Conference) আহ্বান করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা। কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে এবং সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি কিভাবে পরিচালিত হইবে এই সকল বিষয় সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির চূড়ান্ত পরাজয় এবং সে-সকল দেশের জনসাধারণের ইচ্ছানুক্রমে শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রভৃতির পরিকল্পনাও এই কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়।

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স (১৯৪৫)

ইহা ভিন্ন পৃথিবীর জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপন, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ মাত্রেরই উন্নতিসাধন, স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ দান, পরাজিত জার্মানির উপর ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার সর্বাত্মক প্রাধান্য স্থাপন প্রভৃতি নীতি স্থিরীকৃত হয়। ইহা ভিন্ন, জার্মানিতে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রাধান্য যে অংশে স্থাপিত হইবে সেই অংশ হইতে ফ্রান্সের জন্য একটি পৃথক অংশ গঠন করিয়া উহার উপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল জার্মানিকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি, বিদেশে জার্মানির বিনিয়োগ করা ( invested ) অর্থ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ বা শেয়ার প্রভৃতি দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হইবে স্থির হইল। সোভিয়েত রাজধানী মস্কোতে ক্ষতিপূরণ কমিশনের অধিবেশন বসিবে, এই কমিশন কর্তৃক জার্মানি কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে এবং জার্মানির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে সেজন্য মিত্রপক্ষীয়

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত :

জার্মানি সম্পর্কে

একটি যুগ্ম সমিতি ( Allied Control Council ) বার্লিনে স্থাপিত হইবে এই সকল সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়।

হিট্‌লার পোল্যাণ্ড অধিকার করিলে তদানীন্তন পোল্যাণ্ড-সরকার লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে স্থির হইল যে, লণ্ডনস্থ পোল্যাণ্ড-সরকার এবং ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে যে সরকার চালু ছিল এই দুইয়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে। এই অস্থায়ী সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যাণ্ডের স্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা পূর্বদিকে কার্জন লাইন ( Curzon Line ) পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে পোল্যাণ্ডের যে পূর্ব-সীমা ছিল তাহা হইতে কার্জন লাইন কতকটা পশ্চিমে ছিল, ফলে পূর্ব-দিকে পোল্যাণ্ডকে যে পরিমাণ স্থান হারাইতে হইবে উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে উত্তর ও পশ্চিম দিকে পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা সেই পরিমাণে প্রসার করা হইবে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকের রাজ্যসীমার সহিত জার্মানির রাজ্য হইতে কতকাংশ লইয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এজন্য জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় পর্যন্ত পোল্যাণ্ডকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে

জার্মানির পতনের অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত হইবে। ইহার বিনিময়ে জাপান কর্তৃক অধিকৃত শাখালিন ও উহার সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিতে হইবে, পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য রাশিয়াকে বন্দোবস্ত দিতে হইবে এবং চীনের ইস্টার্ণ রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের পরিচালনার ভার চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার উপর যুগ্মভাবে ন্যস্ত হইবে। ইহা: ভিন্ন দাইরেন বন্দরটি (Port Dairen) আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করা হইবে। কিউরাইল ( Kurile ) দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

জাপান সম্পর্কে

যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে অপরাধীদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে সে বিষয়েও রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গ ভবিষ্যতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন,

যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুতের ব্যবস্থা

রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত

এই সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়। পৃথিবীর নিরাপত্তা, শান্তি ও গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখিবার জন্য রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু কাল অন্তর একত্রে মিলিত হইবার প্রতিশ্রুতিও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে দেওয়া হয়।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্মানির পরাজয় ও হিট্‌লারের আত্মহত্যার পর ১৭ই জুলাই বার্লিন কন্‌ফারেন্স বা পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স ( Potsdam Conference )-এ যোসেফ্ স্টালিন, ট্রুম্যান ও ক্লীমেণ্ট এট্‌লী সম্মিলিত হন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের মৃত্যুতে মার্কিন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ( ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্থলে লেবার দলের নেতা ক্লীমেণ্ট এট্‌লী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। ) পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই হইতে ২রা আগস্ট পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই কন্‌ফারেন্সে সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—এই তিন দেশের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে, এই তিন দেশ এবং ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীনের ( চিয়াং কাইশেকের অধীন চীনের ) পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গ লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হইবে। এই কাউন্সিলের কর্মকেন্দ্র হইবে লণ্ডন। তবে অপরাপর দেশের রাজধানীতেও এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসিতে পারিবে। এই কাউন্সিলের সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তি-পত্র প্রস্তুত করা। জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে এই কাউন্সিলের সাহায্যে জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তি রচনা করা হইবে একথাও বলা হইয়াছিল।

পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স ( Potsdam Conference )

সিদ্ধান্ত

পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গের কাউন্সিল

জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর যে আধিপত্য ভোগ করিবে উহার নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পট্‌সডাম কন্‌ফারেন্সে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নীতি ও পদ্ধতি ছিল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(১) পরাজিত জার্মানির উপর সোভিয়েত, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। যে অঞ্চল যে সরকারের অধিকারে ছিল সেই অঞ্চলে সেই সরকারের সেনাপতি সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন স্থির হইল। কিন্তু সমগ্র জার্মানির স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়াদি যুগ্মভাবে স্থিরীকৃত হইবে এই নীতি গৃহীত হইল। এই ধরণের কাজের জন্য উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সেনাপতিদের লইয়া একটি নিয়ন্ত্রণ সমিতি ( Control Council ) গঠন করা হয়।

সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অধিকৃত জার্মানির আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্ম নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত

(২) নাৎসি দল বা ন্যাশন্যাল সোশিয়ালিস্ট্ দলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে এবং নাৎসি আমলের আইন-কানুন, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থার অ-কেন্দ্রীকরণ এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প-পরিবহন-সংক্রান্ত বিষয়াদি Control Council বা 'নিয়ন্ত্রণ সমিতির' তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হইল। জার্মানিতে কোন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকিবে না বটে, কিন্তু অর্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উপরি-উক্ত বিষয়াদির জন্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিভাগ ( Central General Administrative Departments ) স্থাপিত হইল। এগুলি অবশ্য নিয়ন্ত্রণ সমিতির ( Control Council ) নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবে স্থির হইল। (৪) নাৎসি যুদ্ধ-অপরাধী-দিগকে গ্রেফ্তার করা হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত বিচার করা হইবে। (৫) অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া সমগ্র জার্মানিকে একটি সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এজন্য শিল্প, খনি, আমদানি, রপ্তানি, বাণিজ্য, মৎস্য-চাষ, কৃষি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, ভোগসামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন, মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্মভাবে একই প্রকার নীতি প্রয়োগ করা হইবে। কেবল মাত্র সামরিক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের দিক্ দিয়া জার্মানি রুশ, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপারে পট্স্ডাম কন্ফারেন্সে স্থির হইল যে,

উত্তর-সাগর
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
ফ্রান্স
স্যার
ফরাসী
অধিকৃত
ব্রিটিশ অধিকৃত
ব্রিমেন
হামবুর্গ
জা র্মা নি
রুশ অধিকৃত
বার্লিন
স্টেটিন
পূর্ব প্রাশিয়া
ওয়ারসো
পোল্যাণ্ড
প্রাগ
চেকোস্লোভাকিয়া
মার্কিন অধিকৃত
মিউনিক
সুইটজারল্যাণ্ড
অস্ট্রিয়া
ভিয়েনা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর
মিত্রশক্তি অধিকৃত জার্মানি
জার্মানি কর্তৃক হস্তান্তরিত স্থান

জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। জার্মান জনসাধারণ যাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া নিজ অধিকৃত জার্মান অঞ্চল হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে, অপরাপর শক্তিবর্গও তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চল হইতে উহা আদায় করিবে। কিন্তু যেহেতু রুহ্‌র ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলে ছিল এবং জার্মানিতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সেই সময়ে রাশিয়ার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল সেজন্য জার্মানির নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন যন্ত্রপাতির ১৫ শতাংশ রাশিয়াকে সরবরাহ করা হইবে স্থির হইল। অবশ্য এজন্য রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চল হইতে সম-মূল্যের খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি দিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা

জার্মানির ডুবো জাহাজগুলি সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া স্থির হইল, কেবলমাত্র জার্মান ডুবো জাহাজ-নির্মাণ কৌশল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন মোট ত্রিশটি ডুবো জাহাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলিও এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

জার্মান যুদ্ধজাহাজ ও ডুবো জাহাজ রাশিয়া-আমেরিকা-ব্রিটেনের মধ্যে বণ্টন

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই অনুসারে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন স্থায়ী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া পট্‌স্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকারকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে জানান হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমা প্রসারের প্রশ্নটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইল।

পোল্যাণ্ড সমস্যা

পট্‌স্‌ডাম কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশন চালু থাকাকালীন জাপানের

হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু আণবিক বোমার ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র সম্পর্কে আমেরিকা যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল তাহার ফলে ইওরোপীয় এবং বিশেষভাবে রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ঐ সময় হইতেই পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষ

এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পরাজিত বিভিন্ন শক্তির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের পটভূমিকা রচিত হইল।

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ঃ শান্তিচুক্তিসমূহ

## ( World After the Second World War : Peace Treaties )

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে পৃথিবী ( World After the Second World War ) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্কের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন ইওরোপীয় মহাদেশের একক প্রাধান্য হ্রাস করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান দান করিয়া আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি বহুগুণে প্রসারিত করিয়াছিল, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপের প্রাধান্য নাশ করিয়া এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি ও ইতালির শক্তি ও গুরুত্ব হ্রাস করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি

নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—ইওরোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস

করিয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহকেও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বৎসর (১৯৪৫) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩% শতাংশ ছিল পরাধীন কিন্তু বর্তমানে উহা মাত্র ৬% শতাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ ঔপনিবেশিকতার দ্রুত অবসান, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবসান, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ প্রভৃতি এক নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে।

এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফল হইল পৃথিবীর শক্তিবর্গের দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'ব্লক' বা রাষ্ট্রজোট গঠন। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—এই দুইটি সংগঠনে বিভক্ত। পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তে। পৃথিবীর এইরূপ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্তি Polarisation of the World নামে অভিহিত। বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সমস্যা এবং স্বরূপই হইল এই Polarisation বা দুই অংশে বিভক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া অভাবনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এস্তোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, বেসারাবিয়া, বুকোভিনার উত্তরাংশ, পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ, টুভা, পেস্টামো, প্রাশিয়ার উত্তরাংশ, কিউরাইল, শাখালিন, রুথেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল। ফলে মোট আড়াই লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক স্থান রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় রাশিয়ার মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব সবই অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাশিয়ার সার্থক নেতৃত্ব সাম্যবাদের জয়েরই পরিচায়ক। ইওরোপে জার্মানি ও ইতালির পতন, সুদূর প্রাচ্যে জাপানের

পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিম অঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—পৃথিবী পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত (Polarisation of the World)

পতন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে এই তিনটি দেশ যে শক্তি ও প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কেবল নামে মাত্রই 'বৃহৎ রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হইতেছে, বস্তুত, এই দুই দেশের প্রাধান্যের যুগের অবসান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই ঘটিয়াছে। অনুরূপ সুদূর প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত চীনও কেবল নামে মাত্র বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লবের পূর্বাবধি চীনের অবস্থা এইরূপই ছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের ও শক্তির এইরূপ পরিবর্তন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হইবার ফলেই বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃথিবীর শক্তিবর্গ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইবার ফলে উদ্ভূত বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির পরিবর্তন এবং প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট কর্তৃক Good-Neighbour-Policy অনুসরণের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমতাই কেবল বৃদ্ধি পায় নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তামূলক মিত্রতা ব্রাজিল, গুয়াটেমেলা, এল-স্যালভাডোর প্রভৃতিতে স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্বের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল। পেরু ও ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ এবং একাদিক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ী শক্তির দুর্বলতা এবং জার্মানি, ইতালি প্রভৃতির পরাজয় ও পতনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উপর চরম আঘাত হানিয়া পৃথিবীর রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

গণতন্ত্রের পথে ল্যাটিন আমেরিকার অগ্রগতি

দক্ষিণ আফ্রিকার জাগরণ

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার পন্থা হিসাবে যুদ্ধ যে মোটেই সহায়ক নহে, এই শিক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যতটুকু সাহায্য করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সংখ্যক নূতন এবং জটিলতর সমস্যা এই যুদ্ধের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি সমস্যা, ঔপনিবেশিক সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা, আণবিক শক্তি এবং অনুরূপ মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সমস্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

**শান্তিচুক্তিসমূহ (Peace Treaties):** পট্‌স্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, জাতীয়তাবাদী চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের লইয়া যে কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers) গঠিত হইয়াছিল উহার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির সহিত ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গের শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরি-উক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গ ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড—এই পাঁচটি দেশের সহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে সমবেত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ক্রমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের সংহতি বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্‌ এবং অপরাপর দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য হেতু যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায়। যাহা হউক ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে আমেরিকা, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পরবৎসর (১৯৪৬) প্যারিসে পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গের কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। কিন্তু এই অধিবেশনেও ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার রাজ্যসীমা, ট্রিয়েস্ট্‌ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া ও অপরাপর দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে তীব্র

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

রাশিয়া ও পশ্চিমী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতানৈক্য

মস্কো কন্‌ফারেন্স (ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

প্যারিস কন্‌ফারেন্স (এপ্রিল, ১৯৪৬)

মতানৈক্য দেখা দিল। অবশেষে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদো (Bidault) ট্রিয়েস্ট্ সমস্যা সমাধানের এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনায় ট্রিয়েস্ট্ ও উহার সীমান্ত অঞ্চলকে দশ বৎসরের জন্য 'স্বাধীন অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা এবং উহার শাসনব্যবস্থা রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া ও ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করিবার এবং উহার নিরাপত্তার ভার ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) হস্তে দিবার প্রস্তাব করা হইল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারিত হইল। ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন লইয়াও প্রথমে মতানৈক্য দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে ইতালি হইতে অন্তত দশ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে স্থির হইলে এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইল। অনুরূপ ইতালীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসাও সম্ভব হইলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই মোট ২১টি দেশের প্রতিনিধিগণ প্যারিস নগরীতে শান্তিচুক্তি রচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন।

ট্রিয়েস্ট সমস্যা, ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও ইতালীয় উপনিবেশ বণ্টনের সমস্যা ও জটিলতা—সমাধান

প্যারিস শান্তিসম্মেলন আহূত

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রথম হইতে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাবের নগ্ন প্রকাশ শুরু হইল। শান্তি সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি হইতে শুরু করিয়া সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই দীর্ঘ বিতর্ক ও পরস্পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এক দৃঢ় অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার আপত্তি ও দাবির অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইল। ইতালি ভিন্ন অপরাপর চারিটি দেশ—রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও ফিন্ল্যাণ্ড রাশিয়ার সন্নিকটস্থ এবং রুশ প্রভাবিত ছিল। এগুলির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভের মতের প্রাধান্য দেওয়া হইল। উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মোট নয়টি কমিটি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল এবং মোট তিনশত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিতর্কের পর মোট ৯৪টি

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (২৯শে জুলাই, ১৯৪৬)

বিষয়ে শান্তিচুক্তিগুলির খসড়া পরিবর্তিত হইল। অতঃপর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অধিবেশনের কালে নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যখন সমবেত হইলেন তখন সেই সুযোগে শান্তিচুক্তিগুলির শর্তাদি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের পুনরায় অধিবেশন শুরু হইল। এই সম্মেলনে মোট ২১টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও ইতালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইল।

পাঁচটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)

**(১) ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Italy):** ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে ইতালীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল। (১) লিবিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও এরিট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে উপরি-উক্ত 'বৃহৎ চারি' দেশের (The Big Four) মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য ঘটিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা উহার মীমাংসা করিবে স্থির হইল। (২) ইতালি মণ্ট্ টেবর, মণ্ট্ সাইন, টেণ্ডা, বিগ্রা, সেণ্ট্ বার্ণার্ড, চেম্বার্টন প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সকে, জারা, পেলাগোসা, ল্যাগোস্টা ও ডালম্যাশিয়ার উপকূল অঞ্চল যুগোস্লাভিয়াকে, ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ও রোডস্ গ্রীসকে এবং সেসানোর দ্বীপ আল্বেনিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। (৩) ট্রিয়েস্ট্, ইস্ট্রিয়া, ভেনেজিয়ার একাংশ 'স্বাধীন অঞ্চল' (Free Territory) বলিয়া ঘোষিত হইল। (৪) ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার সীমার নিকটবর্তী যাবতীয় ইতালীয় দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইতালি ২ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈনিক, বিমানবাহিনীর জন্য মোট ২৫ হাজার সামরিক কর্মচারী, দুইশত যুদ্ধ-বিমান ও ১৫০টি অপরাপর বিমান, ২টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৪টি ক্রুইজারের বেশি সামরিক শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে না। (৫) ইথিওপিয়া ও আল্বেনিয়ার স্বাধীনতা ইতালিকে স্বীকার করিতে হইবে এবং সাত বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ১০০ মিলিয়ন ডলার, আল্বেনিয়াকে ৫ মিলিয়ন ডলার, ইথিওপিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার,

শর্তাদি

গ্রীসকে ১০৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) আফ্রিকাস্থ ইতালীয় উপনিবেশের উপর ইতালিকে অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে।

**(২) রুমানিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Rumania):** রুমানিয়া হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ট্রান্সিলভ্যানিয়া ফিরিয়া পাইল, কিন্তু উত্তর বুকোভিনা ও বেসারাবিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে এবং বুলগেরিয়াকে দক্ষিণ দব্রুদ্‌জা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া আট বৎসরের মধ্যে ৩০৩ মিলিয়ন ডলার রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইল। রুমানিয়ার সৈন্যসংখ্যা, নৌবল, বিমানবাহিনী প্রভৃতির সংখ্যাও হ্রাস করা হইল।

শর্তাদি

**(৩) বুলগেরিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Bulgaria):** বুলগেরিয়া রুমানিয়ার নিকট হইতে দক্ষিণ দব্রুদ্‌জা লাভ করিল। বুলগেরিয়াকে অবশ্য কোন স্থান হারাইতে হইল না। কিন্তু আট বৎসরের মধ্যে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসকে মোট ৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইল। ইহা ভিন্ন বুলগেরিয়াকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী হ্রাস করিতে হইল। গ্রীসের সীমার সন্নিকটে বুলগেরিয়ার কোন প্রকার সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ রাখা নিষিদ্ধ হইল।

শর্তাদি

**(৪) হাঙ্গেরীর সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Hungary):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হাঙ্গেরীর যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু রুমানিয়ার নিকট হইতে হাঙ্গেরী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সিলভ্যানিয়ার যে অংশ জয় করিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আট বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ২০০ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইতে হইল।

শর্তাদি

**(৫) ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Finland):** ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যে

সীমারেখা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে রাশিয়ার সহিত চুক্তিদ্বারা কেরেলিয়া যোজক, পেস্টামো, স্যালা অঞ্চল এবং পঞ্চাশ বৎসরের জন্য পোরখালার বন্দোবস্ত প্রভৃতি যাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন ফিন্‌ল্যাণ্ডে উৎপন্ন সামগ্রীদ্বারা আট বৎসরে তিনশত মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ রাশিয়াকে দিতে এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে বাধ্য হইল।

শর্তাদি

উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তিচুক্তির আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল চুক্তির ফলে রাশিয়াই সর্বাধিক লাভবান হইয়াছিল। রাজ্যসীমা বিস্তৃতি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য প্রভৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তিচুক্তি রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন, একথা বলা যাইতে পারে।

রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্য

**অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি ( Peace Treaty with Austria ) :** জার্মানির ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ, যথা রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ইতালি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের কালে রাশিয়া ও অপরাপর শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপ্রসূত মতানৈক্য তীব্র আকারে দেখা দিল। জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অস্ট্রিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক নাৎসি অধিকার-মুক্ত হয়। ঐ বৎসর রাশিয়া কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল রেনার (Karl Renner) নামক জনৈক অস্ট্রীয় নেতার নেতৃত্বাধীনে অস্ট্রিয়ায় একটি সাময়িক সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়া কর্তৃক গঠিত অস্ট্রিয়ার সাময়িক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে মিত্রশক্তিবর্গ অস্ট্রিয়াকে আর শত্রু দেশ বলিয়া মনে করিত না। সেইজন্য নাৎসি অধিকার হইতে মুক্ত অস্ট্রিয়ার প্রতি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উদারতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়া অস্ট্রিয়া হইতে যুগোস্লাভিয়ার জন্য এক বিরাট রাজ্যাংশ দাবি করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত

রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়ার মুক্তিসাধন ও অস্থায়ী সরকার গঠন

হইবার পর যে সকল তৈল খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-স্বার্থ অস্ট্রিয়াবাসী জার্মানির নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল সেই সকল প্রতিষ্ঠান তথা অস্ট্রিয়াস্থিত জার্মানির যাবতীয় অর্থ-নৈতিক স্বার্থও রাশিয়া দাবি করিয়া বসিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে নাৎসি সরকার যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তি আদায় করিয়া লইয়াছিল তাহা অস্ট্রিয়াকে পুনরায় ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানি অস্ট্রিয়াস্থ মার্কিন ও ব্রিটিশ তৈল প্রতিষ্ঠানগুলিও অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিয়াকে যদি জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থ পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। এজন্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়াকে এই সকল সম্পত্তির মালিকানা ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। ফলে রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহাতে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হইল না, অস্ট্রিয়ার রাজ্য-সীমায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সৈন্য মোতায়েন করা হইল।

অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তির শর্তাদির ব্যাপারে রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন মতানৈক্য

১৯৪৭—১৯৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের চেষ্টার আংশিক সাফল্য

১৯৪৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ (Foreign Ministers' Council) অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তির খসড়ার মাত্র কয়েকটি শর্ত মানিয়া লইয়াছিল। মস্কো (মার্চ ১৯৪৭), লণ্ডন (ডিসেম্বর ১৯৪৭) ও প্যারিসে (মে-জুন ১৯৪৬) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান সম্ভব হইল। যুগোস্লাভিয়ার জন্য রাশিয়া অস্ট্রিয়ার একাংশ দাবি করিয়াছিল তাহা রাশিয়া ত্যাগ করিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অস্ট্রিয়াস্থ জার্মান সম্পত্তি সম্পর্কে রাশিয়ার দাবির অনেকটাই স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে অস্ট্রিয়ার পশ্চিম অংশে সামরিক সাজসজ্জা বৃদ্ধি, ট্রিয়েস্ট্ সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক উহার শর্তভঙ্গ প্রভৃতি প্রশ্ন রাশিয়া কর্তৃক

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

উপস্থাপিত হইলে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রহিল।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রিবর্গ অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি সম্পাদনের জন্য পুনরায় সচেষ্ট হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা একটি খসড়াও প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না। এইভাবে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্টালিনের মৃত্যু ঘটিলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পুনরায় এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র-মন্ত্রিগণ ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত বার্লিনে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

রাশিয়ার অনমনীয় নীতির পরিবর্তন—সুপ্রীম সোভিয়েতে মলটভের বক্তৃতায় রুশ নীতির ব্যাখ্যা

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা বসিল। কিন্তু রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্-এর অনমনীয়তার ফলে এইবারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মলটভ্ সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় আইনসভা 'সুপ্রীম সোভিয়েত' ( Supreme Soviet )-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সোভিয়েত নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে তিনি তিনটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন : (১) অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তি নিষিদ্ধকরণ, (২) অস্ট্রিয়ার নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্থাপন ও (৩) রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন প্রতিনিধিবর্গের কন্‌ফারেন্সে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ। ইহার পর অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর জুলিয়াস রা-ব ( Julius Raab )-কে মস্কোতে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইল।

সোভিয়েত রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মতৈক্য

অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ফিগ্‌ল ও চ্যান্সেলর রা-ব মস্কো নগরীতে মার্শাল বুল্‌গানিন ও মলটভের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ফলে সোভিয়েত সরকার অস্ট্রিয়া হইতে সৈন্য অপসারণে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত একযোগে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে এবং দশ মিলিয়ন টন খনিজ তৈল এবং ১৫০ মিলিয়ন

ডলার মূল্যের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অস্ট্রিয়ার শিল্প, বাণিজ্য তৈলখনি প্রভৃতি অস্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে অস্ট্রীয় সরকার কোন শক্তির সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন বা অস্ট্রিয়ার কোন স্থানে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দান করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে আর কোন বাধা রহিল না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে ভিয়েনায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতগণ অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে (১) অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইল। (২) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ার যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় নির্ধারিত হইল। (৩) জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি (Auschluss) নিষিদ্ধ হইল। (৪) কোন কোন বিশেষ ধরণের অস্ত্রশস্ত্র অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাখা চলিবে না এই শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। (৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ, নাৎসি প্রতিষ্ঠান মাত্রেই নিষিদ্ধকরণ এবং দানিউব নদীতে সকলের অবাধভাবে নৌচালনার অধিকার, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ প্রভৃতি শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। এইভাবে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত (১৫ই মে, ১৯৫৫)

শর্তাদি

**জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সমস্যা (Problem of Peace Treaty with Germany):** জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে মতানৈক্য প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে অদ্যাপি এ বিষয়ে কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির পতনের পর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অধিকৃত হয়। এই সকল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে তাহারা পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরও অনুরূপ চারিভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু সমগ্র শহরের শাসনকার্য যাহাতে

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

একইরূপে পরিচালিত হইতে পারে সেজন্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থাৎ রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ (Inter-Allied Body) স্থাপিত হয়। ইহা ভিন্ন সমগ্র জার্মানির শাসনকার্যের মধ্যে যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে 'কণ্ট্রোল কাউন্সিল' (Control Council) নামে একটি পরিষদও স্থাপিত হয়। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর অধিনায়কগণ নিজ নিজ এলাকার শাসনকার্য কণ্ট্রোল কাউন্সিলের পরামর্শ ও সাহায্য-সহায়তা লইয়া সম্পাদন করিবেন এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথম হইতেই উপরি-উক্ত চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ দেখা দিল। রুশ প্রতিনিধি মলটভ্ জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং উহার কি পরিমাণ রাশিয়া পাইবে সে বিষয় স্থির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ অধিকৃত রুহ্‌র অঞ্চলের শাসন তথা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অংশও মলটভ্ দাবি করিলেন। ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য বাড়িয়া চলিল। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়, জার্মানির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐক্য বজায় রাখা, জার্মানির নাৎসিবাদের অবসান, জার্মানির সামরিক নিরস্ত্রীকরণ এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের রাজ্য-সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু বিবাদ শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনপ্রকার মীমাংসা সম্ভব না হইলে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব বার্ণেস (Byrnes) পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অধিকৃত জার্মানির অংশসমূহের ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জার্মানির ভয়ে ভীত ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন অংশ দুইটি সংযুক্ত হইল। জার্মানির সর্বাধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল হইল রুহ্‌র। এই অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারে ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন অংশদ্বয়ের সংযুক্তিতে রুহ্‌র অঞ্চলের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের হস্তে থাকিবে এবং রুশ বা ফরাসী সরকার এই ব্যাপারে কোন

'কণ্ট্রোল কাউন্সিল' স্থাপন

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত জার্মানির (পশ্চিম-জার্মানির) অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপন

অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবে না, এজন্য সোভিয়েত রাশিয়া এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিল। ফ্রান্স অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের সহিত যোগদান করিলে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অর্থ নৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইল ( ১৯৪৭ )। কেবলমাত্র রাশিয়া ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই তিন সরকারের অধীন অঞ্চলসমূহ 'পশ্চিম-জার্মানি' এবং রুশ সরকার অধিকৃত অঞ্চল 'পূর্ব-জার্মানি' নামে অভিহিত হইল।

পর বৎসর ( ১৯৪৮ খ্রীঃ ) বার্লিন শহরের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে ছিল সেই অংশ ভিন্ন অপরাপর অংশ এবং পশ্চিম-জার্মানির প্রতিনিধি লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী সরকার একটি সংবিধান সভা ( Constituent Assembly ) গঠন করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে উইমার সংবিধান সভা যে সংবিধান জার্মানিতে চালু করিয়াছিলেন সেই সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত 'বন্ সংবিধান' ( Bonn Constitution ) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হইলে পশ্চিম-জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হইল। ইতিপূর্বেই পশ্চিম-জার্মানিতে এক নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিয়া এবং নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া পশ্চিম-জার্মানির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। রাশিয়াও নিজ অধিকৃত অঞ্চলে একটি নূতন শাসনব্যবস্থা চালু করিয়া নানাবিধ ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিল।

*পশ্চিম-জার্মানিতে বন্ সংবিধান প্রবর্তন*

এইভাবে জার্মানি দুইটি পরস্পর-বিরোধী অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানির উপর প্রাধান্য লইয়া যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূল কথা হইল এই যে, উভয় পক্ষই জার্মানিকে নিজের দলে টানিয়া অপর পক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্মানিকে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে, পক্ষান্তরে রাশিয়া পূর্ব-জার্মানিকে ইওরোপীয় মহাদেশের অন্তঃস্থলে সাম্যবাদের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। সুতরাং জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সমস্যা

*পূর্ব-জার্মানিতে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন*

*জার্মানিতে সাম্যবাদ ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব*

ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। [জার্মানির বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

**জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Japan) :** ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ জাপান বিনা শর্তে মার্কিন সমর অধিনায়ক ড্যাগলাস্ ম্যাক্ আর্থার (Douglas MacArthur)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং পরাজিত জাপানের উপর আমেরিকার একপ্রকার একক প্রাধান্য-ই স্থাপিত হইল। ব্রিটেন, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন প্রতিনিধিবর্গ লইয়া মিত্রপক্ষীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইলেও উহার উপদেশ গ্রহণ বা বর্জন ব্যাপারে জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনিই ছিলেন সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলের সর্বোচ্চ সমর অধিনায়ক। এমতাবস্থায় জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি ব্যাপারে কিংবা জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোরিয়ার যুদ্ধ, চীনের বিপ্লব প্রভৃতির ফলে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব ঘটিল। অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হইল। আমেরিকা সহ মোট ৫২টি দেশ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাপানের সহিত শান্তিচুক্তির খসড়ার কয়েকটি শর্তের বিরোধিতা করিলেন। জাপানে বোনিন ও রিউকু (Bonin and Ryuku) দ্বীপ দুইটি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে স্থাপনের এবং জাপানে বিদেশী সৈন্য মোতায়েন রাখিবার শর্তগুলির পরিবর্তনের প্রস্তাব তিনি করিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান উহার কোন গুরুত্ব দান না করিলে ভারত সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল না। অবশিষ্ট ৫১টি দেশ সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের

জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক অংশ গ্রহণ

চীনের বিপ্লব ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব

সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্স—শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)

প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তিচুক্তির শর্তাদি লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট ৪৮টি রাষ্ট্র ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

এই শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে জাপানকে কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইহা ভিন্ন কোয়েলপার্ট দ্বীপ, দাগেলেত ও হ্যামিল্টন বন্দর কোরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ফর্‌মোজা, কিউরাইল, শাখালিন, পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ, প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং চীনের উপর জাপান সর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিল। জাপান অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটাইতে এবং এবিষয়ে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টার মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। জাপানকে নিজ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এককভাবে অপর এক বা একাধিক মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হইল। চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশী সৈন্য জাপান ত্যাগ করিবে, কিন্তু জাপান স্বেচ্ছায় যে-কোন মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী জাপানে রাখিতে পারিবে। অপর এক শর্ত দ্বারা জাপান শান্তিচুক্তিতে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। শান্তিচুক্তি বলবৎ হইবার সময় হইতে মোট চারি বৎসর জাপান শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইল। জাপানের নিকট হইতে দ্বিতীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিলে জাপান অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে এই কারণে স্থির হইল যে, মিত্রপক্ষীয় যে দেশ জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই দেশ ইচ্ছা করিলে জাপানের নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতি-পূরণের পরিবর্তে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-সহায়তা লাভ করিতে পারিবে। যুদ্ধের পূর্বকালীন ঋণের ব্যাপারেও জাপান মহাজন দেশের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা করিবে। এই শান্তিচুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক উহা মীমাংসিত হইবে, স্থির হইল।

শান্তিচুক্তির শর্তাদি

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করে নাই। স্বভাবতই এই শান্তি-চুক্তিও ভারত স্বাক্ষর করে নাই। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার জাপানের সহিত পৃথক-ভাবে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে জাপান ও ভারত পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত জাপানের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুই দেশ পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ অধিকার দানে স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য জাপানের প্রতি ভারত এক উদার, মিত্রতাপূর্ণ নীতি প্রথম হইতেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

ভারত-জাপান শান্তি-চুক্তি (১৯৫২)

জাপানের সহিত মিত্রপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের ( সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫১ ) সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে একটি নিরাপত্তা-মূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোট ২৯টি শর্তসম্বলিত এই জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির প্রথম শর্তানুসারে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের অভ্যন্তরে এবং সীমান্ত দেশে সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনী মোতায়েন রাখিবার অধিকার দানে বাধ্য হয়। সুদূর প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শর্তটি জাপানের উপর চাপাইয়া দিয়া জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংরক্ষিত দেশে পরিণত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।* দ্বিতীয় শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ভিন্ন জাপান অপর কোন রাষ্ট্রকে কোনপ্রকার অধিকার দিতে পারিবে না। তৃতীয় শর্তানুসারে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনাক্রমে জাপানের কোন্ কোন্ স্থানে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে, এই নীতি নির্ধারিত হয়। চতুর্থ শর্তানুসারে স্থির হয় যে, জাপান তথা সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা ইউনাটেড্ ন্যাশন্‌স্ বা অপর কোন রাষ্ট্রজোটের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব হইবে মনে হইলেই জাপান ও মার্কিন সরকার এই নিরাপত্তা চুক্তির অবসান ঘটাইবে। অপরাপর শর্তের দ্বারা জাপানে প্রবেশকারী মার্কিন জাহাজ, বিমান

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি (Japan-U.S. security pact )

শর্তাদি

* Vide Schuman,

প্রভৃতির কোন শুল্ক দিতে হইবে না এবং মার্কিন সরকারের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাপানে আনীত কোনপ্রকার সামগ্রীর উপর শুল্ক স্থাপন করা হইবে না, জাপানে অবস্থানকারী মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ মার্কিন সামরিক বিচারালয়ের অধীন থাকিবে। এই ধরণের নানাপ্রকার অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল।

---

# চতুর্দশ অধ্যায়

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ঃ ঠাণ্ডা লড়াই

## ( After the Second World War : Cold War )

**রাশিয়া ( Russia ):** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের সময় হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সম্বন্ধ পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির অন্যতম প্রধান কারণই ছিল এই পরস্পর অনাস্থা ও বিদ্বেষভাব। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে নিছক পরিস্থিতির চাপেই পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের অর্থাৎ আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার এক কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর আন্তরিকতার কোন স্থান ছিল না। সুতরাং সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পরই রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর, সন্দেহ, অনাস্থা ও বিদ্বেষভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তার ও রুশ প্রভাবিত অঞ্চলের সীমাবৃদ্ধি এই বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি করিল।

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা রুশ

সরকারকে নাৎসি জার্মানির ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই দ্বিতীয় যুদ্ধ চালু অবস্থায়ই রাশিয়া বাল্‌টিক ও বলকান অঞ্চলে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া পূর্ব-ইওরোপকে তথা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহিল। ইহা ভিন্ন, জার্মানির সীমারেখা ধরিয়া রুশ প্রভাবিত অঞ্চল গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও রাশিয়া করিতে লাগিল।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণ—পূর্ব-ইওরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার

বাল্‌টিক অঞ্চলে এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া, বলকান অঞ্চল ও জার্মানির সন্নিকটে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, আলবানিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি মোট এগারটি রাষ্ট্র ক্রমে রাশিয়ার কুক্ষিগত হইল। এই রাষ্ট্রগুলি 'জনসাধারণের গণতন্ত্র' (People's Democracy) নামে এক নূতন ধরণের সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাধীন স্থাপিত হয়। এই সকল দেশ নাৎসি জার্মানির অধিকার হইতে রাশিয়ার লালফৌজ কর্তৃক মুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেই রাশিয়া রুশ প্রভাবিত অঞ্চল গঠনের দিকে মনোযোগী হয়। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে অবশ্য এই নীতি সাফল্য লাভ করে।

গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার উপর রুশ প্রাধান্য বিস্তার নীতির ব্যর্থতা

গ্রীসের উপর রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ব্রিটেনের বিরোধিতায় ব্যাহত হইয়াছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিন ও চার্চিল এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া গ্রীসের উপর ইংলণ্ডের এবং রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার উপর রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব-ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের উপর রুশ প্রভাব রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ নৈতিক—এই তিনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক্ দিয়া এই সকল দেশের সহিত রাশিয়ার যোগসূত্র কমিনফর্মের শাখা ও স্থানীয় কমিউনিস্টদলের মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে এই সকল দেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র লইয়া 'রুশ ব্লক' (Russian or Soviet Block) গঠিত হইয়াছে। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার সহিত রুশ-ব্লকভুক্ত

রুশ প্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহের সহিত রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্ক

দেশসমূহের যোগাযোগ কতকগুলি বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল দেশে রাশিয়ার সাহায্য লইয়া নানাবিধ যুগ্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়ার চেষ্টায় জার্মানি ও ইতালির নিকট হইতে বিভিন্ন সামগ্রী আদায় করিয়া এই সকল দেশকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতিও রাশিয়ার চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে।

**পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ ( Western Powers ):** রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে প্রভাব বিস্তার ও সোভিয়েত ব্লক গঠন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশ গ্রহণ এবং নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতনের পশ্চাতে রাশিয়ার অবদান, সর্বোপরি রাশিয়ার সামরিক দক্ষতা রাশিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইঙ্গ-ফরাসী প্রাধান্যের স্থলে আমেরিকার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিলাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপর শ্রেষ্ঠ শক্তির মর্যাদা দান করিয়াছে। বস্তুত, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তিই হইল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া কর্তৃক 'সোভিয়েত ব্লক' গঠনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহার ফলেই ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ( Truman Doctrine ) এবং 'মার্শাল প্ল্যান' (Marshall Plan) ঘোষিত হয়। গ্রীস, তুরস্ক ও পারস্য দেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগে রাশিয়া কর্তৃক সেই সকল দেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করিবার ফলেই 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ও 'মার্শাল প্ল্যান' ঘোষিত হইয়াছিল। এইভাবে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তৃতি প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর হইলে 'পশ্চিমী ব্লক' ( Western Block)-এর সৃষ্টি হইল।

সোভিয়েত ব্লক গঠন—'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ও 'মার্শাল প্ল্যান'-এর মাধ্যমে পশ্চিমী ব্লক গঠন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লার-মুসোলিনির সমর বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রীস বীরত্ব সহকারে যুঝিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের অপরিসীম ব্যয়ভার অল্পকালের মধ্যেই গ্রীসের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিয়া দিলে গ্রীসের পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। নাৎসি অধিকৃত অবস্থায় গ্রীসের শিল্পোৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কৃষিও

পরিবহনের অসুবিধাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সেনাবাহিনী গ্রীস হইতে অপসরণে বাধ্য হইলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হয়। ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা গ্রীসের ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের নীতি গৃহীত হইবার পরই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিল (পৃষ্ঠা ২৯১)। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হইবার পর বামপন্থীদল ও রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাজতান্ত্রিকদের সমর্থন করিলে ক্রমে গ্রীসে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই অন্তর্যুদ্ধ দমন করিলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অত্যাচারে বহু গ্রীক কমিউনিস্ট গ্রীসের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। ঐ বৎসরই (১৯৪৫) সেপ্টেম্বর মাসে এক গণভোটে গ্রীসে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কমিউনিস্টগণ গরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক সরকারকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। যুগোস্লাভিয়া, আলবানিয়া ও বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টগণ গ্রীক কমিউনিস্টদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গ্রীসের প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয়-সংকুলান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এমতাবস্থায় গ্রীসকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ-ই ছিল সেইস্থানে কমিউনিস্ট প্রাধান্য স্থাপনের পথ সহজ করিয়া দেওয়া এবং তুরস্কের দিকে কমিউনিস্ট প্রাধান্য বিস্তারের উৎসাহ দান করা। একথা বিবেচনা করিয়া ট্রুম্যান সেক্রেটারী মার্শাল-এর পরামর্শ অনুসারে 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' (Truman Doctrine) ঘোষিত হইল।

গ্রীসের প্রতিরক্ষা সমস্যা

ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ঘোষণার প্রত্যক্ষ কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পররাষ্ট্র-নীতি জার্মানির আক্রমণ এড়াইয়া চলিবার আগ্রহ এবং রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও ভীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্ক সরকারের চেষ্টা ছিল যে-কোন উপায়ে দার্দেনেলিজ প্রণালী দিয়া বিদেশী যুদ্ধজাহাজ চলাচল বন্ধ রাখা। ইহা ভিন্ন জার্মানি উত্তর-ইওরোপ অভিমুখে অগ্রসর হইলে তুরস্ক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির

সহিত ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও ক্রীট জয় করিতে সমর্থ হইলে তুরস্কের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। ইজিয়ান সাগরে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ক্রমে জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হইলে তুরস্কের প্রায় সকল দিকেই জার্মানির রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তি বিস্তারলাভ করিল। একমাত্র রাশিয়া-তুরস্ক সীমায় জার্মানির শক্তি বা অধিকার তখনও বিস্তৃত হয় নাই। এমতাবস্থায় তুরস্ক জার্মানির সংরক্ষিত দেশে পরিণত হওয়ায় আশঙ্কা দেখা দিল।* তদুপরি ইতালির আফ্রো-এশীয় বিস্তার নীতিও তুরস্কের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলা একপ্রকার অসম্ভব দেখিয়া তুরস্ক জার্মানির সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন জার্মানি ও তুরস্কের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। জার্মানির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাই ছিল তুরস্কের এই চুক্তি স্বাক্ষর করিবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে জার্মানি তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখিয়া রাশিয়া ও তুরস্কের সম্ভাব্য মিত্রতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। কারণ হিট্‌লার রাশিয়াকে মিত্রহীন অবস্থায় রাখিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তুরস্ককে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া জার্মানি তুরস্ককে কার্যকরীভাবে সাহায্য-দানের জন্য চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক নিজ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জার্মানি তুরস্কের সহিত একাধিক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আফ্রিকার সমরকেন্দ্রে জার্মানির অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িলে তুরস্ক জার্মানির সহিত স্বাক্ষরিত বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ করিল এবং দার্দেনেলিজ প্রণালী দিয়া জার্মান নৌবাহিনীর জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিল। যুদ্ধে জার্মানির সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং মিত্রপক্ষের কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ফলেই

তুরস্কের পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

জার্মানি-তুরস্ক অনাক্রমণ চুক্তি : তুরস্কের নিরপেক্ষতা

জার্মান-তুরস্ক বাণিজ্য-চুক্তি

* Vide : George Lenczowski : *The Middle East in the World Affairs*, p. 138ff.

তুরস্ক ক্রমে জার্মানির মিত্রতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধকালে তুরস্ক ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। এমন কি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইস্‌মেৎ ইনন্থর মধ্যে আদানা নামক স্থানে আলাপ-আলোচনার পর ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর কর্মচারিবর্গ গোপনে তুরস্কে আসিয়া তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদানের উপযোগী সামরিক শিক্ষাদানের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মান বিমান আক্রমণের ভয়ে তুরস্ক ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গকে তুরস্ক পরিত্যাগের আদেশ দিতে বাধ্য হয়। ইহার পরও মিত্রপক্ষ—ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া—তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগস্ট তুরস্ক জার্মানির সামরিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া জার্মানির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

তুরস্ক কর্তৃক জার্মানির সহিত বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ—দার্দেনেলিজ প্রণালী জার্মান নৌবহরের নিকট রুদ্ধ

জার্মানির সহিত তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ—জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

দ্বিতীয় যুদ্ধে তুরস্কের কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি জার্মানির নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করা রাশিয়ার বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তুরস্কের রুশ-ভীতি এবং প্রয়োজনবোধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণের জন্য ফ্রান্সকে তুর্কী সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার গোপন স্বীকৃতি রাশিয়াকে তুরস্কের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে তুরস্ক মিত্রপক্ষে যোগদান করিবে এই আশাও রাশিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক এইসব কোন কিছুই না করিলে তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তুরস্ক ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি দার্দানেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া রাশিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের অনুমতি দান করিল, শুধু তাহাই নহে অক্ষশক্তিবর্গের অন্যতম জাপানের সহিতও কূট-নৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত

রুশ-তুর্কী মনোমালিন্য

হইয়াছিল, রাশিয়া উহার শর্তাদির পরিবর্তন দাবি করিল এবং (১) কারস্ ও আর্দাহন নামক স্থান দুইটির অধিকার, (২) বোস্‌ফোরাস্ ও দার্দেনেলিজ প্রণালীর সন্নিকটে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার, (৩) বুলগেরিয়া ও থ্রেসের মধ্যবর্তী সীমারেখার পরিবর্তন এবং (৪) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মণ্ট্রে চুক্তি ( Montreau Convention ) দ্বারা বোস্‌ফোরাস্ ও দার্দেনেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াতের শর্তাদির পরিবর্তনও দাবি করিল ( ১৯৪৫ )। রাশিয়া এবিষয় লইয়া তুরস্কের উপর চাপ দিতে লাগিল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বোস্‌ফোরাস্ ও দার্দেনেলিজ প্রণালী দুইটি রাশিয়া ও তুরস্কের যুগ্ম সংরক্ষণাধীন থাকিবে এবং এতদঞ্চলের সামরিক নিরাপত্তার ভারও রাশিয়া ও তুরস্কের উপর যুগ্মভাবে ন্যস্ত থাকিবে। এই ব্যাপারে রাশিয়া ও তুরস্কের পরস্পর সম্পর্ক এমন বিষাইয়া উঠিল যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তুরস্ক রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরই ( ১২ মার্চ, ১৯৪৭ ) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রাশিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্যদানের ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার ফলে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল।

রাশিয়া কর্তৃক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী অনাক্রমণ চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তন দাবি

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন—তুরস্কের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য-দানের ঘোষণা

ইরাণ বা পারস্যের তৈল সম্পদের উপর রুশ অধিকার বিস্তৃতির চেষ্টাও 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ঘোষিত হইবার অন্যতম কারণ ছিল। পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি বা প্রভাব বিস্তার ভারতমহাসাগরের উপর অধিকার বিস্তার এবং বিশেষভাবে পারস্যের তৈলসম্পদের অংশ গ্রহণের ইচ্ছা-প্রসূত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে পাছে পারস্যের তৈল-সম্পদ অক্ষ-শক্তিবর্গের হস্তগত হয় সেই ভয়ে রাশিয়া ও ব্রিটেনের যুগ্মবাহিনী পারস্যে মোতায়েন করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দিকে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা এবং রাশিয়ার খনিজ তৈল সম্পদে পরিপূর্ণ বাকুঅঞ্চল জার্মানি কর্তৃক যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পারে সেজন্যও এই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। পরে মার্কিন সেনাবাহিনীও পারস্যের তৈল

ইরাণ বা পারস্যের তৈলসম্পদ-সংক্রান্ত জটিলতা

উৎপাদনের অঞ্চলে প্রেরিত হয়। পারস্যের উত্তরাঞ্চলের আজারবাইজান, জিলান, মাজানদেরাণ, গোরগান ও খোরাসান—এই পাঁচটি প্রদেশ ছিল রাশিয়ার অধিকারে, আর অবশিষ্টাংশ ছিল ব্রিটেনের অধিকারে। তেহ্‌রাণ অবশ্য নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে রহিল। যুদ্ধের কালে মিত্রপক্ষ পারস্যে সামরিক সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি তৈয়ার করিল। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-রুশ চাপে রেজা শাহ্ তাঁহার পুত্র মোহম্মদ রেজার স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এই সকল কারণে পারস্যবাসীদের অর্থাৎ ইরাণীদের মধ্যে মিত্রপক্ষের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিতে লাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি রাশিয়া, ব্রিটেন ও পারস্যের মধ্যে এক ত্রি-শক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হইল যে, মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর পারস্যে অবস্থান পারস্যের উপর মিত্রপক্ষীয় সামরিক অধিকার ( Military Occupation ) বলিয়া ধরা হইবে না এবং যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্য পারস্য হইতে অপসারণ করা হইবে। ইহা ভিন্ন মিত্রপক্ষ পারস্যকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষ দিকে ৩০ হাজার মার্কিন সৈন্য পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিস্থিতির এইরূপ দ্রুত পরিবর্তনে পারসিকদের মনে ভীতির সৃষ্টি হইল। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কিভাবে ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহাই পারস্য সরকারের তথা পারসিকদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

মিত্রপক্ষ কর্তৃক ইরাণ অধিকৃত

মার্কিন সেনাবাহিনীর তুরস্কে আগমন

এদিকে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরাঞ্চলে আজারবাইজান প্রদেশে কমিউনিস্ট্ প্রভাবিত 'টুডে দল' ( Tudeh Party ) এই প্রদেশকে স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করিতে চাহিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করিলে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইরাণীয় ( পারসিক ) সরকার বহু চেষ্টা করিয়াও এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও এবিষয়ে কোন দৃঢ় নীতি অবলম্বন করিতে চাহিল না। ঐ বৎসরই (১৯৪৫) ১২ই ডিসেম্বর টুডে দল আজারবাইজানকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা

আজারবাইজান বিদ্রোহ

করিল। ইহার অব্যবহিত পরে কুর্দ প্রজাতন্ত্রও স্থাপিত হইল। ইরাণীয় সরকার অনন্যোপায় হইয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট রাশিয়া কর্তৃক ইরাণীয় অঞ্চল অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিল ইরাণীয় সমস্যা সমাধানে তেমন তৎপরতা দেখাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়াই ইরাণীয় প্রধানমন্ত্রী কাভাম-এস-সুলতানে (Qavam-es-Sultaneh) রাশিয়ার সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (৪ঠা এপ্রিল্, ১৯৪৬)। এই চুক্তির শর্তানুসারে রুশ-ইরাণীয় যুগ্ম এক প্রতিষ্ঠানের হস্তে উত্তর ইরাণের তৈলসম্পদ ২৫ বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের ৫১ শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ৪৯ শতাংশ ইরাণ পাইবে স্থির হইল। ইহা ভিন্ন আজারবাইজানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কতক অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। সিকিউ-রিটি কাউন্সিলের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরাণ যে অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইল। তদুপরি ইরাণীয় মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট্ দল হইতে তিনজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। এই সকল সুযোগ-সুবিধা লাভের পর রাশিয়া ইরাণ হইতে নিজ সৈন্য অপসারণ করিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নব নির্বাচিত 'মজলিস' অর্থাৎ ইরাণীয় জাতীয় সভা ইরাণ-সোভিয়েত চুক্তি অনুমোদন না করিলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বে (১২ই মার্চ, ১৯৪৭) 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' ঘোষিত হইলে ইরাণীয়গণ মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই উৎসাহ হইয়াছিল। সুতরাং নব-নির্বাচিত মজলিস্ রাশিয়ার সহিত কাভাম-এস-সুলতানে কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি নাকচ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইরাণকে সামরিক ও বে-সামরিক সাহায্যদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য।

সিকিউরিটি কাউন্সিলে তুরস্কের নিষ্ফল অভিযোগ

রুশ-ইরাণীয় চুক্তি (১৯৪৬)

ইরাণীয় জাতীয় সভা মজলিস্ কর্তৃক রুশ-ইরাণীয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান

ইরাণ-আমেরিকা মিত্রতা চুক্তি

গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণের উপর রাশিয়ার প্রভাব-বিস্তৃতি রোধ করিবার

উদ্দেশ্যেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার বিখ্যাত 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন'* ঘোষণা করেন। স্বাধীন দেশ বা জাতিকে বহির্দেশীয় সকল প্রকার প্রভাব ও প্রাধান্যমুক্ত রাখিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য-সহায়তা দানে বদ্ধপরিকর হয়। বস্তুত, রাশিয়ার বলকান ও মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রতিরোধকল্পেই 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ঘোষণায় বিশ্লেষিত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রীস ও তুরস্কের সাহায্যার্থে চারিশত মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দ করিবার জন্য মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ জানান। তাঁহার মতে পৃথিবীর শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার যথাযথ নেতৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর যে-কোন অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সামিল—ইহাই ছিল 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর' মূল সূত্র।

'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন'—ঘোষণা (মার্চ ১২, ১৯৪৭)

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর মূল সূত্র অনুধাবন করিলেই একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে। ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিনের প্রধান উদ্দেশ্যই যে ছিল সোভিয়েত ব্লকের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ব্লক গঠন করা। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া সাম্যবাদী সোভিয়েত

* "I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting the attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political processes." President Truman's address to a joint session of the U. S. A. Congress, (March 12, 1947).

ইউনিয়ন তথা উহার নেতৃত্বাধীন দেশসমূহের সহিত ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ট্রুম্যান-ডক্‌ট্রিন ঘোষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুর্বলীকৃত ব্রিটিশ শক্তির স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর পশ্চাতে অন্যতম যুক্তি ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন পশ্চিমী স্বার্থপ্রণোদিত পদক্ষেপ হিসাবেই বিবেচ্য। কারণ গ্রীস, তুরস্ক বা ইরাণের নিরাপত্তা অপেক্ষা মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলের তৈলসম্পদ রুশ প্রভাবিত অঞ্চলভুক্ত যাহাতে না হইতে পারে তাহাই ছিল এই ডক্‌ট্রিনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর মূল উদ্দেশ্য

(এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবনতির ফলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ইওরোপীয় দেশসমূহে এক অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিতে চলিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা অদূর ভবিষ্যতে এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে এবং ইওরোপে সাম্যবাদী প্রভাব স্বভাবতই বিস্তার-লাভ করিবে একথা যখন ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিনের এক ব্যাপক ব্যাখ্যা করিয়া ইওরোপের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) প্রস্তুত করিয়া ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলিল। জেনারেল মার্শাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন হারবার্ড (Harvard)-এ বক্তৃতায় ইওরোপের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেন। ইওরোপীয় দেশগুলিতে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি দূর হইয়া স্বাধীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবে—একথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। অবশ্য মার্কিন সাহায্য প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হইল এই যে, সাহায্য-প্রার্থী দেশকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে অর্থাৎ যে-সকল দেশ নিজ চেষ্টায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে সেগুলিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে। অনিচ্ছুক দেশকে জোর করিয়া সাহায্যদান করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

মার্শাল পরিকল্পনা ট্রুম্যান ডক্ট্রিনেরই ব্যাপক প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা থাকায় যে-সকল দেশ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিল সেগুলির সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক দিকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা-ই ছিল মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ইওরোপে সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে সেই আশঙ্কা হইতেই মার্শাল পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়াছিল বলা বাহুল্য। ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ও মার্শাল পরিকল্পনা আরও একটি কথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল উহার কোন সুযোগ গ্রহণ না করিয়া এককভাবে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়া এই আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ঘোষণা ও মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরীকরণ সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মুখে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিল।

*মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য*

*সোভিয়েত বিরোধিতা —সোভিয়েত ব্লক ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর শত্রুতামূলক মনোভাব : ঠাণ্ডা-লড়াই*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অপরাপর দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সেই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে একথা সোভিয়েত সরকার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন। ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টার-এর মূল নীতিরও ইহা পরিপন্থী একথাও সোভিয়েত সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইল। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট বা পশ্চিমী ব্লক ও সোভিয়েত ব্লকের মধ্যে এক তীব্র মতদ্বৈধ দেখা দিল। ক্রমে এই দুইটি ব্লক পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিলে যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধকালীন শত্রুতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইহাই 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) নামে অভিহিত।)

**ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অর্থাৎ বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হইল পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবজনিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ-চাপ (War tension) সৃষ্টি। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি—রাশিয়া ও আমেরিকা নিজ নিজ তাঁবেদার রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরে পরিণত করিয়াছে। পূর্ব-ইওরোপ ও মধ্য-প্রাচ্যে রুশপ্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা হইতে 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'র উদ্ভব ঘটিলে ঠাণ্ডা লড়াই রীতিমত শুরু হইল। সোভিয়েত রাশিয়া 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নূতন স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিল। ইহা ভিন্ন মলটভ্ পরিকল্পনা (Molotov Plan) পূর্ব-ইওরোপের রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইল। ইহার আশু ফল পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের পরস্পর বাণিজ্য-সম্পর্ক নাশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী দেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া 'কমিনফরম্' (Cominform i.e. Communist Information Bureau) নামে একটি অন্তঃরাষ্ট্র সংস্থা স্থাপিত হইল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সাম্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে তথ্যাদির আদান-প্রদান ও পররাষ্ট্র-নীতির সংহতি বৃদ্ধি এবং মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধিতা-ই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। সমগ্র পৃথিবী এক অনভিপ্রেত যুদ্ধ-চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লক বা রাষ্ট্রজোটের এই পরস্পর-বিরোধিতার কারণেই ইতিহাস-দার্শনিক অধ্যাপক টয়নবী বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে 'Bipolar Politics' নামে অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে আজ সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন দুইটি গোলার্ধে ভাগ করা যাইতে পারে। বস্তুত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল সমগ্র পৃথিবীর

ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমিকা

'Bipolar Politics'

উপর প্রাধান্য ও নেতৃত্বলাভ। আঞ্চলিক নেতৃত্ব বা প্রাধান্য আজ অতীতের কথায় পরিণত হইয়াছে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারত, মিশর, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইলে এই সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা হয়ত সম্ভব হইবে না।

স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতিগত বৈষম্য সর্বোপরি পরস্পর সন্দেহ পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ব্লকের লড়াই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত বিরোধিতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। (সামরিক রাষ্ট্র-জোট গঠন, সামরিক উপকরণ সঞ্চয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এমন কি কোন কোন আঞ্চলিক সশস্ত্র যুদ্ধ, যেমন কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দো-চীনের যুদ্ধ, কাশ্মীরের যুদ্ধ প্রভৃতি ঠাণ্ডা-লড়াই-এর আওতায় লইয়া গিয়া পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর-বিরোধিতার তীব্রতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডিত জার্মানি বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।)

ঠাণ্ডা লড়াই-এর ব্যাপকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ঘোষণা, মার্শাল পরিকল্পনা, পক্ষান্তরে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক মার্শাল পরিকল্পনা বর্জন, কমিন্‌ফরম্ স্থাপন, প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়ার শক্তি ও প্রভাব প্রতিরোধকল্পে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ব্রাসেলস্-এর চুক্তি ( Treaty of Brussels ) গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ ও নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টার-এ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিল এবং পরস্পর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ব্রাসেলস্-এর চুক্তি ( ১৭ই মার্চ, ১৯৪৮ )

সমবায় ও সহযোগিতা দানে প্রতিশ্রুত হইল। ব্রাসেলস্-এর চুক্তি ইওরোপীয় দেশসমূহের নিরাপত্তা রক্ষা ও ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঐক্য বন্ধন স্থাপনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। ইহা ভিন্ন, এই চুক্তি, NATO ( North Atlantic Treaty Organisation ), SEATO, CENTO প্রভৃতি অপরাপর শক্তিজোটের পথ-প্রদর্শক ছিল।

**উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা ( North Atlantic Treaty Organisation = NATO ) :** ব্রাসেল্স-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ( মার্চ, ১৯৪৮ ) সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য-সহায়তার পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জার্মানির সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে অর্থাৎ রাশিয়া ও রুশ প্রভাবিত অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্র-বর্গের পরস্পর বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন শহরের অবরোধে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। [বার্লিন অবরোধ সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য ]। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, লাকেসমবুর্গ, নরওয়ে, পোর্তুগাল, আইসল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশ 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি' স্বাক্ষর করিল। তিন বৎসর পর ( ১৯৫২ ) গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-জার্মানি এই সংস্থায় যোগদান করিয়াছে।

'উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি' সংস্থা (NATO), ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯

১৪টি শর্ত-সম্বলিত NATO চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে আস্থা স্থাপন, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়-বিচার রক্ষা, নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা প্রভৃতি শর্ত মানিয়া লয়। ইহা ভিন্ন, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ নিজ নিজ দেশে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ় করিয়া, পরস্পর অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা দ্বারা সকলের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ পরস্পর সাহায্যের মাধ্যমে যুগ্মভাবে অথবা এককভাবে বৈদেশিক সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে বদ্ধ-পরিকর থাকিবে। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের কোন একটি যদি অপর কোন

শত্রু দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক দেশই উহা নিজ দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং উহা প্রতিহত করিবার জন্য যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবে। NATO চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার অনুযায়ী কর্তব্যাদি পালন করিবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সাহায্য দান করিবে। NATO সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে অপর যে-কোন ইওরোপীয় রাষ্ট্রকে এই সংস্থায় যোগদান করিতে এবং উত্তর-আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে আহ্বান করা চলিবে। এই চুক্তি প্রথমত দশ বৎসরকাল চালু থাকিবার পর যে-কোন সদস্য রাষ্ট্র আলোচনার মাধ্যমে উহার শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুরোধ জানাইতে পারিবে। ২০ বৎসর পর অবশ্য যে-কোন সদস্য রাষ্ট্র এক বৎসরের নোটিশ দিয়া উহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবে। NATO সংস্থার অধীন সামরিক কমিটি, উত্তর-আটলান্টিক কাউন্সিল প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা আছে।

NATO চুক্তির শর্তাদি

NATO সংস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা নাশের চেষ্টার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত সামরিক মৈত্রীর মূল ভিত্তি হইল NATO. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে যে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই NATO সংস্থাটি গঠিত হইয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।* সোভিয়েত রাশিয়ার পশ্চিম-ইওরোপের দিকে প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে যে NATO গঠন করা হইয়াছিল মার্কিন রাষ্ট্র-নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

NATO-এর প্রকৃতি

NATO সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবর্গ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার প্রথম দশ

---

Vide Hartmann : *The Relations of Nations.*

বৎসরের মধ্যে তাহাদের মোট যুদ্ধজাহাজ, বিমান প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া এবং আধুনিক ধরণের মারণাস্ত্র দ্বারা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সজ্জিত করিয়া NATO সংস্থাটির সামরিক শক্তি বহুগুণে বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল।

NATO-এর সমালোচনা

ইহা ভিন্ন NATO-এর সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ও সামরিক প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ করিয়া এই সকল দেশের শক্তি, অর্থ প্রভৃতির অপচয় বন্ধ করিয়াছিল। রাশিয়ার পক্ষেও এই সংস্থার বিরোধিতা করিয়া ইওরোপীয় মহাদেশে আর প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, NATO ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানস্বরূপ হইয়া পড়ায় অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর দায়িত্ব আংশিকভাবে এই সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে উহার আন্তর্জাতিক শক্তি ও মর্যাদা কতক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন NATO স্থাপনের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর বিরোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এই সংস্থায় যোগদানের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের ইচ্ছানুযায়ীই NATO-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। রুশ নেতৃবর্গ স্বভাবতই NATO সংস্থা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় কর্তৃক পৃথিবীর উপর প্রভাব-বিস্তার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিনাশের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে এই অভিযোগ করিয়াছেন। গ্রীস ও তুরস্কের NATO-এর সদস্যপদভুক্তি এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, NATO আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও যেহেতু ইহা সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী সামরিক চুক্তি হিসাবেই গঠিত হইয়াছিল সেহেতু ইহা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত না করিয়া যুদ্ধের মনোভাবেরই সৃষ্টি করিয়াছে। রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এই অলীক কল্পনা হইতেই NATO-এর উদ্ভব ঘটিয়াছিল একথা স্মরণ রাখিলে NATO শান্তি ও নিরাপত্তার পথে না চলিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকেই অধিকতর মনোযোগী একথা বলা যাইতে পারে।

**ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact):** NATO সংস্থা স্থাপনের

প্রত্যুত্তরস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীনে ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact) স্বাক্ষরিত (১৪ই মে, ১৯৫৫) হয়। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আল্‌বানিয়া ও পূর্ব-জার্মানি লইয়া এই চুক্তি বা মৈত্রী গঠিত। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সামরিক শক্তিজোট স্থাপনের দ্বারা এক যুদ্ধের চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। শুধু তাহা-ই নহে পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলেও আঞ্চলিক শক্তিজোট গঠন করিয়া যুদ্ধের ইন্ধন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওয়ারসো চুক্তি
( Warsaw Pact )

ওয়ারসো চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ তাহাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোনপ্রকার শক্তি প্রয়োগ না করিয়া শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে এবং কোন সদস্য রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রয়োজনবোধে সকলে সম্মিলিতভাবে সামরিক সাহায্যের দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে স্বীকৃত হইল। পরস্পর নিরাপত্তা ও সামরিক সাহায্য ভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবেও এই চুক্তির গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। অপরাপর যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই চুক্তিতে যোগদানের কোন বাধা রহিল না। এই চুক্তিটি ২০ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে স্থিরীকৃত হইল।

শর্তাদি

ওয়ারসো চুক্তির দোহাই দিয়া রাশিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সাম্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহা বলপূর্বক দমন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের পশ্চাতে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের নৈতিক সমর্থন ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া রাশিয়া ওয়ারসো চুক্তির অপব্যবহার করিয়াছিল। ইহা হইতে একথা-ই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিত্র রাষ্ট্রবর্গের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া চলা-ই রাশিয়ার উদ্দেশ্য।

রাশিয়া কর্তৃক
হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ
দমন

**আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট ( Regional Security Alliances ) : মধ্য-প্রাচ্য ( The Middle East ) :** মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি পৃথিবীর মোট তৈলসম্পদের প্রায় অর্ধাংশের অধিকারী। এই তৈলসম্পদ নিজ

নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন দেশগুলি এক তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। স্বভাবতই পূর্ব-পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদমূলক প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া নিজেদের স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হউক ইহা মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহের অভিপ্রেত ছিল না। স্বভাবতই এই সকল দেশ স্বাধীন, নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবার এবং মধ্য-প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ কর্তৃক ইহুদি জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ইস্রায়েল রাষ্ট্র স্থাপন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইহার সমর্থন প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা জটিলতাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তৈলসম্পদ, প্যালেস্টাইন সমস্যা ও সোভিয়েত প্রভাব বিস্তৃতির ভীতি মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যার মূল কথা।* এইরূপ পরিস্থিতিতে মধ্য-প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম হিসাবে দেখা দিলে মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে আরব লীগ, বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্যমূলক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হইয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যের গুরুত্ব : পূর্ব-পশ্চিমী ব্লকের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

যুদ্ধোত্তরকালে ইহুদিদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ব্রিটেন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে চলিয়া যায়। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারের আশঙ্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে সরাসরি অংশ গ্রহণে বাধ্য করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মধ্য-প্রাচ্যে কর্মরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণের বাৎসরিক সম্মেলন এবং উহাতে মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা একদিকে যেমন মধ্য-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে অপর দিকে

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ

* "Oil, Palestine and the Soviet menace provided the three avenues of approach." Lenczowski, p. 532.

মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে শান্তিরক্ষা মার্কিন নিরাপত্তারই অন্যতম সূত্র বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে ইহাও প্রমাণ করে। মধ্য-প্রাচ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রজোট গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক ও পাকিস্তান কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীনে আসিতে রাজী হইবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আরব লীগভুক্ত দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত, ইহুদি রাষ্ট্র ইস্রায়েলকে সমর্থন করা ও ইহুদি-বিরোধী আরব দেশসমূহের সৌহার্দ্যলাভ একই সঙ্গে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে কোনপ্রকার শক্তিজোট গঠিত না হইলে সেই অঞ্চলে রুশ প্রভাব-বিস্তৃতি রোধ করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য-প্রাচ্যে সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠনে সচেষ্ট হইল। বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে (১৯৫৫) সেই চেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য-প্রাচ্য

**বাগদাদ চুক্তি (The Bagdad Pact or CENTO):** ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাই বাগদাদ চুক্তি নামে পরিচিত। আরব লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের তীব্র প্রতিবাদসত্ত্বেও ইরাক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল। যে-কোন রাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবে এই শর্তের সুযোগে ব্রিটেন, পাকিস্তান, ইরাণ উহাতে যোগদান করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই রাষ্ট্রজোটে সংযুক্ত হইল। বাগদাদ চুক্তিতে ইরাকের যোগদান আরব লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার প্রচেষ্টা কতক পরিমাণে ব্যাহত করিল। ইহা ভিন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহের উপর মিশরের নেতৃত্বও কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ বাগদাদ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে সামরিক সাহায্য ও সামরিক শিক্ষা দান করিয়া মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী এক সামরিক রাষ্ট্রজোট গড়িয়া তুলিল। ইহার ফলে সিরিয়া, মিশর, সউদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতামূলক নীতি অনুসরণের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইল। ফলে রাশিয়ার প্রতি এই সকল রাষ্ট্রের মনোভাব আরও মিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মধ্য-প্রাচ্যে পশ্চিমী নেতৃত্বে রাষ্ট্রজোট গঠন

আরব দেশসমূহের বিরোধিতা

বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোভাব যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি উহার ফলে ভারত-পাকিস্তান মনোমালিন্য, আরব দেশসমূহের সহিত বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতের নিরাপত্তার দিক্ হইতে বিচার করিলে পাকিস্তানের বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান এবং মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ইহার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই ভারতীয় সীমান্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। তদুপরি পাকিস্তানী নেতৃবর্গের 'যুদ্ধং দেহি' মনোবৃত্তির কথা স্মরণ রাখিলে বিদেশী সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পাকিস্তানের হস্তে দেওয়ার বিপদও নেহাৎ কম নহে, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য ভারতকে নিরাপত্তা খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে এবং তাহাতে উন্নয়নমূলক কার্য ব্যাহত হইবে। ইহা ভিন্ন বৃহৎ শক্তিবর্গের সহিত সামরিক চুক্তিবদ্ধ হইবার রাজনৈতিক কুফল নীতিগতভাবে ভারত সমর্থন করিতে পারে না, কারণ এই ধরণের সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদান করা দুর্বল রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। ইহা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বাদেরই আধুনিকতম রূপ।

বাগদাদ চুক্তি ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী

এদিকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৩শে) মিশরের সেনানায়ক জেনারেল নগুইব-এর নেতৃত্বে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইহাতে রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিশরে সামরিক শাসন স্থাপিত হয়। ইহার দুই বৎসর পর (১৯৫৪) নগুইবকে পদচ্যুত করিয়া গামাল আব্দুল নাসের মিশরের শাসনকার্য হস্তগত করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা তাঁহাকে মিশরীয় জাতির অকুণ্ঠ আনুগত্যলাভে সমর্থ করিয়াছে। আরব লীগ বর্তমানে গামাল নাসের-এর নেতৃত্বেই পরিচালিত হইতেছে।

মিশরের বিপ্লব

বাগদাদ চুক্তি নাসের-এর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, কারণ মধ্য-প্রাচ্যে এই রাষ্ট্রজোট গঠন এবং বিশেষত ইরাকের এই চুক্তিতে যোগদান মিশরের নেতৃত্বের পরিপন্থী ছিল। ইহা ভিন্ন ইস্‌রায়েল-আরব বিরোধও মিশরের সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে নাসের বাধ্য হইয়াই রাশিয়া ও চেকো-

মিশর ও বাগদাদ চুক্তি

স্লোভাকিয়া হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিলেন। এদিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সামরিক উপকরণ ক্রয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মনঃপুত ছিল না। এই অসন্তোষের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকস্মিকভাবে অস্ওয়ান বাঁধের জন্য অর্থ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইলে নাসের স্যুয়েজ খাল কোম্পানির (Suez Canal Company) জাতীয়করণ করিলেন। ইহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে এই দুইদেশ যুগ্মভাবে ইস্‌রায়েল-এর সহযোগিতায় স্যুয়েজ খাল অঞ্চল, গাজা অঞ্চল প্রভৃতিতে সৈন্য প্রেরণ করিল (অক্টোবর, ১৯৫৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সরকার এই যুদ্ধ-পন্থা অনুসরণ করিলে মার্কিন প্রতিনিধি ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এ ইস্‌রায়েলকে সৈন্যাপসারণে এবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়কে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে নির্দেশ-সম্বলিত এক প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সর্বত্র এক তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করিল। পৃথিবীর জনমতের চাপে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর নির্দেশক্রমে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। এই ঘটনা একদিকে যেমন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মর্যাদায় আঘাত হানিয়াছিল, অপরদিকে মিশরের রাষ্ট্রনায়ক গামাল নাসের-এর জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সাময়িকভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কেও তিক্ততা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, স্যুয়েজ খাল আক্রমণের ঘটনা আরব জাতীয়তাবাদকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার ফল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক্ (United Arab Republic)-এর স্থাপনে (১৯৫৮) পরিলক্ষিত হইল। মিশরের সহিত সিরিয়া ও ইয়েমেন এই প্রজাতন্ত্রে যোগদান করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক

স্যুয়েজ খাল আক্রমণ

আন্তর্জাতিক চাপে যুদ্ধ-বিরতি

ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের মর্যাদা হ্রাস—নাসের-এর জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি

ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক্

নাসের-এর কৃতিত্ব

ব্যাঙ্ক হইতে নাসের অস্‌ওয়ান বাঁধ নির্মাণ ও সুয়েজ খাল সংস্কারের জন্য অর্থসাহায্য লাভে সমর্থ হইলেন। ব্রিটেনের সহিত শেষ পর্যন্ত মিশরের পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইল।

**অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি (The ANZUS Pact)ঃ** ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে কমিউনিস্টদের জয়লাভ এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভীতির সৃষ্টি করিল। এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র NATO-এর নীতি এবং শর্তাদি অনুসরণ করিয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত এক সামরিক সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করে। Australia, Newzealand ও United States of America —এই তিন নাম হইতেই ANZUS-নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাহায্য দান, কোন দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোনপ্রকার সামরিক আক্রমণকে নিজের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহার প্রতিরোধ প্রভৃতি এই চুক্তির শর্তে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সামরিক রাষ্ট্রজোটে ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল দেশ এই ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলে পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ ও ANZUS চুক্তিবদ্ধ দেশের মধ্যে SEATO চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

শর্তাদি

**দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি বা ম্যানিলা চুক্তি (South East Asia = SEATO or Manila Pact)ঃ** ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট্ দলের জয়লাভের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার জন্য তৎপরতা শুরু হইল। জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াংকাইশেক ফরমোজা দ্বীপে সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কমিউনিস্ট্ আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভব করিলেন। ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট কুইরিনো ও চিয়াংকাইশেক কয়েকটি এশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক আহ্বান

করিতে চাহিলেন। কিন্তু এবিষয়ে দক্ষিণ-কোরিয়া ভিন্ন অপর কোন রাষ্ট্র কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করিলে কুইরিনো বাধ্য হইয়া এই বৈঠকে কোন প্রকার রাজনৈতিক বা সামরিক প্রশ্নের আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধিবর্গ বাগুইও (Baguio) নামক স্থানে সম্মিলিত হইলেন (১৯৫০)। কুয়োমিংতাং নেতা চিয়াংকাইশেক ও দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিঙ্গম্যান রী (Syngman Rhee) এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট্ বিরোধিতার কোন ব্যবস্থা করা হইবে না বলিয়া উহা বর্জন করিলেন। এই সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠনের নীতি অনুসরণের অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎপরতা শুরু করিল। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকার সমস্যা তদুপরি ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বিরূপ মনোভাব প্রভৃতির সুযোগ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিল। ব্রহ্মদেশ, ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিতও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া এই সকল দেশকে সামরিক জোটে যোগদানে স্বীকৃত করাইতে পারে নাই। যাহা হউক, ঐ বৎসরই (১৯৫৪) ম্যানিলাতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড—এই আটটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এক সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া South East Asian Collective Defence Treaty নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে, সম্মিলিতভাবে যে-কোন স্বাক্ষরকারী

বাগুইও সম্মেলন

পাকিস্তান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি

ম্যানিলা চুক্তি

দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ রোধ করিতে, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান করিতে স্বীকৃত হইল। বিদেশী সশস্ত্র আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে এই সকল রাষ্ট্র পরস্পর-পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে বলিয়াও স্বীকৃত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, SEATO চুক্তিটি অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ANZUS (অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত) চুক্তির অনুকরণেই রচিত হইয়াছিল। এই চুক্তিটির প্রয়োগস্থল ছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এশিয়াস্থ যে-সকল দেশ এই চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে সেই সকল দেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। এই চুক্তির পরিপূরক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের যে-কোনটি কমিউনিস্ট্ দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য কমিউনিস্ট্ চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধেই এই রাষ্ট্রজোট গঠন করা হইয়াছিল। NATO এবং ANZUS চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এবং পাকিস্তান ভিন্ন অপর কোন দেশকে এই সামরিক জোটে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদানের মনোবৃত্তি ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বহু দেশেরই ছিল না। ভারতের সহিত বিরোধিতা হেতু পাকিস্তান এই সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিয়াছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরউল্লা খাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এমন এক প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে SEATO শক্তিজোটকে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে ভারতের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র কমিউনিস্ট্ আক্রমণের বিরুদ্ধে SEATO শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক সাহায্যদানে প্রস্তুত এই শর্তের অধিক কিছু করিতে প্রতিশ্রুত না হওয়ায় জাফরউল্লা খাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তথাপি এই ধরণের সামরিক রাষ্ট্রজোটে পাকিস্তানের

SEATO-এর শর্তাদি

SEATO-এর প্রয়োগস্থল

ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কর্তৃক এই চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃত

জাফরউল্লার উদ্দেশ্য ব্যর্থ

যোগদানের ফলে ভারতকেও বাধ্য হইয়া সামরিক দিক দিয়া তৎপর হইতে হইয়াছে।

**আমেরিকা (America) : রিও চুক্তি (Rio Pact) :** ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গ একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার যে-কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা কোন বিদেশী অথবা আমেরিকাস্থ অপর কোন শক্তি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইলে তথাকার সকল রাষ্ট্র উহা নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইবে। এই সকল শর্তসম্বলিত একটি আইন আর্জেন্টিনা ভিন্ন অপরাপর দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিল (মার্চ, ১৯৪৫)। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারে আঞ্চলিক আত্মরক্ষামূলক রাষ্ট্রজোট গঠন এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইবে না এইরূপ শর্ত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় দক্ষিণ-আমেরিকা নিজেদের মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে একটি রাষ্ট্রজোট গঠনে সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক 'সৎ-প্রতিবেশী নীতি' (Good Neighbour Policy) অনুসরণ দক্ষিণ-আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ভয় হইতে মুক্ত হইল। ইহার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রিও-ডি-জ্যানেরিওতে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ এক সম্মেলনে সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি আমেরিকা বহির্ভূত বা আমেরিকাস্থ কোন দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পর সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। এইভাবে রিও চুক্তি (Rio Pact) স্বাক্ষরিত হইলে দক্ষিণ-আমেরিকায়ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। এই চুক্তির প্রয়োগস্থল কানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হইল। এই দুইটি দেশ অবশ্য রিও চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে নাই। যাহা হউক আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলম্বিয়ার বোগোটা (Bogota) নামক স্থানে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক কন্‌ফারেন্স আহূত হয় (১৯৪৮)। এখানে স্বাক্ষরিত বোগোটা চুক্তি (Bogota Pact) দ্বারা

দক্ষিণ-আমেরিকা রাষ্ট্রজোট—রিও চুক্তি

বোগোটা চুক্তি—OAS সংগঠন

'আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের সংগঠন' (Organisation of the American States = OAS) নামে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের একটি স্থায়ী সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার উপর আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার এবং অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, চিলি, কিউবা, কোস্টারিকা, ব্রাজিল, বোলিভিয়া, ডোমিনিকোর প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল্-সেলভাডোর, হাইটি, গোয়াটুমেলা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, পেরু, পানামা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা—এই একুশটি প্রজাতন্ত্র বোগোটা চুক্তি অনুসারে OAS-এর সদস্যভুক্ত হইয়াছে আর রিও চুক্তি দ্বারা আঞ্চলিক নিরাপত্তার যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## বর্তমান জগৎ

## (The World To-day)

**সোভিয়েত রাশিয়া (Soviet Russia):** ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ব্রিটেনের দুর্বলতা, অক্ষশক্তিবর্গ—জাপান, জার্মান ও ইতালির পতন এবং অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থ নৈতিক দুর্দশা ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে সাম্যবাদ প্রসারের সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর জগতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সম-মর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন ছিল। এমতাবস্থায় সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব মলটভের উক্তি "We live in an age when all roads lead to Communism" সোভিয়েত পররাষ্ট্রসম্পর্ক তথা সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র সুস্পষ্ট-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতি

ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিল।* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের মার্কস্‌-বাদীয় ব্যাখ্যা অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বুর্জোয়া আধিপত্য পৃথিবীর সর্বত্র আরও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং প্রোলিট্যারিয়াট শাসন স্থাপিত হইবে। সোভিয়েত রাশিয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল এই ব্যাপক বিপ্লবের নেতৃত্ব করা। স্বভাবতই, পৃথিবীর সর্বত্র প্রোলিট্যারিয়াট বিপ্লবে সাহায্য ও উৎসাহ দান এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী জনসাধারণকে সমর্থন সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সোভিয়েত আদর্শের ব্যাপক প্রসার সোভিয়েত-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন ও সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং সোভিয়েত রাশিয়া যাহাতে অপরাপর রাষ্ট্রের ভীতির সঞ্চার না করে সেজন্য 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (Peaceful Co-existence) নীতি সোভিয়েত রাশিয়া অনুসরণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে। এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—যথা, কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দোচীনের যুদ্ধ প্রভৃতির অবসান ঘটাইতে না পারিলেও এই নীতি অনুসরণের ফলে কোন ব্যাপক আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, আলবানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি বাদেই মোট প্রায় ২৭৪ মিলিয়ন বর্গমাইল (অর্থাৎ ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গমাইল) স্থান রাশিয়ার অধীন হইয়াছিল। পূর্ব-জার্মানিও সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। একমাত্র যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ-পাশ ছিন্ন করিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সার্বভৌম হইয়া গিয়াছে। মার্শাল টিটো ও স্টালিনের মধ্যে মতানৈক্যই ছিল ইহার কারণ। স্টালিনের আমলে মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়া কর্তৃক ইরাণের আজারবাইজান অধিকার, গ্রীসের অন্তর্যুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌পন্থীদের উৎসাহ ও সাহায্য দান,

স্টালিন-নিয়ন্ত্রিত রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রাদি

---

* Molotov's Speech, November 6, 1947. Vide M. G. Cupta : *International Relations Since 1919, Part II, p. 295.*

ইওরোপের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার (European Recovery Plan) পাল্টা সংস্থা কমিন্‌ফরম্‌ (Cominform) গঠন, কোরিয়ার যুদ্ধে সাহায্য দান, বার্লিন-অবরোধ এবং কমিউনিস্ট্‌ চীনের সহিত পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর স্টালিনের আমলের সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্কের কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্টালিনের পররাষ্ট্র-নীতির অনমনীয়তা এবং উহার ব্যাপকতা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অন্তরে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া সেগুলিকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিল। বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠনে তাহা পরিলক্ষিত হইল। পক্ষান্তরে ঐ সময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র-নায়কগণ একথাই রুশ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি (Capitalist Countries) সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই সকল দেশের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল কমিউনিজম্‌ ও কমিউনিস্ট্‌ রাশিয়ার অস্তিত্ব বিলোপ করা। ফলে, রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ ও সেই সকল দেশবাসীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি

রাশিয়া অ-কমিউনিস্ট্‌ দেশগুলির সহিত সর্বপ্রকার আদান-প্রদান এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল যে, রাশিয়া ঐ সময়ে এক কঠিন 'লৌহ আবেষ্টনীর' (Iron Curtain) অন্তরালে নিজেকে অপস্থত করিয়াছে এই ধারণা পৃথিবীর সর্বত্র স্বভাবতই সৃষ্টি হইল। স্টেটিন হইতে, ট্রিয়েস্ট্‌ হইতে সমগ্র ভূভাগ এই লৌহ-আবেষ্টনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বিদেশ হইতে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষেও সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ খুবই কঠিন ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নীতিগত বৈষম্য

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে যুদ্ধ-মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রভৃতি বৃদ্ধি ও আণবিক গবেষণা দ্বারা শক্তিশালী মারণাস্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হইল। তথাপি নীতিগতভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ বলিয়াই রুশ সরকার পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টির

বর্তমান পৃথিবী
রুশ মিত্রশক্তিবর্গ
মার্কিন মিত্রশক্তিবর্গ
ফরাসী ইউনিয়ন
ব্রিটিশ কমনওয়েলথ
আলাস্কা
কানাডা
গ্রীনল্যাণ্ড
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মেক্সিকো
কিউবা
ভেনেজুয়েলা
কলম্বিয়া
গুইয়ানা
ইকুয়েডর
পেরু
ব্রাজিল
বোলিভিয়া
প্যারাগুয়ে
রিও-ডি-জেনেরিও
উরুগুয়ে
গ্রেটব্রিটেন
পোল্যাণ্ড
জার্মানি
ফ্রান্স
স্পেন
তুরস্ক
মরক্কো
রিওডিওরো
আলজেরিয়া
লিবিয়া
ইজিপ্ট
ফরাসী পঃ আফ্রিকা
সুদান
আবিসিনিয়া
বেলজিয়ান কঙ্গো
এঙ্গোলা
দঃ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য
মাদাগাস্কার
ইরাক
ইরান
সাউদি আরব
ওমান
রা শি য়া
মঙ্গোলিয়া
মাঞ্চুরিয়া
কোরিয়া
জাপান
চী ন
ভারত
ব্রহ্মদেশ
শ্যাম
ইন্দোচীন
মালয়
বোর্ণিও
নিউগিনি
অস্ট্রেলিয়া

জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। এই উদ্দেশ্যে স্টালিনের আমলে একাধিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের 'স্টক্‌হলম্ শান্তি আবেদন' (Stockholm Peace Appeal) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আবেদন আণবিক বোমা প্রস্তুত নিষিদ্ধকরণের অনুরোধ পৃথিবীর আণবিক বোমা প্রস্তুতকারী দেশসমূহের নিকট জানান হইয়াছিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তি-রক্ষার আন্দোলনকে নিছক প্রচারকার্য বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহারা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচার এবং প্রকৃত কার্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া রাশিয়া শান্তি স্থাপনে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক নহে, একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল। যাহা হউক যোসেফ্ স্টালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩) পর সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা হইতে বর্তমান জগতে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার আগ্রহের আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেকেই নিঃসন্দিহান হইয়াছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টা—স্টক্‌হলম্ শান্তি আবেদন : পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সন্দেহ

স্টালিনের মৃত্যু—সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের পরিবর্তন

যোসেফ্ স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল ম্যালেনকভ্, মলটভ, নিকোলাই বুলগানিন, বেরিয়া ও কাগানোভিচ্—এই পাঁচজন নেতার উপর। ম্যালেনকভ্ হইলেন প্রধানমন্ত্রী, মলটভ্ পররাষ্ট্র সচিব, বুলগানিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, বেরিয়া আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ও পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী এবং কাগানোভিচ্ হইলেন অর্থ নৈতিক বিষয়াদির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু সেই সময়ে সোভিয়েত নেতৃবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য ও মনোমালিন্য চলিতেছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই বেরিয়ার গ্রেপ্তার ও তাঁহার সমর্থকগণের পদচ্যুতিতে প্রকাশ পাইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেনকভ্-এর স্থলে নিকোলাই বুলগানিন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এদিকে মার্শাল জুকভ্ হইলেন সমর অধিনায়ক ও মার্শাল ভরোশিলভ্ হইলেন প্রেসিডেণ্ট।

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন নেতৃবর্গ

স্টালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই সোভিয়েত পররাষ্ট্র-সম্পর্কের তথা পররাষ্ট্র-নীতির যে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিল তাহা সোভিয়েত

সরকারের কার্যকলাপের মধ্যেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নূতন রুশ নেতৃত্বাধীনে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপ কতকটা হ্রাস পাইল। কারণ স্টালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে বক্তৃতায় এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ম্যালেনকভ্ রাশিয়ার আইন-সভা সুপ্রীম সোভিয়েত (Supreme)-এর এক অধিবেশনে রুশ পররাষ্ট্র-সম্পর্কের কতকগুলি নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। এই বক্তৃতায় সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীর সকল দেশ এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও সকল সমস্যার সমাধান করিবার আগ্রহ এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সহ-অবস্থান নীতি মানিয়া চলা রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের মূল সূত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সকল মূল সূত্রের কার্যকরী প্রয়োগ দেখা গেল কোরিয়ার যুদ্ধের অবসানকল্পে এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে (জুলাই, ১৯৫৩)। ইহা ভিন্ন, বিদেশীয়দের সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ সম্পর্কে যে সকল কঠোর বাধা-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল সেগুলিও উঠাইয়া লওয়া হইল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতেও রাশিয়া স্বাক্ষর করিল। সর্বোপরি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর (মে ১৫, ১৯৫৫)। সোভিয়েত রাশিয়ার এই নূতন পররাষ্ট্র-নীতি পূর্ব-ইওরোপ, মধ্য-প্রাচ্য, পশ্চিম-ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র প্রযুক্ত হইল। গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, ইস্‌রায়েল-এর সহিত রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিল এবং ড্যাগ হ্যামারশিল্ড (Dag Hammarskjoeld)-এর ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর সেক্রেটারী-জেনারেল পদে নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিল। স্টালিনের উত্তর-সাধকগণ পররাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম প্রধান উপায় এবং নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অ-কমিউনিস্ট্ দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দানের মাধ্যমে সেই সকল দেশের জনসাধারণকে পূর্বতন অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রসমূহ

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন পররাষ্ট্র-নীতির কার্যকরী প্রয়োগ

মুক্ত করিয়া এক উন্নতধরণের অর্থনৈতিক জীবন ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে আগাইয়া দেওয়াই নূতন সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্ক আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলা যাইতে পারে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রুশ্চভ্-এর নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কে উদার-নীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ঐ বৎসরই সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দেশ পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে সাময়িকভাবে রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতিতে কঠোরতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় সেই কঠোরতা দূরীভূত হইয়া উদারতারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

ক্রুশ্চভ্-এর নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েত নীতির উদারতা

পূর্ব-ইওরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে যেগুলি রাশিয়ার প্রভাবাধীন সেগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড অন্যতম প্রধান। সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব-জার্মানির সহিত সংযোগ রক্ষা করাও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়াই সম্ভব। এমতাবস্থায় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে পোজনান নামক স্থানে এক আন্তর্জাতিক মেলা উপলক্ষে এক দাঙ্গা শুরু হইলে উহা কঠোর হস্তে দমন করা হইল। সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত সরকারের প্রভাবাধীন পোল্যাণ্ড সরকার এই দাঙ্গা সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছে, একথাই ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থাকে চাপা দেওয়া সম্ভব হইল না। জনসাধারণের সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী মনোভাব পোল্যাণ্ডের সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অবশেষে বহিঃশক্তির প্রভাব-মুক্ত জাতীয়তা ভিত্তিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী ল্যাডিস্লাভ্ গোমুল্কা (Wladyslaw Gomulka) পোল্যাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সোভিয়েত নেতৃবর্গ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভ্, মিকোয়ান, কাগানোভিচ্ ও মলটভ্ পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসোতে আসিয়া আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের নেতৃবর্গকে মস্কোতে এক যুগ্ম বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া আসিলেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর মস্কোতে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত নেতৃবর্গের যুগ্ম বৈঠকে উভয় পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে পোল্যাণ্ডের সীমার মধ্যে মোতায়েন

পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ

পোল্যাণ্ড-সোভিয়েত চুক্তি

রুশ সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস, সৈন্যদের ব্যয় সোভিয়েত সরকার কর্তৃক বহন, রাশিয়ার নিকট পোল্যাণ্ডের পূর্বেকার দুই বিলিয়ন রুব্‌ল ঋণ নাকচ করা হইবে স্থির হইল এবং পোল্যাণ্ডকে নানাপ্রকার জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ ব্যাপারে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাশিয়ার সাহায্য ও সৌহার্দ্য পোল্যাণ্ডের নিকটও অপরিহার্য ছিল। এইভাবে নূতন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত রাশিয়ার উদার পররাষ্ট্র-নীতির ফলে পোল্যাণ্ডের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism) ও সোভিয়েত সাম্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইল।

রুশ সাম্যবাদ ও পোল্যাণ্ডের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের সামঞ্জস্য বিধান

সোভিয়েত রাশিয়া-প্রভাবিত দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পোল্যাণ্ডেই যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এমন নহে। হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-প্রভাব ও কঠোর সাম্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। পোল্যাণ্ডে গোমুল্‌কার ক্ষমতালাভ হাঙ্গেরীয় জাতীয় আন্দোলনকে আরও উৎসাহিত করিয়াছিল। হাঙ্গেরীর যুবসম্প্রদায় ও শ্রমিকগণ ছিল এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ শুরু হয় ও সাময়িকভাবে উহা সাফল্য লাভ করে। এমন কি, ২৯শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহকাল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক এই বিদ্রোহ দমনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হাঙ্গেরী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার পরবর্তী দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া সোভিয়েত সামরিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির তৎপরতায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লবের পূর্বেকার শাসন-পদ্ধতি পুনঃস্থাপিত হয়। বিপ্লব শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরীর কেন্দ্রীয় সমিতি ( Hungarian Central Committee ) হেজেডাস ( Hegedus )-এর স্থলে নাগি ( Nagy )-কে প্রধানমন্ত্রী-পদে স্থাপন করিয়া হাঙ্গেরীয় শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দান করিয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারী জেরো ( Geroe ) নাগিকে না জানাইয়া 'ওয়ারসো চুক্তি'র শর্তানুসারে রাশিয়ার নিকট

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ ( ১৯৫৬, অক্টোবর )

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে রুশ সেনা-বাহিনীর অংশগ্রহণ

সামরিক সাহায্য চাহিলেন। সোভিয়েত ও হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনী বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিয়োজিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া হইতে (২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৬) সুশ্‌লভ্‌ ও মিকোয়ান বুদাপেষ্ট-এ আসিয়া হাঙ্গেরীর শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী-পদে নাগি'র নিয়োগ সমর্থন করিলেন এবং কাদার (Kadar)-কে পার্টি সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সেনাবাহিনী হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে নিযুক্ত হইলে হাঙ্গেরীতে উহার তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর জনমত ইহার সমর্থন করিল না।

নাগি'র শাসনক্ষমতা লাভ

এমতাবস্থায় সোভিয়েত সরকার বুদাপেষ্ট হইতে রুশ সৈন্য অপসারণ করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নাগি ও কাদারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। এদিকে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ, প্রায় জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। নাগি হাঙ্গেরীর 'সোশিয়ালিষ্ট ডেমোক্রেটিক দল' ও 'পেটো ফি পার্টি'—এই উভয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক যুগ্ম মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করিলেন। এমতাবস্থায় সোভিয়েত দূত মিকোয়ান ও সুশ্‌লভ্‌ পুনরায় হাঙ্গেরীতে আসিলেন।

নাগি-কাদার মতানৈক্য

কিন্তু এবার নাগি রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ওয়ারসো চুক্তি দ্বারা যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নাগির এই দাবি মিকোয়ান ও সুশ্‌লভের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা কাদারের সহিত পৃথকভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত নাগির পদচ্যুতি এবং কাদারের প্রধানমন্ত্রিত্বলাভে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। নাগিকে সোভিয়েত সরকার গোপনে হাঙ্গেরী হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া গেলেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। বিপ্লবী সভা-সমিতি, শ্রমিকদের সমিতি সব কিছু বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল।

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের অবসান

হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে সোভিয়েত সৈন্যের অংশগ্রহণ পৃথিবীর সর্বত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক গভীর অসন্তোষ ও তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করিলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশ্চভ, মেলেনকভ্‌ এবং চু-এন-লাই হাঙ্গেরীর সহিত

সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্ট-এ আসিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী কাদারকে রাশিয়ায় আসিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া ক্রুশ্চভ্ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলেন। হাঙ্গেরীর জনসাধারণের রুশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় তাঁহারা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কাদার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পুনরায় আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। অবশেষে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য রাশিয়া বহু পরিমাণ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইল। ইহা ভিন্ন হাঙ্গেরীর নিজস্ব প্রয়োজনে যতদিন পর্যন্ত রুশ সেনা-বাহিনী হাঙ্গেরীতে রাখা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিককাল রুশসৈন্য হাঙ্গেরীতে রাখা হইবে না এবং হাঙ্গেরীর বিচারালয়ে রুশ সৈন্যগণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করা হইবে স্থির হইল। এই সকল শর্তসম্বলিত চুক্তি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ বুদাপেষ্ট শহরে সোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পর হইতে হাঙ্গেরী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ-ই রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন, সোভিয়েত রাশিয়া হাঙ্গেরীকে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-দানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। হাঙ্গেরীয় বিপ্লব সম্পর্কে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। হাঙ্গেরীয়দের জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে রুশ সেনাবাহিনী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে দমনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র জনমত প্রকাশিত হইলে সোভিয়েত সরকার হাঙ্গেরীর বিদ্রোহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানি ও অর্থসাহায্যদানের গোপন তথ্যাদি প্রকাশ করেন। বস্তুত, মার্কিন সরকার কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপস্থ সোভিয়েত প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির 'মুক্তি-সাধন' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ এতদঞ্চলে শান্তি ব্যাহত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য।

সোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর চুক্তি (২৮শে মার্চ, ১৯৫৭)

হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহে বহিঃশক্তির অংশগ্রহণ

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক বহুল পরিমাণে সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া রুশব্লক ত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রোলিট্যারিয়াট শাসন-নীতির স্থলে সম্পূর্ণ

নিজস্ব এবং স্বাধীন পন্থায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে যে-দেশের পক্ষে যে পন্থা সর্বাপেক্ষা সহায়ক সেই দেশ সেই পন্থা অনুসরণ করিবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী। এই ব্যাপারে স্টালিন ও টিটোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়াকে রুশ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ স্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন নেতৃবর্গ মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার শুরু করেন এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন পন্থা আছে এই যুক্তিও মানিয়া লইলেন। সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক দৌত্য-বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিনফর্ম-এর অবসান প্রভৃতি এই দুই দেশের মিত্রতার পরিচায়ক। কিন্তু ঐ বৎসর হাঙ্গেরীর বিপ্লবে সোভিয়েত রাশিয়ার দমনমূলক পন্থা অবলম্বনের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লোভিয়ার সম্পর্ক কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রুমানিয়ায় ক্রুশ্চভ্ ও টিটোর সাক্ষাৎকারের পর হইতে এই দুই দেশের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার আদর্শগত অনৈক্য এখনও বিদ্যমান আছে।

আদর্শগত অনৈক্য

**গ্রেটব্রিটেন (Great Britain):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি গ্রেটব্রিটেন ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ব মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রায় তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক চাপ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিধি হ্রাস প্রভৃতি এজন্য দায়ী ছিল, বলা বাহুল্য। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের পক্ষে আত্মরক্ষার ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত যুগ্মনীতি অনুসরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িল। NATO-তে অংশ গ্রহণ ইহারই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্রিটেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ

ব্রিটেনের মর্যাদা হ্রাস

আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রজোটে যোগদানের নীতি অনুসরণ

করিয়া চলিয়াছিল এবং অপরাপর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেই নেতৃত্ব যেমন রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ত্যাগ করিতে হইয়াছে, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতিও ত্যাগ করিয়া ব্রাসেলস্ চুক্তি, NATO, SEATO, CENTO (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতিতে যোগদানে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটেনের স্বতন্ত্র-নীতির দুর্বলতা, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুগ্মভাবে কোন সামরিক অভিযান বা পরিকল্পনা কার্যকরী করা ব্রিটেনের পক্ষে যে আর সম্ভব নহে তাহার প্রমাণ সুয়েজখাল দখলে রাখিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সামরিক অভিযানের ব্যর্থতায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের প্রতি উদারনীতির অনুসরণ ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের মূলনীতির পরিবর্তনের পরিচায়ক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বর্তমান নীতি পশ্চিম ইওরোপীয়-রাষ্ট্রবর্গের সহিত সংঘবদ্ধভাবে চলিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

*সুয়েজ খাল আক্রমণের ব্যর্থতা*

*সাম্যবাদী নীতির স্থলে উদারনীতির অনুসরণ*

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বপ্রধান শক্তিদ্বয়ের অন্যতম হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নেতৃত্ব অর্জন করিয়াছে এবং এই নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনেই উহার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি (Policy of isolation) ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম নেতা হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্বস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রীসের অন্তর্যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দমনের অক্ষমতা দেখা দিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান "স্বাধীন জাতি তথা রাষ্ট্রমাত্রকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সামরিক দমন-নীতি অথবা বহিরাগত চাপ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক নীতির সূত্র বলিয়া গৃহীত হইবে" এই ঘোষণা করিলেন এবং গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি

*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন স্বাতন্ত্র্য নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত*

*ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন*

দেশকে কমিউনিজম্-এর বিরুদ্ধে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক এক বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করাইলেন (১৯৪৭)। এই নীতি 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ( Truman Doctrine ) নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সাম্যবাদের প্রসার এবং বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্যবাদী দল কর্তৃক প্রাধান্য লাভের বিরোধিতা করাই ছিল ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর উদ্দেশ্য। ঐ বৎসরই ( ১৯৪৭ ) জুন মাসে জর্জ মার্শাল 'মার্শাল প্ল্যান' ( Marshall Plan ) ঘোষণা করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরোপীয় দেশসমূহকে দারিদ্র্য-জনিত হতাশা ও উহার ফলে সাম্যবাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করিলেন। এই পরিকল্পনা ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা ( European Recovery Programme = ERP ) নামেও পরিচিত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ—এই চারি বৎসরের মধ্যে মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপীয় মহাদেশের অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনা ভিন্ন অনুন্নত দেশ মাত্রকেই 'কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা' ( Technical Co-operation Programme = TCP) অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯—১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মোট ৩৯ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে। এই কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা Point Four Programme নামেও পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দেশসমূহের সাহায্যার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'কলম্বো পরিকল্পনা' ( Colombo Plan )-য় যোগদান করিয়াছিল (১৯৫১)। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত TCP হইতে পাঁচ কোটি ডলার ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পাইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা তথা পৃথিবীর যাবতীয় অনুন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ সাহায্যদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল

মার্শাল প্ল্যান

'কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা' ( Technical Co-operation Programme = TCP )

কলম্বো প্ল্যান

কমিউনিজমের প্রসার রোধ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দারিদ্র্য প্রপীড়িত, ক্ষুধিত জনসমাজের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার ও প্রসার স্বভাবতই ঘটিবে একথা মার্কিন নেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়া উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তরিত করিয়াছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তরিত

এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত পোল্যাণ্ড, চেকো-স্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশকে দ্বিতীয় যুদ্ধের কালে জার্মানির কবলমুক্ত করিয়াছিল। এই সকল দেশ—পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবানিয়া প্রভৃতি লইয়া সোভিয়েত ব্লক বা সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়াছিল। যুগোস্লাভিয়া অবশ্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে।

NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি রাষ্ট্রজোট গঠন

সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠন এবং অপরাপর দেশকে নানাভাবে অর্থ-সাহায্যদান করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে বলা কঠিন। সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিরুদ্ধ শক্তি বা শক্তিজোটকে যুদ্ধ-সৃষ্টি হইতে নিরস্ত রাখিবার নীতি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা না আনিয়া এক অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা ও পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছে একথা বলা যাইতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব দ্বারা প্রভাবিত বলা বাহুল্য। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রকে সাম্যবাদী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে গিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বনাশসাধনকারী সামরিক একক অধিনায়কত্বের ( Military dictatorship ) সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অযাচিত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অর্থসাহায্যদানের ফলে সাহায্য

মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের সমালোচনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখীন সমস্যা

গ্রহণকারী দেশগুলির কোন কোনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রভৃতি দাবি করিতেছে। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যতম প্রধান সমস্যাই হইল পৃথিবীর শান্তি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, আণবিক যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীর জনসাধারণ যাহাতে রক্ষা পায় সেই সকল সমস্যার সমাধান করা।

**ফ্রান্স (France)ঃ** যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানির কবল-মুক্ত ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা ফরাসী সরকারকে এক অতি জটিল অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রের অব্যবস্থা যুদ্ধোত্তরকালে স্থাপিত চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার (Fourth Republic) পতন অনিবার্য করিয়া তুলিলে জেনারেল দ্য গলে শাসনব্যবস্থা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু পররাষ্ট্রক্ষেত্রে দুর্বলতা ফ্রান্সকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং জার্মানির ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ফ্রান্স ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ব্রাসেল্‌স্ চুক্তি, NATO প্রভৃতিতে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। তথাপি সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য রক্ষা করিয়া চলা, আণবিক শক্তিতে নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া পুনরায় ইওরোপ তথা পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে যথেষ্ট আঘাত হানিয়াছে। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ঘোষণা, টিউনিস ও মরক্কোর স্বাধীনতা অর্জন, আল্‌জেরিয়ায় বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শ্মশানশয্যা রচনা করিয়াছে। ভারতে ফ্রান্স অধিকৃত স্থানগুলির শাসনভার ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্রিটেনের সহিত যুগ্মভাবে সুয়েজ অভিযান করিতে গিয়া ফ্রান্স মিত্রশক্তি ব্রিটেনের ন্যায়-ই সম্পূর্ণভাবে বিফল ও হতমর্যাদা হইয়াছে। বর্তমান জগতে ফ্রান্স তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

পর-নির্ভরশীলতা

সাম্রাজ্যচ্যুতি

সুয়েজ অভিযানের ব্যর্থতা

হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গের সহিত পংক্তিভুক্ত হইলেও আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রীয় শক্তি, সামর্থ্য বা মর্যাদার দিক দিয়া বিচার করিলে ফ্রান্স পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের স্কন্ধে মৃতের বোঝাস্বরূপ।

**জার্মানি ঃ জার্মানির ঐক্য-সমস্যা ( Germany : Problem of German Unity ) ঃ** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশ্ব-ইতিহাসে জার্মানি দুইটি বিশ্বযুদ্ধের স্রষ্টিকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক জার্মানির রাজ্যসীমা অধিকার ইওরোপীয় তথা বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধ না ঘটাইয়াও যুদ্ধের চাপের স্রষ্টি করিয়াছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম প্রধান জটিল সমস্যাই হইল জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে বিজয়ী শক্তিবর্গ জার্মানিকে বিভক্ত করিবে না এই নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স সমগ্র জার্মানির অর্থনৈতিক ঐক্য এবং সর্ববিষয়ে যুগ্ম-নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও কার্যত জার্মানিকে চারিটি অধিকৃত অঞ্চলে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চল হইতে মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম ফ্রান্সকে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনে ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে একটি Allied Control Council গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনটি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পশ্চিম-জার্মানি গঠন করা হইয়াছিল। পর বৎসর (১৯৪৮) মার্চ মাসে সোভিয়েত প্রতিনিধি Allied Control Council ত্যাগ করিয়া গেলে জার্মানি পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল ও পশ্চিমী অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই দুই অঞ্চলের শাসনপরিচালনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের ফলে জার্মানির সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিল। পূর্ব ও পশ্চিম

পরাজিত জার্মানির দ্বিধা-বিভক্তি

মিত্রপক্ষীয় যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণ সমিতি (Allied Control Council)

অঞ্চলের পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা জার্মানির অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিয়া জার্মানিকে সম্পূর্ণ পৃথক দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিল। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহর মিত্রপক্ষের যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ-ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। বার্লিনের পশ্চিমাংশ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের এবং পূর্বাংশ সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ক্রমবর্ধমান পার্থক্য বার্লিন শহরের উপরও বিস্তৃত হইল।

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির নিয়ন্তা: পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বিভেদ

বার্লিন শহরটি আবার সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব-জার্মানিতে অবস্থিত। স্বভাবতই এই শহরের চতুর্দিক সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমতাবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং বিশেষভাবে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হইলে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে বার্লিন শহরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বার্লিন শহরের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিয়া শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পনর মাস পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করিল। বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনকে খাদ্য ও অপরাপর সামগ্রী সরবরাহ করিয়া বাঁচাইয়া রাখা 'Berlin Airlift' নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। যাহা হউক, ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহকে অর্থাৎ পশ্চিম-জার্মানির সম্পূর্ণ একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বন্ নামক স্থানে এই তিনটি অঞ্চলের ৬৫ জন প্রতিনিধি সমবেত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের 'উইমার সংবিধান-'এর ( Weimar Constitution ) অনুকরণেই 'বন্ সংবিধান' ( Bonn Constitution ) রচিত হইয়াছিল। মোট এগারটি প্রদেশ লইয়া গঠিত পশ্চিম-জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একজন প্রেসিডেন্ট, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল চ্যান্সেলর ও দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা লইয়া গঠিত আইন-

পশ্চিম-জার্মানির পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা

বার্লিন অবরোধ ও বিমানযোগে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ (Berlin Airlift)

বন্ সংবিধান

সভা আছে। উর্ধ্বকক্ষের নাম বুণ্ডেস্‌রাত্ ( Bundesrat ) ও নিম্নকক্ষের নাম বুণ্ডেস্ট্যাগ্ ( Bundestag )। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্বাচনের পর ডক্টর থিওডোর হেস ( Doctor Theodor Heuss ) প্রেসিডেণ্ট এবং ডক্টর কন্‌রাড্ অ্যাডেনেয়ার ( Dr. Conrad Adenauer ) চ্যান্সেলর-পদ লাভ করিয়াছেন। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীন পশ্চিম-জার্মানি অল্পকালের মধ্যেই অভাবনীয়ভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পূর্বের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, চশমার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী, বিভিন্নপ্রকার কেমিক্যাল উৎপাদনে পশ্চিম-জার্মানির এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। *

পশ্চিম-জার্মানির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত জার্মানির পূর্বাংশেও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ( German Democratic Republic ) নামে এক নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সংবিধান অনুসারে People's Chamber এবং Chamber of States নামে দুই কক্ষ লইয়া একটি আইনসভা গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের সভা বা People's Chamber-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক একজন মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি ( Minister-President ) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রোটওল্ ( Grotewohl ) মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব-জার্মানিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য-সহায়তায় আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত দ্বিবর্ষ-পরিকল্পনা এবং ১৯৫১-৫৫ পর্যন্ত পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু বিস্তৃতির দিক দিয়া, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, লোকবল সকল দিক দিয়াই পূর্ব-জার্মানি পশ্চিম-জার্মানির তুলনায় দুর্বল। সোভিয়েত সরকারের সাহায্য-সহায়তায়ও এই অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ উন্নতি পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতির সহিত তুলনীয় হইয়া উঠে নাই।

পূর্ব-জার্মানি: নূতন সংবিধান—জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র: আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অকিঞ্চিৎকর

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে জার্মানির রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঐক্য ভঙ্গ করা

* Vide Langsam, pp, 645-49.

হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি সমবেত শক্তিবর্গ দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভক্তি ঘটিয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও মতভেদ এজন্য দায়ী ছিল। এই মতভেদ হেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর হইতে আজ পর্যন্ত জার্মানির সহিত কোন শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক জটিল সমস্যা হইল জার্মানির পূর্ব ও পশ্চিমাংশের একত্রীকরণ এবং জার্মানিকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তকরণ। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য এই সমস্যা সমাধানের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ভিন্ন জার্মানিতে পশ্চিমী প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়া পশ্চিম-ইওরোপে সোভিয়েত-বিরোধী একটি কেন্দ্র গঠন করিবার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্য ও পক্ষান্তরে পূর্ব-জার্মানিতে সাম্যবাদী কেন্দ্র গঠন করিবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার দৃঢ় সংকল্প জার্মানির ঐক্য-সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হইলে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ—প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-জার্মানিকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করিবার নীতি গ্রহণ করিল। এবিষয়ে ফ্রান্সের বিরোধিতা এবং ব্রিটেনের সাবধানে অগ্রসর হইবার নীতি উপেক্ষা করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-জার্মানিকে নানাপ্রকার সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার নীতি অনুসরণ করিল। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতা তীব্রতর হইয়া উঠিল। এই সকল জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির ঐক্য-সমস্যার আলোচনা করিতে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর চুক্তি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। *

জার্মানির বর্তমান সমস্যা ঃ

(১) জার্মানির ঐক্য
(২) বহিঃনিয়ন্ত্রণের অবসান

জার্মানির ঐক্য সম্পর্কে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সুস্পষ্ট কোন ঘোষণার পূর্বেই সোভিয়েত রাশিয়া কতকগুলি শর্তাধীনে জার্মানির ঐক্যসাধনের প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব অনুসারে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উহাকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে এবং বৈদেশিক সৈন্যমাত্রকেই

---

* Vide *Survey of International Affairs*, 1949-50, pp. 154-55.

জার্মানি হইতে অপসারণ করিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র জার্মানির নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র জার্মানির ঐক্যসাধন করা চলিবে না। এই সকল প্রস্তাব হইতে একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, পশ্চিম-জার্মানির লোক-সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবার ফলে নির্বাচনে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে, এই আশঙ্কা সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল। যাহা হউক, এই প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক গৃহীত না হইলে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির পৃথক সত্তা বজায় ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কেবলমাত্র সমগ্র জার্মানির নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি 'কন্‌ফেডারেশন' (Confederation) গঠনের প্রস্তাব করিল (জুলাই ২৭, ১৯৫৭)। ইহার পূর্বেই পূর্ব-জার্মানিকে সোভিয়েত রাশিয়া গঠিত 'ওয়ারসো চুক্তি' (Warsaw Pact) এবং পশ্চিম-জার্মানিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ গঠিত North Atlantic Treaty-র সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাবে এই উভয় চুক্তি হইতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির অপসারণ দাবি করা হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার কোন প্রস্তাবই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট গ্রহণীয় হইল না। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বার্লিন ঘোষণা (Berlin Declaration) দ্বারা জার্মানির ঐক্য-সমস্যা সম্পর্কে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিল। এই ঘোষণায় প্রস্তাব করা হইল যে, সমগ্র জার্মানির স্বাধীন ও সম্পূর্ণরূপে প্রভাববিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জার্মান সরকারের উপর জার্মানির ঐক্যসাধনের দায়িত্ব দিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা চলিবে না। ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার অনুযায়ী যে-কোন আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থা বা রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ লোকবল, অর্থনৈতিক বল ও শিল্পোৎপাদন ক্ষমতায় ক্ষমতাশীল পশ্চিম-জার্মানির ইচ্ছানুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জার্মানির রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হউক ইহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানির

জার্মানির সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাব

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পাল্টা প্রস্তাব

পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মতানৈক্য

সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতানৈক্য ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করিল। জার্মানির সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানকল্পে ব্রিটেন হইতে উহার সমাধানের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইল। এই প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিকে 'পৃথকীকৃত অঞ্চল' (Disengaged zone)-এ পরিণত করিবার কথা বলা হইল। রাপাকি প্রস্তাব ( Rapacki Proposal ) নামে অনুরূপ আরও একটি প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এবং পোল্যাণ্ড সহ মধ্য-ইওরোপের অঞ্চলটিকে "পৃথকীকৃত ও আণবিক অস্ত্র-বিহীন অঞ্চল' ( Disengaged and Atom-free zone ) বলিয়া ঘোষণার কথা বলা হইল। কিন্তু এই ধরণের প্রস্তাব কোন পক্ষের নিকট-ই গ্রহণযোগ্য হইল না।

ব্রিটিশ প্রস্তাব ; রাপাকি প্রস্তাব

জার্মানির সমস্যা কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে এমন নহে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহর এই সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। পশ্চিম-জার্মানির তুলনায় পূর্ব-জার্মানির অর্থনৈতিক অপকর্ষতা স্বভাবতই পূর্ব-জার্মানির জনসাধারণকে পশ্চিম-জার্মানিতে চলিয়া যাইবার অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন নাৎসি জার্মানির প্রাধান্য লাভের কাল হইতে কমিউনিস্ট ও কমিউনিজমের প্রতি জার্মানদের যে ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পূর্ব-জার্মানির সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থার প্রতি বহুলোকের স্বাভাবিক অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এজন্য বার্লিন শহরের পশ্চিমাংশে পূর্ব-জার্মানি হইতে অনেকেই চলিয়া আসিতে লাগিলে রাশিয়া এক কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। যাহা হউক, অবশেষে সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ শহর বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু এই প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশ্চভ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব-বার্লিনের শাসনভার সরাসরি নিজ দায়িত্বে আর রাখিবেন না ; পূর্ব-বার্লিনকে পূর্ব-জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সমগ্র বার্লিন শহরকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ শহর

বার্লিন শহর-সংক্রান্ত সমস্যা

সোভিয়েত প্রস্তাব

হিসাবে স্থাপন করাই সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য এই কথাও ক্রুশ্চভ্ জানাইলেন। এবিষয় লইয়া পরবৎসর উভয়পক্ষের মন্ত্রিগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিল। কিন্তু পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ পশ্চিম-বার্লিনের শাসন অথবা নিরাপত্তা-ব্যবস্থা পূর্ববৎই রাখিতে চাহিলে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইল না। যাহা হউক, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা এবং পূর্ব-পশ্চিমী রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানকল্পে পৃথিবীর নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে এক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্বে মার্কিন বিমান $U_2$ সামরিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের ফটো লইবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করিলে রুশ সরকারের আদেশে উহাকে ভূপাতিত করা হইল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল প্রধানত উহার জন্যই শীর্ষ সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। শীর্ষ সম্মেলন ক্রুশ্চভ্-এর $U_2$ঘটনা-সংক্রান্ত আক্রমণাত্মক বক্তৃতার পরই ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে, বার্লিন সমস্যা বা জার্মানির সমস্যা পূর্ববৎই রহিয়া গিয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-জার্মানির অধিবাসীদের পশ্চিম-জার্মানিতে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিবার ফলে সাময়িকভাবে পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের রাষ্ট্রনায়কদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে উহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পুনরায় শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রয়োজন—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহা ভিন্ন নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চভ্‌কে অবহিত করিবার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত সরাসরি আলোচনায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইতে

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পাল্টা প্রস্তাব

শীর্ষ সম্মেলন —$U_2$ ঘটনা— শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা

ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার আশঙ্কা

নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

নেহরু ও হ্রুক্রামা রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণ ও ম্যালির প্রেসিডেণ্ট মোডিকো কিইতো কেনেডিকে ক্রুশ্চভের সহিত সরাসরি আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পৃথিবীর শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই চেষ্টার ফলে সাময়িকভাবে যে যুদ্ধের ছায়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা অপসৃত হইয়াছে। তথাপি আণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও জার্মানির ঐক্য প্রভৃতি সম্পর্কে এখনও নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতেছে। ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডি উভয়েই নীতিগতভাবে আণবিক নিরস্ত্রীকরণ, জার্মানির তথা বার্লিন সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষপাতী। তথাপি সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও অসহিষ্ণুতা এই দুই পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

**মধ্য-প্রাচ্য ( The Middle East ) :** মধ্য-প্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও উহার খনিজ তৈলসম্পদ উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থল হিসাবে মধ্য-প্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব যেমন অপরাপর বহু অঞ্চল অপেক্ষা অধিক তেমনি পৃথিবীর খনিজ তৈল-সম্পদের মোট ৪২ শতাংশের উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবেও উহার প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের লোলুপতা অত্যধিক। তদুপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগপথ হিসাবে সুয়েজ খালের সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই সকল কারণে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহ মধ্য-প্রাচ্যের দিকে চিরকাল স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ ও আরব জাতির মধ্যে ঐক্যস্পৃহা ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি বিদ্বেষভাব মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ঔপনিবেশিক অধিকার-মুক্ত মধ্য-প্রাচ্যের দেশ-সমূহে বর্তমানে যে জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে তাহার অন্যতম প্রকাশ ইওরোপীয় দেশসমূহের অর্থে গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

মধ্য-প্রাচ্যের গুরুত্ব

মধ্য-প্রাচ্যের রাজ-নৈতিক জটিলতার কারণ

সর্বোপরি, মধ্য-প্রাচ্যের অধিবাসিবৃন্দের দারিদ্র্য এবং আরব-ইহুদি বিবাদে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ইস্‌রায়েল-এর ইহুদিদের পক্ষ সমর্থন এই অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে তিন প্রকার পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইরাণ বা পারস্য এবং তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্র-প্রীতি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটে যোগদানের মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মিশর এবং মিশরের নেতৃত্বে অপরাপর আরব দেশ পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া এক নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক শান্তিকামী এবং আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নীতি অনুসরণে প্রয়াস পাইতেছে। আবার আলজিরিয়া এবং ইদানীং ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতাও পরিলক্ষিত হইতেছে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও পন্থা অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এবং প্রধানত খনিজ তৈলের উৎস হিসাবে মধ্য-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের পার্থক্য

**মিশর ( Egypt ) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের মিশরীয় ইতিহাসে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই জেনারেল নগুইব ও কর্ণেল নাসের-এর নেতৃত্বে মিশরের রাজা ফারুক-এর বিরুদ্ধে এক বিপ্লব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশরীয় সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মচারিবৃন্দের জাতীয়তাবোধ এবং রাজা ফারুক-এর জনকল্যাণ-সাধনে ঔদাসীন্য রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। নগুইব ও নাসের-এর সামরিক বিপ্লব জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নগুইবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া গামাল আবদুল নাসের মিশরের শাসনক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। মিশরীয়দের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনা করা-ই নাসের তাঁহার কর্মপন্থার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদিকে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে কমিউনিস্ট্-বিরোধী আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠনে তৎপর হইয়া উঠিল। প্রথমে ইরাক ও তুরস্ক নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইল ( ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ ), কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তায় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গের নিকট এই মৈত্রীচুক্তি উন্মুক্ত রাখা হইলে ব্রিটেন পাকিস্তান

ও ইরান এই চুক্তিতে যোগদান করিল। এই চুক্তি বাগদাদ চুক্তি (Bagdad Pact or CENTO ) নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও ইহার সহিত সর্বপ্রকার সংযোগ রক্ষা করিতে লাগিল। বাগদাদ চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিশরের স্বভাবতই ভীতির উদ্রেক হইলে এই সামরিক রাষ্ট্রজোটের সম্ভাব্য শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে মিশরের নেতা নাসের রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট্ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিলেন। এদিকে নাসের মিশরের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। কিন্তু মার্কিন সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আকস্মিকভাবে সেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলে নাসের স্যুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি ( Suez Canal Company )-তে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যাবতীয় অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া উহার জাতীয়করণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে এই বিরাট ক্ষতি স্বীকার করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই এই দুই দেশের সরকার সামরিক সাহায্যে স্যুয়েজ খালের উপর দাবি কার্যকরী করিতে চাহিলেন। ইস্‌রায়েল গোপনে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়কে সাহায্যদান করিতে স্বীকৃত হইল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের সামরিক উপায়ে স্যুয়েজ কোম্পানির ব্যাপারটির সমাধানের বিরোধিতা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইঙ্গ-ফরাসী ও ইস্‌রায়েলী সৈন্য মিশর আক্রমণ করিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়া হইল। তদুপরি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর স্যুয়েজ আক্রমণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার প্রভাবও ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের পক্ষে এড়ান সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স

বাগদাদ চুক্তি ( বর্তমান CENTO )

ইঙ্গ-ফরাসী-মিশরীয় মনোমালিন্য

অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণে মার্কিন সাহায্যের আশা ভঙ্গ

স্যুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির জাতীয়-করণ

ইঙ্গ-ফরাসী-ইস্‌রায়েলী আক্রমণ

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ ও জনমতের চাপ—যুদ্ধ-বিরতি

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই অসাফল্য যেমন ব্রিটিশ ও ফরাসী কূটনৈতিক নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহা এই দুই রাষ্ট্রের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। পক্ষান্তরে নাসের-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং মিশরীয়দের জাতীয় জীবনের ঐক্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল আরব জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি এবং United Arab Republic-এর স্থাপনে পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে ব্রিটেন এই চরম বিপর্যয়ের পরও মিশরের সহিত পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমানে অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণ এবং আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য মিশর রাশিয়া, পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (International Monetary Fund) হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিতেছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সিরিয়ায় এক সামরিক বিপ্লব দেখা দিয়াছে। ইহা সাময়িকভাবে United Arab Republic-এর শক্তি ও প্রাধান্য কতক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। নাসের-এর সমর্থকবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

আরব জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি

সিরিয়ার বিপ্লব (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬১)

**ইরাণ বা পারস্য (Iran or Persia):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইরাণীয় সরকারের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সমস্যাই ছিল ইরাণীয় খনিজ তৈল-সম্পদের উপর বিদেশীয় অধিকারের বিলোপ সাধন। ইরাণীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস-ই ছিল খনিজ তৈল। অথচ এই মূল্যবান সম্পদের উৎপাদন-কার্য মার্কিন ও ইওরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। স্বভাবতই ইরাণীয়দের মনে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির অন্যতম প্রকাশ হিসাবে এই জাতীয় সম্পদকে বৈদেশিক অধিকার মুক্ত করিবার চেষ্টা শুরু হইল। সোভিয়েত ইউনিয়নও ইরাণের খনিজ তৈলের অংশ লাভের উদ্দেশ্যে ইরাণীয় সরকারের সহিত একটি তৈল-চুক্তি (Oil Agreement) স্বাক্ষরের প্রস্তাব করিল। কিন্তু এই প্রস্তাব ইরাণীয় জাতীয় সভা 'মজ্‌লিস্' কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ইরাণীয়দের বৈদেশিক শোষণ রোধ করিবার সংকল্প শুধু প্রস্তাবিত রুশ-

ইরাণীয়দের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ—তৈল সম্পদকে বৈদেশিক শোষণ মুক্ত করিবার চেষ্টা

ইরাণীয় তৈল-চুক্তি প্রত্যাখ্যানেই পরিলক্ষিত হইল না, এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির (Anglo-Iranian Oil Company=AIOC) বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হইল। AIOC-এর অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও যে যথেষ্ট ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়াই ইরাণীয়দের পক্ষে AIOC-র বিলোপসাধন প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক টন খনিজ তৈলের জন্য AIOC ইরাণীয় সরকারকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিত। সেই সময়ে খনিজ তৈল মাত্রেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ইরাণীয় সরকার AIOC-র সহিত আলাপ-আলোচনার পর প্রতি টন তৈলের উপর প্রাপ্য রাজস্বের (royalty) পরিমাণ পূর্বাপেক্ষ দ্বিগুণ করিলেন। AIOC-র সহিত একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু ইরাণীয় জাতীয় সভা মজ্‌লিস্-এ বিরোধী-দলের নেতা মোসাদ্দেক-এর নেতৃত্বে এই নূতন চুক্তির তীব্র বিরোধিতা শুরু হইলে এই ব্যাপার অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইরাণীয়গণ মোসাদ্দেককে তাহাদের প্রকৃত নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মোসাদ্দেক ইরাণের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ইরাণীয় মজ্‌লিস্ AIOC-র জাতীয়করণ করিলেন এবং একটি জাতীয় তৈল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া স্বভাবতই ব্রিটেনের সহিত ইরাণীয় সরকারের বিরোধিতার সৃষ্টি হইল। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইরাণীয় সরকার কর্তৃক AIOC-র জাতীয়করণের বৈধতার প্রশ্ন উথাপন করিল, কিন্তু তাহাতে ইরাণীয় সরকারের সংকল্পের কোন পরিবর্তন হইল না। ইরাণীয় সরকার AIOC-র যাবতীয় কারখানা দখল করিবেন বলিয়া AIOC-র কর্মকর্তাদের জানাইলেন। ব্রিটেন ইরাণীয় সরকারকে বাধাদান করিবার কথা বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করিলে এবং বলপ্রয়োগের ফলে ইরাণ সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, একথা ব্রিটেনকে বুঝাইয়া বলিলে শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ দ্বারা AIOC-র জাতীয়করণে বাধাদান করা হইল না। বাধ্য হইয়া AIOC-র কর্তৃপক্ষ

এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির জাতীয়করণ

ইঙ্গ-ইরাণীয় সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি

তৈল-খনির প্রধান কেন্দ্র আবাদান ত্যাগ করিয়া গেলেন। (অক্টোবর, ১৯৫১)। এই সময় হইতে ইঙ্গ-ইরাণীয় সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, এই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হইল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাণে যাহাতে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইরাণকে প্রচুর পরিমাণ অর্থসাহায্য দান করিতে লাগিল (১৯৫২)। ইহা ভিন্ন ব্রিটেনকেও এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির জাতীয়করণের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইল। বলা বাহুল্য সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ ইরাণে সোভিয়েত রাশিয়ার কোনপ্রকার প্রভাব বা স্বার্থ যাহাতে বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেজন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরি-উক্ত নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইরাণীয় সরকারের পক্ষে তৈল উত্তোলন ও পরিস্রবণের কাজ পরিচালনা করা সহজ হইল না। ফলে, তৈল উৎপাদনের পরিমাণ যেমন হ্রাস পাইতে লাগিল তেমনি দেশের আর্থিক অবস্থারও অবনতি দেখা দিল। এমতাবস্থায় ইরাণে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হইলে জেনারেল জাহেদী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। মোসাদ্দেককে কারারুদ্ধ করা হইল। নবগঠিত ইরাণীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে মার্কিন সরকার ৪৫ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য দান করিলেন এবং তৈলখনির কাজ পূর্ণ মাত্রায় চালাইবার জন্য বিশেষজ্ঞ ও কারিগর ইরাণে প্রেরণ করিলেন। ইরাণীয় তৈল বিক্রয় সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী-ওলন্দাজদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ২৫ বৎসরের জন্য ইরাণীয় সরকারের সহিত এক তৈল-চুক্তি (Oil Agreement) স্বাক্ষরিত হইল (১৯৫৪)। এই চুক্তি ২৫ বৎসরের পর পাঁচ বৎসর করিয়া আরও তিন দফায় ১৫ বৎসর কাল চালু থাকিবে একথাও স্থির হইল। ইহার শর্তানুসারে AIOC-কে অর্থাৎ ব্রিটিশ বণিকদের ২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দানে ইরাণীয় সরকার সম্মত হইলেন। ইরাণের জাতীয় তৈল কোম্পানির উৎপন্ন তৈল ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও ওলন্দাজদের লইয়া গঠিত একটি

মার্কিন সাহায্য-সহায়তা

ইরাণে সামরিক বিপ্লব

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক নীতি অনুসরণ—ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন-ওলন্দাজ—তৈল-বিক্রয় সংস্থা গঠন

বিক্রয় সংস্থা কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। এই তৈল হইতে লব্ধ মোট লাভের ৫০ শতাংশ ইরাণীয় তৈল কোম্পানি এবং অপর ৫০ শতাংশ বিক্রয় সংস্থার সদস্যগণ পাইবে স্থির হইল। এইভাবে ইরাণে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা কতকটা হ্রাস পাইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইরাণ বাগদাদ চুক্তির সদস্যভুক্তি ইহার প্রমণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাগদাদ চুক্তি বর্তমানে Central Treaty Organisation (CENTO) নামে পরিচিত। ইরাণীয় সরকারের পশ্চিমী ব্লক বা রাষ্ট্র-জোটের প্রতি অনুরাগ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইরাণীয়-মার্কিন পরস্পর আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্ দেশ রাশিয়ার প্রতি ইরাণের চিরাচরিত ভীতিও ইরাণীয় পররাষ্ট্র সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্পন্থী 'টুডে পার্টি' (Tudeh Party)-কে অবৈধ ঘোষণা করিবার মধ্যে ইরাণের কমিউনিজম্-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়।

ইরাণের সহিত বিক্রয়-সংস্থার তৈল-চুক্তি

ইরাণের বাগদাদ চুক্তিতে (বর্তমান CENTO) যোগদান

ইরাণের কমিউনিজম্-বিরোধিতা

**প্যালেস্টাইন (Palestine):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানের দিকে কতক অগ্রসর হইয়াছিল এবং বৎসরে মোট দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিবে না এই শর্তও গৃহীত হইয়াছিল (২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব হইল না। এদিকে আরব জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের মধ্যে সংগ্রামশীলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, এই দুই বিবদমান জাতির পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরব-ইহুদি সমস্যাও সেজন্য জটিলতর হইয়া পড়িল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইওরোপে বাস্তুহীন ইহুদিদের এক বিরাট সংখ্যা প্যালেস্টাইনে আশ্রয় লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় এক ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি (Anglo-American Committee) আরব-ইহুদি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে আরব-ইহুদি সমস্যার জটিলতা

সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দেশের জন্য নিযুক্ত হইল। এই কমিটি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিল। এই রিপোর্ট বা সুপারিশের প্রধান কথা-ই ছিল প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া। আরবদিগকে ইহুদিদের উপর বা ইহুদিগণকে আরবদের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য দান করা হইবে না, ইস্‌লাম, খ্রীষ্টীয় বা ইহুদি কোন জাতি বা ধর্মের লোকের স্বার্থ কোনভাবে বিনাশ করা হইবে না এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর তত্ত্বাবধানে আরব-ইহুদি বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার পূর্বাবধি প্যালেস্টাইন ম্যাণ্ডেট্‌ হিসাবেই পরিচালিত হইবে—এই সকল সুপারিশ ইঙ্গ-মার্কিন কমিটির রিপোর্টে করা হইয়াছিল। এই রিপোর্টে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 'শ্বেতপত্রে' (White-Paper) আরব-ইহুদি সমস্যার সমাধানের যে নীতি বিশ্লেষিত হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া ইহুদিদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে, এই কারণে আরবদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। তাহারা ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেড্‌-এর অবসান এবং প্যালেস্টাইন হইতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবি করিল। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন সরকার উচ্চতর পর্যায়ের একটি দ্বিতীয় ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন (Anglo-American Commission) নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশন প্যালেস্টাইনে ইহুদি ও আরব অঞ্চল লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের এবং ইহুদি ও আরব অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারদানের সুপারিশ করিল। ইহা ভিন্ন প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রবেশ আরব-ইহুদিদের সম্মতির উপর নির্ভরশীল হইবে, এই নীতি গ্রহণেরও সুপারিশ করিল। এই সকল সুপারিশ কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদিদের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন লণ্ডন শহরে আহ্বান করিলেন। কিন্তু এদিকে অসংখ্য ইহুদি গোপনে গোপনে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার এমতাবস্থায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্টের পর যে-সকল ইহুদি প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে সাময়িকভাবে সাইপ্রাস

(১) 'ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি'র সুপারিশ

(২) 'ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনের' সুপারিশ

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এর অসাফল্য

দ্বীপে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে ইহুদিগণ (Zionists) উহার তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। আরবগণ পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ও ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান দাবি করিতেছিল। এমতাবস্থায় আরব বা ইহুদি কোন দলই লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এ যোগদান করিল না। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ইহুদি এবং আরব উভয় পক্ষেরই সমর্থন হারাইলে ইহুদি সন্ত্রাসবাদিগণ প্যালেস্টাইনে কর্মরত ব্রিটিশ কর্মচারীদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইহুদি-আরব সংঘর্ষের ফলে প্যালেস্টাইনে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ইহুদি-আরব সমস্যার কোন সমাধান করিতে অসমর্থ ব্রিটিশ সরকার ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর নিকট এবিষয়ে মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক নিযুক্ত এক বিশেষ কমিটি (Special Committee) প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়া ইহুদি-আরব সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন। এই কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিও ছিলেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদ-ই একমাত্র পন্থা বলিয়া জানাইলেন। ভারত ও অপর কয়েকটি দেশের সদস্যগণ—যাঁহারা সংখ্যালঘু ছিলেন—তাঁহাদের সুপারিশ ছিল প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদি অঞ্চলের একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কিন্ত তখনকার পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ ভিন্ন এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ইহুদি বা আরবদের কেহই এই সিদ্ধান্তানুসারে প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদে সম্মত ছিল না। অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখ হইতে প্যালেস্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে প্যালেস্টাইন সমস্যার মীমাংসার উপায় খুঁজিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের

ইহুদি-আরব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের সুপারিশ

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্যালেস্টাইন ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগের সংকল্প

ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি বা জিওনিস্ট (Zionist) নেতৃবর্গ ইস্রায়েলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই রাষ্ট্রের সীমা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির সুপারিশে যে রাজ্যাংশ ইহুদি অঞ্চলাধীন রাখিবার কথা বলা হইয়াছিল ঠিক সেই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ইস্রায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান উহাকে স্বীকৃতি দান করিলেন। ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অপরাপর রাষ্ট্র ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইলে প্যালেস্টাইন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অনুগত মিত্র দেশ তুরস্ক ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইল, ইরাণ প্রথমে ইহার ঘোর বিরোধী ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও অন্তত কার্যকরীভাবে ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করিল।* আরব-রাষ্ট্রবর্গ অবশ্য ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল না, উপরন্তু প্যালেস্টাইনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল। কিন্তু এই যুদ্ধে আরব-রাষ্ট্রবর্গ ক্রমেই পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে এই যুদ্ধের বিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে ( ১৯৪৯ ) প্যালেস্টাইনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। মধ্য এবং পূর্বাংশ এবং গাজা ভূখণ্ড (Gaza strip) আরবদের অধিকারে রহিল।

(১৪ই মে, ১৯৪৮) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্যালেস্টাইন ত্যাগ—ইস্রায়েল-এর স্বাধীনতা ঘোষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান

ইস্রায়েল রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং উন্নয়নের পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায়ই গৃহীত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে ইস্রায়েলী নেতৃবৃন্দ ইস্রায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে বিশাল পরিমাণ অর্থ

ইস্রায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

* Vide Lenczowski : *The Middle East and the World Affairs*, 345ff.

সাহায্য দান করিয়া এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্রায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Point Four Agreement অনুযায়ী নানাপ্রকার সাহায্যদান করিয়া উহার উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ-ইহুদি সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ইহুদি সন্ত্রাসবাদীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বহু ব্রিটিশ পরিবারকে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিতে হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগও ইহুদি-ব্রিটিশ সম্পর্কের তিক্ততারই ফল বিশেষ। আরব ও ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য নেগো অঞ্চল আরবদের দিবার প্রস্তাব ব্রিটেন সমর্থন করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইস্রায়েল-এর ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটেনের ঔদাসীন্য প্রভৃতি ব্রিটেন-ইস্রায়েল সম্পর্কের তিক্ততার পরিচায়ক। কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন ইস্রায়েল কর্তৃক ইঙ্গ-ফরাসী সরকারকে সাহায্যদানের মধ্যে ইস্রায়েল-এর পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পুনরুজ্জীবিত অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইস্রায়েল-ব্রিটিশ সম্পর্ক

রাশিয়ার নিকট ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঋণ প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য হইবার পূর্বাবধি ইস্রায়েল নিরপেক্ষ নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল বটে কিন্তু ঋণলাভে অসমর্থ হইবার পর ইস্রায়েল-এর পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রুশ-ইস্রায়েল সম্পর্ক

ইস্রায়েলও আরব-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ( ১৯৪৯ ) স্বাক্ষরিত হইলেও পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহুদি-আরব সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। পরস্পর পরস্পরের রাষ্ট্রসীমা লঙ্ঘন বা রাষ্ট্রসীমায় হানা দেওয়া ইহুদি-আরব সম্পর্কের এক অপরিহার্য নীতিতে পরিণত হইয়াছে। আরব-রাষ্ট্রবর্গ ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এযাবৎ স্বীকার করে নাই। ফলে, ইহুদি-আরব দ্বন্দ্বের সাময়িক বিরতি ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে, এই দুই জাতির মধ্যে শান্তিস্থাপন সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়।

ইহুদি-আরব সমস্যা

**তুরস্ক ( Turkey ) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে

তুরস্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে lend-lease নীতি অনুসারে বহু অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষ তাহাদের সাহায্যার্থে তুরস্ককে যুদ্ধে নামাইবার জন্য চাপ দিতে থাকিলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্ক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। Lenczowski-র মতে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ স্থানলাভের আশায় তুরস্ক শেষমুহূর্তে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। যাহা হউক, তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্কের অন্যতম প্রধান নীতিই ছিল রুশ-ভীতি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আনুগত্য। রাশিয়া কর্তৃক বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজ্‌-এর মধ্য দিয়া অবাধভাবে যাতায়াতের দাবি তুরস্কের ভয়ের কারণ ছিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ফ্রান্স তুরস্কের বিমানঘাঁটি হইতে রাশিয়ার বাকু অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপের জন্য তুরস্কের অনুমতিলাভ করিয়াছিল এই তথ্য রাশিয়ার নিকট অবিদিত ছিল না। ফলে, রুশ-তুর্কী সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাশিয়ার প্রত্যক্ষ শত্রুতার আশঙ্কায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তুরস্ক সরকার বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজ্‌ জলপথ রাশিয়ার জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হইলেও রুশ-তুর্কী সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটিল না। ঐ বৎসরই রাশিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত রুশ-তুর্কী মৈত্রী চুক্তির পরিবর্তন দাবি করিল। এই পরিবর্তনের শর্তাদির মধ্যে রাশিয়া কার্‌স্‌, আর্দাহান নামক স্থানদ্বয়, বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজের সন্নিকটে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার, মণ্টরিও চুক্তি (Montreux Convention) পরিবর্তন, বুলগেরিয়ার স্বপক্ষে থ্রেসের রাজ্যসীমা পরিবর্তন দাবি করিল। কিন্তু তুরস্ক রাশিয়ার চাপ সত্ত্বেও রুশ দাবিসমূহ মানিয়া লইতে রাজী হইল না। ফলে, রুশ-তুর্কী সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিক্ততা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। সেই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' অনুসারে সোভিয়েত আক্রমণের ভীতি হইতে গ্রীস ও তুরস্ককে রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরক্ত তুরস্ক

রুশ-তুর্কী বিদ্বেষ

তুরস্কের উপর রুশ দাবি

রুশ-তুর্কী সম্পর্কের অবনতি—রুশ আক্রমণের আশঙ্কা

ও আর্থিক সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-পুষ্ট তুরস্ক বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজ্‌ অঞ্চলে রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার স্বীকার করিতে রাজী নহে এই ঘোষণা করিল।

ট্রুম্যান ডকট্রিন

রুশ-তুর্কী তিক্ততার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ-ই মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত তুরস্কের মিত্রতা বৃদ্ধি পাইল। তুরস্কের NATO, বাগদাদ চুক্তি তথা CENTO-তে যোগদান তুরস্ক ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মিত্রতার যেমন পরিচায়ক তেমনি রুশ-তুর্কী তিক্ততার নির্দেশক। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডেরিস গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারে পরিণত করিতেছেন, এই কারণে সামরিক কর্মচারী কেমাল গুরসেল তুরস্কে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। মেণ্ডেরিস ও তাঁহার সহকর্মীদের অনেককে ইদানীং বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তুরস্কের নূতন সরকার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পূর্ব-অনুসৃত নীতির কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ব-নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধতা ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।

তুরস্কের NATO, CENTO প্রভৃতিতে যোগদান

তুরস্কের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

**ইরাক (Iraq):** ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের পর হইতে ইরাকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের উত্থান পরিলক্ষিত হয়। এই দুইয়ের একটি ব্রিটিশ সরকারের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী এবং অপরটি ছিল ব্রিটিশের সহিত মৈত্রীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দলাদলি যখন চলিতেছিল সেই সময়ে বেকর সিদ্‌কি নামে ইরাকী সমর অধিনায়ক বলপূর্বক ইয়াসিন-এল-হাসিমীর মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া বেকর সিদ্‌কির সুহৃদ হিক্‌মৎ সুলেমানকে প্রধানমন্ত্রী-পদে স্থাপন করিলেন (১৯৩৬)। বস্তুত, হিক্‌মৎ সুলেমানের মন্ত্রিসভা বেকর সিদ্‌কির সম্পূর্ণ নির্দেশাধীন ছিল। কিন্তু শীঘ্রই বেকর-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হইতে লাগিল। বেকর ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন না বলিয়া ব্রিটিশ সরকার

ব্রিটিশ-বিরোধী ও ব্রিটিশ-সমর্থক পরস্পর-বিরোধী দল

বেকর সিদ্‌কির সামরিক শক্তি প্রয়োগে শাসনক্ষমতা হস্তগতকরণ

তাঁহার নির্দেশাধীন ইরাকী সরকারের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া ক্রমবর্ধমান জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার বেক্‌র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দান করিলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরই বেক্‌র আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিক্‌মৎ সুলেমানের মন্ত্রিসভারও পতন ঘটিল। ইহার পর জামিল মাদফাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বেক্‌র-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী বলপূর্বক ইয়াসিন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া এবং হিক্‌মৎ সুলেমানের মন্ত্রিসভার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া স্বভাবতই ক্ষমতালোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী নেতার চেষ্টায় জামিল মাদফাই-এর স্থলে নুরি-এস্‌-সৈদ প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। নুরি-এস্‌-সৈদ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অত্যধিক মিত্রভাবাপন্ন। এজন্য অপর একদল নুরি-এস্‌-সৈদকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা শুরু করিল। এমন সময় (১৯৩৯) ইরাকী রাজা গাজী এক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইলে ইরাকীদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইল। জার্মানি ও ইতালির ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যও অবশ্য এজন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল। যাহা হউক, গাজীর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় ফৈসল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নুরি-এস্‌-সৈদ প্রধানমন্ত্রিপদে আসীন রহিলেন। ঐ বৎসরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ব্রিটিশ ও ইরাকী সরকারের মিত্রতা চুক্তির শর্তানুসারে নুরি-এস্‌-সৈদ জার্মানির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। কিন্তু পরবৎসরই (১৯৪০) রসিদ আলি নামে জনৈক ব্রিটিশ-বিরোধী জননেতা ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে কতকটা নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে অক্ষ-শক্তিবর্গের হস্তে ব্রিটেনের পরাজয় ইরাকীদের মধ্যে অধিকতর ব্রিটিশ বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। কিন্তু ইরাকী রাজনীতিক্ষেত্রের চরম অব্যবস্থা এবং ইরাকীদের অব্যবস্থিত চিত্ততার ফলে রসিদ আলি পদচ্যুত হইলেন।

হিক্‌মৎ সুলেমানের প্রধানমন্ত্রিত্ব

ব্রিটিশের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন নুরি-এস্‌-সৈদ-এর মন্ত্রিত্ব

গাজীর মৃত্যু—দ্বিতীয় ফৈসলের সিংহাসন লাভ

ইরাকবাসীদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ

কিন্তু তিনি সামরিক সহায়তায় পুনরায় বলপূর্বক প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রসিদ আলি ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তির শর্তাদি মানিয়া চলিবেন, একথা বলা সত্ত্বেও ব্রিটেন রসিদ আলিকে প্রধানমন্ত্রিপদ হইতে সরাইতে দৃঢ়সংকল্প করিল। ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটেন একদল সৈন্য বস্‌রা নামক স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফা সৈন্য বস্‌রায় উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকী সৈন্য ও ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। রসিদ আলি বহু চেষ্টায়ও জার্মানির নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইলেন না, কারণ সেই সময়ে হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাহা হউক, কয়েকখানি জার্মান যুদ্ধ-বিমান ইরাকের মসুল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সাময়িকভাবে মসুল জার্মানির অধিকারে চলিয়া গেল। কিন্তু ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্দান হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়া রসিদ আলির সেনাবাহিনীকে ফলুজার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। রসিদ আলি দেশ হইতে পলাইয়া গিয়া জার্মানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন জামিল মাদফাই হইলেন প্রধানমন্ত্রী। অল্পকালের মধ্যে নুরি-এস্‌-সৈদ জামিল মাদফাইর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তিনি এইবার ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পদত্যাগের পর ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পদে পর পর কয়েকজন নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী তোফিক ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির পরিবর্তন করিয়া ব্রিটিশ প্রভাবের পূর্ণ অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। এদিকে বাগদাদে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাস হইতে কমিউনিজম্‌ প্রচারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইরাক সরকার এবিষয়ে অবহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ইরাকের বিপদ আসিতে পারে উপলব্ধি করিয়া ব্রিটেনের সহিত নূতন মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৯৪৮)। এই চুক্তির শর্তানুসারে যুদ্ধকালে ব্রিটেন ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করিল। ইরাকে ব্রিটিশ বিমান-ঘাঁটিগুলি ইরাক সরকারকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সেগুলিতে

জার্মানির সাহায্য লাভ

ব্রিটেন-ইরাক যুদ্ধ

ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির অবসান দাবি

নূতন ইঙ্গ-ইরাক মিত্রতা চুক্তি

ব্রিটিশ বিমান অবতরণে কোন বাধা রহিল না। ব্রিটেন ইরাকের সেনাবাহিনীকে সমর উপকরণে সজ্জিত করিবার ও আধুনিক যুদ্ধ শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদি সমস্যার সমাধানকল্পে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধা-ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ গৃহীত হইলে ইরাকে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও মারামারি শুরু হইল। এমতাবস্থায় ইরাক সরকার ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি (১৯৪৮) অনুমোদন করিতে সাহস পাইলেন না। এদিকে ইরাণে এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির জাতীয়করণের দৃষ্টান্ত ইরাকীদের মধ্যে Iraq Petroleum Company-র জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিল। ফলে, ইরাক সরকার Iraq Petroleum Company-কে নূতন শর্তে আবদ্ধ হইতে এবং ইরাককে আরও উচ্চহারে রাজস্বদানে বাধ্য করিলেন।

জনসাধারণ কর্তৃক চুক্তির বিরোধিতা

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইরাক রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছিল। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, কমিউনিস্ট্‌দের প্রচারকার্য ও অনুপ্রবেশ, ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের প্রতি বিরোধিতা সব কিছু ইরাকে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এদিকে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব যাহাতে মধ্য-প্রাচ্যে বিস্তারলাভ না করিতে পারে সেজন্য 'বাগদাদ চুক্তি' (বর্তমান Central Treaty Organisation = CENTO) নামে এক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করিল। ইরাক হইল ইহার অন্যতম প্রধান সদস্য।

কমিউনিস্ট ভীতি ও কমিউনিস্ট্ অনুপ্রবেশ

ফলে, মার্কিন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও আর্থিক সাহায্য ইরাক পাইল। এই সময়কার ইরাক সরকারের নীতি ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিয়া কমিউনিস্ট্ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা লাভ করা এবং একমাত্র ব্রিটেনের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবার নীতি পরিত্যাগ করা। মিশর পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি এবং বিশেষভাবে কোন সামরিক শক্তিজোটে যোগদান না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। ইরাককে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করান যায় কিনা সে বিষয়ে মিশর খুবই তৎপর ছিল, কিন্তু ইরাক এবিষয়ে অবিচলিত রহিল। আরব লীগের মাধ্যমে ইরাকের উপর চাপ দিয়াও কোন ফল হইল না।

বাগদাদ চুক্তি

ইরাক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরক্ত তুরস্কের সহিত বিশেষভাবে মিত্রতায় আবদ্ধ হইল (১৯৫৫)। এইভাবে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটেন এই চুক্তিতে যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রত্যক্ষ সদস্য না হইলেও সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে সাহায্য-সহায়তা দানে কার্পণ্য করে নাই।

ইংলণ্ড কর্তৃক বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের সামরিক কর্মচারিবৃন্দ ব্রিগেডিয়ার আব্দুল করিম কাসেম-এর নেতৃত্ব, শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিয়া ইরাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে অপসরণ করিল (১৯৫৯, মার্চ)। এই পরিবর্তনের ফল হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে সামরিক সরঞ্জাম, অর্থ প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। এইভাবে কাসেমের নেতৃত্বে ইরাক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইদানীং অবশ্য ইরাক ও ব্রিটেনের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

আব্দুল কাসেম কর্তৃক সামরিক শক্তিবলে শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ

**সউদি আরব (Saudi Arab)ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সউদি আরবের ইব্‌ন্ সউদ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন তথাপি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গই জয়ী হইবে। তাঁহার মন্ত্রীদের অনেকেই অবশ্য অক্ষশক্তিবর্গ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে এই ধারণা পোষণ করিতেন। যাহা হউক, নিরপেক্ষ থাকিলেও ইব্‌ন্ সউদ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু থাকা অবস্থায়-ই মার্কিন-সউদি আরব সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিলে সউদি আরবের ইতিহাসে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। মার্কিন তৈল কোম্পানি সউদি আরবে খনিজ তৈল উত্তোলন কার্য যুদ্ধকালীন নানাপ্রকার অসুবিধা হেতু বাধা প্রাপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধে যোগদান করে নাই। অক্ষশক্তিবর্গের প্রাথমিক সাফল্যে ব্রিটেন তখন এক দারুণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। এমতাবস্থায়ও ইব্‌ন্ সউদ ইঙ্গ-মার্কিন

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার

সরকারের কোনপ্রকার বিরোধিতা না করিয়া যুদ্ধ হেতু আর্থিক অবস্থার অবনতি এবং মার্কিন তৈল কোম্পানি হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস হেতু আর্থিক অনটন হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের নিকট ৩০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ব্রিটেন ও আমেরিকা সউদি আরবকে অর্থ সাহায্য দান করিয়া আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Lend Lease পরিকল্পনা অনুযায়ী সউদি আরবকে আরও অর্থ-সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিল। এইরূপ অর্থসাহায্য গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সউদি আরবের নিরপেক্ষতার নীতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল। সেই সময়ে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সুবিধার্থ মধ্য-প্রাচ্যে আরও একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। ইরাণের আবাদান নামক স্থানে একটি বিমানঘাঁটি ছিল বটে, কিন্তু মধ্য-প্রাচ্য ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক গোপনীয়তা সহকারে সউদি আরবের সঙ্গে ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার সম্বলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বাহ্যত নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিলেও ইব্‌ন্ সউদ গোপনে ইঙ্গ-মার্কিন, বিশেষভাবে মার্কিন সরকারকে এইভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। দাহরান নামক স্থানে একটি প্রথম পর্যায়ের মার্কিন বিমানঘাঁটি নির্মিত হইল। সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মিত্রতা ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স হইতে ফিরিবার পথে গ্রেট বিটার লেক (Great Bitter Lake)-এ একটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে ইব্‌ন্ সউদের সহিত সৌহার্দ্যসূচক আলাপ-আলোচনা করিলেন। এই মিত্রতার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ইব্‌ন্ সউদ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অধিবেশনে সউদি আরবের প্রতিনিধি স্বভাবতই যথাযোগ্য আসন লাভ করিলেন।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমানঘাঁটি নির্মাণের অধিকার দান : গোপনে নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ইব্‌ন্ সউদের সাক্ষাৎকার

সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রতা কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই প্রসারিত হইল। মার্কিন সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিয়া মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে ইব্‌ন্‌ সউদকে নির্ভরশীল মিত্র হিসাবে লাভ করিলেন। কিন্তু ইহুদি-আরব সমস্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের পক্ষ অবলম্বন এই সৌহার্দ্য সাময়িক কালের জন্য কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। ইহার ফলে সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্ক অবশ্য তেমন তিক্ত হয় নাই। যাহা হউক, ইব্‌ন্‌ সউদের পুত্র যুবরাজ আমীর সউদের যুক্তরাষ্ট্র সফর (১৯৪৬), মার্কিন কারিগরদের তৎপরতায় সউদি আরবের খনিজ তৈল উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৪৯-৫০), মার্কিন সাহায্যে সউদি আরবের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি ও সামরিক শিক্ষালাভ প্রভৃতি এই দুই দেশের সৌহার্দ্যের পরিচায়ক।

ইহুদি-আরব সমস্যা : সউদি আরব-মার্কিন সম্পর্কের সাময়িক অবনতি

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্‌ সউদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সউদ ইব্‌ন্‌ আব্দুল আজিজ সউদি আরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আমলে সউদি আরবের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান সূত্র হইল সউদি আরবের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা এবং আরব তথা ইস্‌লামীয় জগতে সউদি আরবের নেতৃত্ব স্থাপন করা। সউদের আমলে স্বভাবতই পররাষ্ট্র সম্পর্কের এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। সউদি আরব মিশরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল, সউদ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলেন এবং ইহুদি-আরব সমস্যায় আরবদের স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সর্বোপরি সউদের অধীনে সউদি আরব বাগদাদ চুক্তির অন্যতম প্রধান শত্রু হইয়া উঠিলেন। বুরাইমি মরু-উদ্যান ও মাস্কট-ওমান প্রভৃতি স্থানের অধিকার লইয়া সউদি আরব ও ব্রিটেনের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইল। ব্রিটেনের বাগদাদ চুক্তি সমর্থন, ইরাক ও জর্দানে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি ব্রিটেন ও সউদি আরবের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করিয়া তুলিল। সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও কতক পরিমাণে তিক্ততা দেখা দিল বটে, কিন্তু ব্রিটেনের

সউদ ইব্‌ন্‌ আব্দুল আজিজের সিংহাসনারোহণ

ব্রিটেনের সহিত মনোমালিন্য

সহিত সম্পর্কে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এইভাবে সউদের অধীনে সউদি আরবের পশ্চিমী-রাষ্ট্র-প্রীতি হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া এক নিরপেক্ষ, স্বাধীন আরব জাতির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন পররাষ্ট্র নীতি অনুসৃত হইতেছে।

নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র এবং আরব স্বার্থকামী পররাষ্ট্র-নীতি

**ইয়েমেন (Yemen):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এক দশকের মধ্যে ইয়েমেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুইটি বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। অবশ্য এগুলির ফলে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা তেমন ব্যাপক ছিল না। রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা এই দুই বিদ্রোহের ফলে ক্ষমতাচ্যুত না হইলেও ইয়েমেনের জনসাধারণ যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফলে, রক্ষণশীল শাসকবর্গ কতক কতক উদার-নৈতিক সংস্কার, কারিগরি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়েমেনের পররাষ্ট্র সম্পর্কের প্রধান নীতিই হইল নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলা। ব্রিটেনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবও ইয়েমেনের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম সূত্র। ইয়েমেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া উভয় দেশের সহিত মিত্রতামূলক সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা—ব্রিটেনের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব, মার্কিন ও সোভিয়েত দেশের সহিত সৌহার্দ্য

**সিরিয়া ও লেবানন (Syria and Lebanon):** ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী সরকার (Free French Govt.) সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেও ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য এই দুই দেশে মোতায়েন রহিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সিরিয়া ও লেবাননের স্বীকৃতিলাভে অবশ্য আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব হইল। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পরবৎসর সিরিয়া ও লেবানন আরব লীগে যোগদান করিল (২২শে মার্চ, ১৯৪৫)। ঐ বৎসরই ইয়াল্টা কনফারেন্স-এর সিদ্ধান্তানুসারে সিরিয়া ও লেবানন জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে উহার পুরস্কারস্বরূপই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-

ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যের অবস্থান সিরিয়া-লেবাননের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী

এর সানফ্রান্সিস্‌কো কন্‌ফারেন্সে এই দুই দেশের প্রতিনিধি যথাযোগ্য আসন লাভ করিলেন। এইভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হইলেও বিদেশী সৈন্যের অপসারণের সমস্যা সিরিয়া-লেবাননের এক দারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার ক্রমপর্যায়ে তাঁহাদের সৈন্য অপসারণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলে সিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন (১৯৪৬)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ সৈন্য অপসারণে রাজী হইলেন। ঐ বৎসরের-ই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন হইতে অপসারিত হইল। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতেই সিরিয়া ও লেবানন প্রকৃত সার্বভৌমত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিল বলা চলে।

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট অভিযোগ

ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য অপসারণ—সিরিয়া ও লেবাননের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব লাভ

**লেবানন (Lebanon):** লেবাননের পররাষ্ট্র সম্পর্কে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নীতি হইল পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ লেবাননের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সহায়ক হইয়াছে বলা বাহুল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সউদি আরব হইতে তৈলবাহী পাইপ লাইন লেবাননের সইদা বা সিদন পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছে। ফলে লেবাননের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের পরস্পর মিত্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের প্রতি লেবাননের বিদ্বেষভাব নানাবিধ আর্থিক লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি লেবাননের পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা নীতি মোটামুটিভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি লেবাননের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক না হইলেও

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ—বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সৌহার্দ্য

ফ্রান্সের প্রতি বিদ্বেষ ভাব

রুশ-লেবানন কূটনৈতিক সম্পর্কে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। তথাপি লেবানন নীতিগতভাবে কমিউনিজম্-বিরোধী একথা কোরিয়ার যুদ্ধের কালে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর প্রস্তাবে উত্তর-কোরিয়াকে যে 'কমিউনিস্ট পন্থী এবং আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, লেবানন কর্তৃক তাহার আন্তরিক সমর্থন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরোধিতা

আরব জাতির ঐক্য ও নিরাপত্তার প্রতি লেবাননের আন্তরিকতা প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কিন সরকারের ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সমর্থন লেবাননে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত লেবাননে ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে মানিয়া লইবার যে মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ডক্টর মালিকের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের বেইরুট বক্তৃতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

আরব ঐক্য ও নিরাপত্তার আন্তরিক সমর্থন

মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে লেবানন আরব জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদী মনোভাব লেবাননকে নিজ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে নাই। আরব-লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের প্রত্যেকটিরই স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা-ই লেবাননের আরব দেশ-সমূহের সহিত সম্পর্কের অন্যতম মূলনীতি।

লেবানন ও মধ্য-প্রাচ্য

লেবাননের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ কোনপ্রকার রক্তক্ষয় না করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল।* লেবাননের নূতন শাসনব্যবস্থাও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। ইস্রায়েল-এর প্রতি লেবাননের বর্তমান সম্পর্ক মিত্রতাপূর্ণ না হইলেও প্রত্যক্ষ শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় নাই। কিন্তু সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলী আক্রমণ (১৯৫৫) লেবানন, সিরিয়া ও

লেবানন-সিরিয়া-মিশর-এর মধ্যে সামরিক ঐক্য স্থাপন (১৯৫৫)

* "...Bloodless revolution has since become known as the *Inkilab* (overturn)." Lenczowski, p. 278

মিশরের মধ্যে এক সামরিক ঐক্য স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। বলা বাহুল্য বাগদাদ চুক্তির বিপক্ষে লেবানন সিরিয়া ও মিশরের সহিত সংযুক্ত হইল (১৯৫৫, ডিসেম্বর)।

**সিরিয়া (Syria)ঃ** সিরিয়ার স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাস পুনঃ পুনঃ সামরিক বিপ্লবের ইতিহাস মাত্র। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কর্ণেল হুসেন জাইম কোন রক্তপাত না করিয়াই এক বিপ্লব সংঘটিত করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই আগস্ট মাসের ১৪ তারিখে কর্ণেল হিনাওই হুসেন জাইম প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পদচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত করেন। হিনাওই কর্ণেল জাইম-এর আমলে অনুসৃত মিশর ও সউদি আরবের প্রতি প্রীতিপূর্ণ নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ইরাক ও জর্দানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে তৎপর হইলেন। তিনি বৃহত্তর সিরিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইরাক ও সিরিয়ার সংযুক্তির চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু ইরাকের সহিত মৈত্রী-নীতি এবং হিনাওইর বৃহত্তর সিরিয়া পরিকল্পনা অপরাপর সামরিক নেতৃবর্গ সমর্থন করিলেন না। ফলে ঐ বৎসরই (১৯৪৯) লেফ্‌টেন্যান্ট শিশকলি তৃতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করিলেন। প্রথম দুই বৎসর শিশকলি বেসামরিক শাসক-বর্গকেই সিরিয়ার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিলেন বটে, কিন্তু ১৯৫১ হইতে ১৯৫৪ পর্যন্ত চারি বৎসর তিনি শাসনদায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া এক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু রাখিলেন। কিন্তু ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কর্ণেল মুস্তাফা হামদুন বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শিশকলি দেশ ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ইহার পর সিরিয়ায় পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইল। কিন্তু এদিকে মধ্য-প্রাচ্যে বাগদাদ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে সিরিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কতক পরিমাণে জটিল হইয়া উঠিল। বাগদাদ চুক্তির প্রথম দুইটি স্বাক্ষরকারী দেশ—তুরস্ক ও ইরাক মধ্য-প্রাচ্যের অপরাপর দেশকেও সেই চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু সিরিয়ার জনমত ইরাক, তুরস্ক বা এই দুই রাষ্ট্রের পশ্চিমী-মিত্রশক্তিবর্গের কাহারো সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে রাজী হইল না। মিশর কর্তৃক আরব-লীগের সমর্থন ও

পুনঃ পুনঃ সামরিক বিপ্লব

শিশকলির স্বৈরাচারী শাসন

গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃস্থাপিত

সহায়তা সিরিয়ায় খুবই উৎসাহের সৃষ্টি করিল। সিরিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্কে বাগদাদ-চুক্তির বিরোধিতা এবং মিশরের নেতৃত্বের উপর আস্থা—এই দুই নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নীতির প্রয়োগ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (২০শে) মিশরের সহিত সিরিয়ার পরস্পর সামরিক সাহায্য-সহায়তা চুক্তি এবং ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে সউদি আরবের সহিত অর্থনৈতিক চুক্তিতে দেখা যায়। ইরাকের সহিত মিত্রতা নীতি অনুসরণের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও ইরাক অথবা তুরস্ককে শত্রুতে পরিণত করা সিরিয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইস্রায়েল কর্তৃক সিরিয়া আক্রমণ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি সিরিয়াবাসীদের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল তাহা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মিত্রশক্তি ইরাকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশর, সিরিয়া ও সউদি আরবের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ভিন্ন সিরিয়া United Arab Republic-এ যোগদান করে। ইদানীং (১৯৬১) সিরিয়ায় এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। ফলে সিরিয়া United Arab Republic হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সিরিয়ার উপর মিশরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এই যুক্তিই এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

আরব-লীগের সমর্থন

মিশর-সিরিয়া-সউদি আরব সামরিক চুক্তি

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

**এশিয়া : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (Asia : South-East Asia) :**

**চীন (China) :** ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং নেতা চিয়াং-কাইশেকের পরাজয় এবং চীনে সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন এশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই। ৬০ কোটি লোক-অধ্যুষিত এক বিশাল ভূখণ্ডের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সাম্যবাদের প্রচলন চীনদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসকে যেমন এক নূতন রূপ দান করিয়াছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও এক অভিনব জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

নূতন চীনের অভ্যুত্থান

চীনে কমিউনিস্ট্ দল জয়যুক্ত হইলে 'জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' বলিয়া নূতন, সাম্যবাদী চীনের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর পেকিং

হইতে ঘোষণা করা হইল। এদিকে জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং-কাইশেক পরাজিত হইয়া ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চীনের নূতন সরকার পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চাহিলে কয়েকটি দেশ উহাকে স্বীকৃতি দান করিল। প্রথমেই যে-সকল দেশ কমিউনিস্ট্ চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ৩২টি রাষ্ট্র নূতন চীনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিয়া সেই দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং-কাইশেককে কমিউনিস্ট্দের সহিত অন্তর্যুদ্ধকালে প্রচুর সাহায্যদান করিয়াছিল। তাঁহার পরাজয় এবং ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণের পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতির কোন পরিবর্তন করে নাই। ফরমোজার প্রতিনিধিই এযাবৎ চীনের প্রতিনিধি হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্য পদে আসীন আছেন আর কমিউনিস্ট্ চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতায় এখনও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিয়াং-কাইশেকের চীন-ফরমোজার পক্ষ সমর্থন

কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্র হইল এশিয়া মহাদেশে কমিউনিস্ট্ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে কমিউনিজম্ যাহাতে বিস্তারলাভ করে সেই চেষ্টা করা। কমিউনিস্ট্ চীনের নেতৃবর্গের উক্তি হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, চীনের পররাষ্ট্র-

---

* ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে-সকল দেশ কমিউনিস্ট্ চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়াছে: (১) অস্ট্রিয়া, (২) আলবানিয়া, (৩) আরব রিপাব্লিক, (৪) উত্তর-কোরিয়া, (৫) ক্যাম্বোডিয়া, (৬) চেকোস্লোভাকিয়া, (৭) সিংহল, (৮) ভারত, (৯) ইংলণ্ড, (১০) সোভিয়েত ইউনিয়ন, (১১) উত্তর-ভিয়েৎনাম, (১২) যুগোস্লাভিয়া, (১৩) ইয়েমেন, (১৪) ইরাক, (১৫) ইরাণ, (১৬) ইস্রায়েল, (১৭) রুমানিয়া, (১৮) পোল্যাণ্ড, (১৯) সুইডেন, (২০) নরওয়ে, (২১) সুইট্জারল্যাণ্ড, (২২) বহির্মঙ্গোলিয়া, (২৩) ফিন্ল্যাণ্ড, (২৪) পূর্ব-জার্মানি, (২৫) নেদারল্যাণ্ড, (২৬) নেপাল, (২৭) ইন্দোনেশিয়া, (২৮) ব্রহ্মদেশ, (২৯) বুলগেরিয়া, (৩০) ডেনমার্ক, (৩১) আফগানিস্তান ও (৩২) মিশর।

নীতি বা পররাষ্ট্র সম্পর্ক মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন ও স্টালিনের সুযৌক্তিক নীতিগুলির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্র নীতির অপর সূত্র হইল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। নূতন চীনের অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েক বৎসর পেকিং সরকার সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সৌহার্দ্যমূলক নীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আদর্শগত পার্থক্য মানিয়া লইয়া সহ-অবস্থানের (co-existence) মাধ্যমে এক সুদৃঢ় ঐক্য সাধনে প্রয়াসী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট চীনের জন্মের অব্যবহিত পরেই (নভেম্বর, ১৯৪৯) মাও-সে-তুং-এর কার্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চীন দেশে যেমন কমিউনিস্ট্ সাফল্য সম্ভব হইয়াছে অনুরূপ পন্থায় এশিয়ার যে-কোন দেশে কমিউনিস্ট্ শাসন স্থাপনের কার্যে চীন সাহায্য দানে প্রস্তুত এই ঘোষণা করা হইল। কিন্তু এই পন্থা অনুসরণ করিয়া চীন কমিউনিজমের তেমন প্রসার সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। একমাত্র ভিয়েৎনাম ছিল ইহার ব্যতিক্রম। এমতাবস্থায় সহ-অবস্থানের নীতির উপরই চীন অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকে। কিন্তু এই সহ-অবস্থানের নীতিও চীন অধিককাল অনুসরণ করিয়া চলিতে সক্ষম হইল না।

কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র

চীনের কমিউনিস্ট্ দলের সাফল্যের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাহা নূতন চীনের সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সৌহার্দ্যের উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চীন দেশ রাশিয়ার নির্দেশাধীন এরূপ কেহ কেহ মনে করিলেও বস্তুত তাহা সত্য নহে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরস্পর সম্পর্কে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অন্তরালে বহির্মঙ্গোলিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার, পৃথিবীর সাম্যবাদী অর্থাৎ কমিউনিস্ট দেশসমূহের নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই দেশে প্রতিযোগিতাও যে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহায়তা ও সৌহার্দ্যমূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর এই চুক্তি চালু থাকিবে। চীনের উন্নয়নের ব্যাপারে সোভিয়েত

চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক

প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার ভাব সত্ত্বেও পরস্পর সাহায্য-সহায়তা ও মৈত্রী

রাশিয়া নানাভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে চীনদেশ রাশিয়ার সহিত যুগ্মভাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর বিরোধিতা করিয়াছে। অনুরূপ, ইন্দোচীনের কমিউনিস্টগণকে সাহায্যদান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চ্যাংচুন রেলপথ চীন দেশকে ফিরাইয়া দিয়াছে। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৯৫৫) রাশিয়া পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরাইয়া দিয়াছে। চীন-সোভিয়েত যুগ্ম প্রচেষ্টায় বহু যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠান চীনে স্থাপিত হইয়াছে। চীন দেশকে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যভুক্ত করিবার ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার চেষ্টার অন্ত নাই। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠনের বিরোধিতার ব্যাপারেও চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবাদ, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের কালে চীন-সোভিয়েত পরামর্শ প্রভৃতি এই দুই দেশের সৌহার্দ্যেরই পরিচায়ক। সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার ভাব থাকিলেও একে অপরের সহিত অপরিহার্য মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ একথা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি চীন-সোভিয়েতের বিরুদ্ধ ভাব

নূতন চীনের জন্মের অল্পকালের মধ্যে ব্রিটেন কর্তৃক চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ফলে চীন-ব্রিটেন সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে হংকং-এর অধিকার লইয়া এই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা যে নাই, তাহা বলা যায় না। ব্রিটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের ব্যাপারেও চীন দেশের সহিষ্ণু-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন দেশের চরম বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কমিউনিস্ট-কুয়ো-মিং-তাং অন্তর্যুদ্ধে কুয়ো-মিং-তাং দলকে বিশাল পরিমাণ অর্থ ও সামরিক উপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। ইহাতে কমিউনিস্টদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্বেষভাব যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল তেমনি চীনের কমিউনিস্টদলেরও মার্কিন-প্রীতির কোন অবকাশ ছিল না। স্বভাবতই চীনে কমিউনিস্ট পক্ষ জয়লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে স্বীকৃতি দান করিল না। উপরন্তু ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয়গ্রহণকারী কুয়ো-মিং-তাং অর্থাৎ চিয়াং-কাইশেকের সরকারকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ চীনদেশের বৈধ সরকার বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। চীনের ইউনাইটেড

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে তিক্ততা

ন্যাশন্‌স্ এর সভ্যপদভুক্তির ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ বিরোধিতা করিয়া চলিতেছে। এদিকে কমিউনিস্ট্ চীন অর্থাৎ চীনের জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র ফরমোজা, কুয়েময়, মাৎসু, টান-টান, এহ্‌র-টান, টেশেন প্রভৃতি চীনা দ্বীপসমূহ অধিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং চীন অর্থাৎ ফরমোজায় অবস্থিত চিয়াং-কাইশেকের সরকার টেশেন দ্বীপটি ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন। ফলে এই স্থানটি কমিউনিস্ট্ চীনের সহিত সংযুক্ত হয়। অপরাপর দ্বীপ লইয়া চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নানা প্রকার সামরিক হুম্‌কি প্রদর্শিত হইলেও এই সকল স্থান অধিকারের জন্য কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করা চীন এযাবৎ যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। অবশ্য কুয়েময় দ্বীপে চীন বোমা নিক্ষেপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও পররাষ্ট্রসচিব ডালেস্-এর সতর্কবাণী এজন্য কতকটা দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে চীনদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে।

আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের প্রতি চীনের প্রাথমিক সম্পর্ক সৌহার্দমূলক ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার—বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত যোগাযোগ ও মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলা চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়াও প্রয়োজন। এজন্য আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের সহিত চীনের মৈত্রীস্পৃহা ও মিত্রতাপূর্ণ আচরণ খুবই স্বাভাবিক এবং আনন্দের বিষয় বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চু-এন্-লাই-এর ভারত সফরের পর ভারত-চীন মৈত্রী বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। চু-এন্-লাই ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারত ও চীনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের সম্পর্ক পাঁচটি মূল নীতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া এক যুগ্ম বিবৃতি দান করেন। এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি নীতি হইল : পরস্পর পরস্পরের রাজ্যের অখণ্ডতা স্বীকার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অনাক্রমণ, পরস্পর পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান ও সমমর্যাদা প্রদর্শন, ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (peaceful co-existence)। সেই সময়ে চীন-ভারত মৈত্রী 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' ধ্বনিতে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবৎসর

চীন-ভারত সৌহার্দ্য

পঞ্চশীল

(১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) বান্দুং নামক স্থানে আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ এক কন্‌ফারেন্স-এ সমবেত হইলেন। এই কন্‌ফারেন্সে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন্-লাই তাঁহার সৌহার্দ্যমূলক এবং শান্তিকামী বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনায় সমবেত প্রতিনিধিবর্গের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন। ইহার সুফল পরবর্তী দুই-এক বৎসরের মধ্যে আরও বহু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রকর্তৃক চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পর হইতেই চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসার নীতি অনুসরণ করিতে শুরু করিলে বান্দুং কন্‌ফারেন্সে চীন দেশের প্রতি যে মিত্রতার মনোভাব আফ্রো-এশীয় দেশসমূহে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রবর্গের সহিত চীনের সীমা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ভারতের উত্তর-সীমা অতিক্রম করিয়া চীনের রাজ্যবিস্তার চীন-ভারত সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'পঞ্চশীল' স্বাক্ষরের কয়েক মাসের মধ্যে চীন গাহ্‌ড়বাল অঞ্চলে এবং ক্রমে ভারতের উত্তর-সীমান্ত দেশে কয়েক সহস্র বর্গমাইল অধিকার করিয়াছে। অনুরূপ নেপাল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতির সহিতও সীমান্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে। চীন ও নেপালের চুক্তি (২১শে মার্চ, ১৯৬০) এবং চীন-ব্রহ্মদেশ চুক্তি (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৬০) এই দুই দেশের সহিত চীনের সীমান্ত-সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু চীন কর্তৃক ভারতের সীমার অন্তর্দেশে স্থান অধিকার লইয়া যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এখনও দূরীভূত হয় নাই। তবে উভয় দেশ-ই শান্তি-পূর্ণ উপায়ে এই সমস্যা সমাধানে কৃতসংকল্প এজন্য এই বিষয় লইয়া কোন যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা নাই, বলা যাইতে পারে।

আফ্রো-এশীয় কন্‌ফারেন্স

চীনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন—প্রসার নীতির অনুসরণ

সীমান্ত দ্বন্দ্ব

চীন-ভারত মনোমালিন্য

কমিউনিস্ট্ চীনের প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই চীন তিব্বত চীনের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া দাবি করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই (২২শে মে, ১৯৫০) চীন তিব্বতের 'মুক্তি'সাধন করিতে দৃঢ় সংকল্প একথা ঘোষণা করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই (২৮শে,

চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণ (১৯৫০)

অক্টোবর, ১৯৫০) চীনাসৈন্য তিব্বতের সীমা অতিক্রম করিয়া তিব্বত আক্রমণ করিলে ভারত স্বভাবতই ইহাতে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু চীনা সরকার তিব্বতকে চীনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলিয়া দাবি করিল এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত অথবা অপর কোন বহিঃরাষ্ট্রের কোন প্রতিবাদের কোন অবকাশ নাই, একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল। দীর্ঘকাল পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের আইনগত আধিপত্য ছিল একথা স্বীকার করিলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে তিব্বত চীন হইতে প্রকৃত ক্ষেত্রে স্বাধীন হইয়া যায়। তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় চীনের কোন প্রকার আধিপত্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। যাহা হউক, চীনের আক্রমণের পর তিব্বতের দলাই লামা ও পঞ্চেন লামা বাধ্য হইয়া পেকিং সরকারের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তি অনুসারে তিব্বত চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। পক্ষান্তরে পেকিং সরকার অর্থাৎ কমিউনিস্ট্ চীনের সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসনকে উন্নত করিয়া দেশের জনসাধারণকে পশ্চাদ্‌পদ কুসংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিবেন স্থির হইল। দলাই লামা বা পঞ্চেন লামার ক্ষমতা বা অধিকার, ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতিতে পেকিং সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, একথাও স্থিরীকৃত হইল।

চীন-তিব্বত চুক্তি (১৯৫১)

কিন্তু কমিউনিস্ট্ চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন তিব্বতের জনসাধারণ ক্রমেই চীনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। চীন সরকার বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া তিব্বতকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিলেন। তিব্বতের বিরুদ্ধে চীনের আক্রমণ (১৯৫০) এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বলপ্রয়োগে বিদ্রোহ দমন পৃথিবীর স্বাধীনতা ও শান্তিকামী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রমাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু চীন তিব্বত-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া ঘোষণা করিলে শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন যখন তিব্বত আক্রমণ করিয়া দলাই

তিব্বতের অধিবাসীদের উপর চীনের কঠোর শাসন

তিব্বতের বিদ্রোহ

ও পঞ্চেন লামার সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চু-এন্-লাই ভারত সফরে আসিলে জওহরলাল নেহরু তাঁহার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন উহার শর্তানুসারে ভারত তিব্বতের উপর চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। উপরন্তু ভারত তিব্বতে যে-সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিত সেগুলিও ত্যাগ করিল। এমতাবস্থায় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন যখন তিব্বতের বিদ্রোহ দমন করিয়া শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে হস্তগত করিল তখন কেবলমাত্র প্রতিবাদ করা ভিন্ন ভারতের আর কোন কিছুই করণীয় রহিল না।

ভারত সরকারের ব্যর্থ প্রতিবাদ

তিব্বতের স্বাধীনতা বিলোপের ব্যাপারে নানা প্রকার পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করা হইয়াছে। তিব্বতের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহাতে তিব্বতকে চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই একথা প্রমাণিত হয় যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বাবধি তিব্বত প্রকৃত স্বাধীনতাই ভোগ করিতেছিল।

চীন কর্তৃক তিব্বতগ্রাসের আইনগত আলোচনা

আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌দের একটি কমিশন (International Commission of Jurists) তিব্বত সম্পর্কে আইনগত বিচার-বিবেচনার পর একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিব্বত-ঘটনা চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া ঘোষণার কোন আইনসিদ্ধ যুক্তি নাই। ইহা ভিন্ন, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন-তিব্বত চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়াও চীন সরকার নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছিলেন। তদুপরি এক বিরাট সংখ্যক তিব্বতীয়ের প্রাণনাশ করিয়া চীন সরকার মানবিকতা, নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবহার—এই তিনেরই অবমাননা করিয়াছিলেন।

'আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ কমিশন'-এর মন্তব্য

মানবিকতা, নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক ব্যবহারের অবমাননা

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের তিব্বতীয় বিদ্রোহের পর দলাই লামা তিব্বত ত্যাগ

করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রয়দানে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার বহু সংখ্যক তিব্বতীয় অনুচরকে উদ্‌বাস্তু শিবির নির্মাণ করিয়া আশ্রয় দান করেন। ইহার ফলে চীন-ভারত সম্পর্কের তিক্ততা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে চীন কাশ্মীরের লাদক অঞ্চলে বহু স্থান অধিকার করিয়া লয়। সীমারেখা-সংক্রান্ত চীন-ভারত বিবাদের মীমাংসা এযাবৎ সম্ভব হয় নাই।

ভারত কর্তৃক দলাই লামাকে আশ্রয় দান—চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি

**জাপান ( Japan ) :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দীর্ঘ সাত বৎসর কাল মার্কিন সামরিক অধিকারে থাকিবার পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সামরিক ক্ষেত্রে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। জাপানকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিবার পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এশিয়া মহাদেশে একটি বিরুদ্ধবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারদ্বয়ের ঐক্য হেতু এশিয়া মহাদেশে সাম্যবাদের প্রসারের যে সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে সাম্যবাদ-বিরোধী একটি শক্তিকে দণ্ডায়মান করাই হইল মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে রাশিয়ার সীমাহীনভাবে শক্তিবৃদ্ধি এবং চীনের সাম্যবাদী সরকারের শক্তিসঞ্চয় জাপানকে যুদ্ধ-নীতির তথা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হইবার নীতি পরিত্যাগ করিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রকাশ জাপানীদের প্রকাশ্য মার্কিন-বিরোধিতায় পরিলক্ষিত হইতেছে। জাপান নিজ পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ক্রমেই নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের পুনরুজ্জীবনে মার্কিন আগ্রহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

নিরপেক্ষনীতির দিকে জাপানের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ

**ইন্দো-চীন ( Indo-China ) :** কোচিন-চীন, লাওস, কম্বোজ,

আনাম, টংকিং—এই কয়েকটি অঞ্চল লইয়া ইন্দো-চীন গঠিত। ফরাসী প্রাধান্যাধীন এই অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান ইন্দো-চীন অধিকার করিয়া লইয়া এই অঞ্চলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সূত্রে আনাম-এর সম্রাট বাওদাই, কম্বোজের ও লাওস-এর রাজগণ নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'ভিয়েৎমিন লীগে'র নেতা হো-চি-মিন টং-কিং-এর সাতটি প্রদেশ নিজ কর্তৃত্বাধীন রাখিলেন এবং তদুপরি জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে হানই নামক স্থানটিও অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে যুদ্ধাবসানের পর ফ্রান্স কম্বোজের ও লাওসের রাজগণের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা এই দুই দেশে দুইজন ফরাসী নিয়ামক স্থাপিত হইবে এবং কম্বোজ ও লাওসের রাজগণ তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবেন স্থির হইল। হানই-এর ভিয়েৎনাম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সহিতও ফ্রান্সের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো-চীন যুক্তরাষ্ট্রের ( Indo-Chinese Federation ) একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রকে বিবেচনা করা হইল। কোচিন-চীন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করিবে কিনা তাহা সেই দেশের জনসাধারণের গণভোটে স্থিরীকৃত হইবে, একথাও স্বীকৃত হইল। কিন্তু এই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্স কোচিন-চীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিলে কোচিন-চীনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ইহার পর হইতে ইন্দো-চীন, কম্বোজ, কোচিন-চীন, আনাম, লাওস প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। ফ্রান্স এই সকল দেশের প্রতিনিধিদের সহিত মীমাংসার জন্য একাধিক কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েৎনামবাসীরা টংকিং ও আনামে অবস্থিত ফরাসী সেনানিবাস আক্রমণ করিলে এই অঞ্চলে এক যুদ্ধ শুরু হইল। ভিয়েৎনামের নেতা হো-চি-মিন একমাত্র পূর্ণ

ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা ঘোষণা

ফরাসী অধিকার পুনঃস্বীকৃত

ইন্দো-চীন ফেডারেশন পরিকল্পনা

ভিয়েৎনাম কর্তৃক ফরাসী সেনানিবাস আক্রমণ—যুদ্ধ শুরু

স্বাধীনতার শর্তে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনে রাজী এই কথা ঘোষণা করিলেন (মার্চ ২৪, ১৯৪৭)। কিন্তু ভিয়েৎনাম অঞ্চল ফরাসী ইউ-নিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ ফ্রান্স এই যুক্তিতে এই অঞ্চলে তাহার অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিল। হো-চি-মিন-এর কমিউনিস্ট্ মতবাদে বিশ্বাস ও ফ্রান্সের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক, ভিয়েৎনাম সরকার কোচিন-চীন, আনাম, টংকিং এই তিনটি ভিয়েৎনাম ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের এবং পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা ও অধিকার সহ ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো-চীন ফেডারেশন এবং ফরাসী ইউনিয়নের সদস্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর নিকট এক আবেদন করিলেন। এদিকে ফরাসী সরকার সম্রাট বাওদাইকে আনাম, কোচিন-চীন ও টংকিং অঞ্চলের একটি সংযুক্ত ফরাসী 'ডোমিনিয়ন' ( French Dominion )-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন (১৯৪৯, ৮ই মার্চ)। হো-চি-মিন ফরাসী সেনাবাহিনীর সহিত তখনও যুদ্ধ করিয়া চলিতেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করিলে চীন সরকার হো-চি-মিন-এর সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিলেন (৯ই জানুয়ারি, ১৯৫০)। রাশিয়া ও রুশ প্রভাবাধীন রাষ্ট্রবর্গও হো-চি-মিন-এর সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। পক্ষান্তরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ফরাসী ডোমিনিয়ন'-এর বাওদাই গঠিত শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে 'ঠাণ্ডা লড়াই' এই সকল অঞ্চলেও বিস্তৃত হইল।

হো-চি-মিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ

বাওদাই ফরাসী ডোমিনিয়নের শাসক নিযুক্ত

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর এবং বিশাল পরিমাণ অর্থ ও ফরাসী সৈন্য ক্ষয় করিয়াও যখন হো-চি-মিন-কে পরাজিত করা সম্ভব হইল না, তখন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা কন্‌ফারেন্সে (Geneva Conference) এই অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ১৭° অক্ষরেখার উত্তরাংশ ভিয়েৎমিন সরকারের অধীনে এবং উহার দক্ষিণাংশ ভিয়েৎনাম সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল। লাওস ও কম্বোজকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত

ইন্দোচীন ব্যবচ্ছেদ : ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের উৎপত্তি

করা হইল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লাওসে কমিউনিস্ট ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট সাহায্যপুষ্ট দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিমী অর্থাৎ কমিউনিস্ট্ ও কমিউনিস্ট্-বিরোধী দলের 'ঠাণ্ডা লড়াই' এই অঞ্চলে তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে।

লাওস অঞ্চলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' প্রসারিত

**ইন্দোনেশিয়া ( Indonesia ) ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইন্দোনেশিয়ায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ শাসন হইতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের মধ্যে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী-অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইলেও জাতীয় ঐক্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। বিভিন্ন দলের পরস্পর প্রতিযোগিতা ও অসহিষ্ণুতার মনোবৃত্তি দেশের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ (১৯৫৯)ইন্দোনেশিয় সংবিধান নাকচ করিয়া 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' ( Guided Democracy )-এর প্রবর্তন করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

স্বাধীনতালাভ

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কর্তৃক 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' প্রবর্তন

**পাকিস্তান ( Pakistan ) ঃ** স্বাধীনতা লাভের ( ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট ) পর হইতে দীর্ঘ এক দশক ধরিয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পাকিস্তান নিজস্ব কোন পররাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের নীতি স্থির করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত দেশ হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিদ্বেষভাব প্রথম হইতেই ছিল। আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে ভারতের দিক হইতে আক্রমণের ধুয়া তুলিয়া দেশের জনসাধারণকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার দিকে মনোযোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা ভিন্ন এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পাকিস্তান বহির্দেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনার সুযোগও সৃষ্টি করিয়াছে। কাশ্মীর-গ্রাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া

স্বাধীনতা লাভ—স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতির অভাব

পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষ

পাকিস্তান ভারতকে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে সর্বদাই সচেষ্ট। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ভারত কর্তৃক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণে রাজী না হওয়ার ফলে ভারত সরকার প্রতিশ্রুত গণভোট গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ পান নাই। কিন্তু ভারত কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভার উপর কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলে সেই সভা সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে ভারতভুক্তি অনুমোদন করে। ইহাতে গণভোটের প্রতিশ্রুতি পালন করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

কাশ্মীর সমস্যা

এদিকে পাকিস্তান কমিউনিস্ট্-বিরোধী দেশ হিসাবে ক্রমেই পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির কথা মুখে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্যলাভে কোন অসুবিধা যেমন ঘটে নাই, তেমনি প্রয়োজনবোধে ভারতের বিরুদ্ধে সেই সকল সামরিক উপকরণ ব্যবহার করিবারও কোন অসুবিধা নাই। এই সকল যুক্তিতে পাকিস্তান SEATO, CENTO (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতি এশিয়ায় পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক সংগঠিত সামরিক শক্তিজোটে যোগদান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাক-মার্কিন পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য লাভ করিবে, স্থির হইয়াছে। এইভাবে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত মিত্রশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তান কর্তৃক ক্রমবর্ধমান হারে মার্কিন সামরিক সাহায্য লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ভারতের নিরাপত্তার সমস্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি পাক-ভারত সম্পর্কেও তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পাক-নেতৃবর্গের উত্তেজনাপূর্ণ আস্ফালন এই তিক্ততা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য :

SEATO, CENTO প্রভৃতিতে যোগদান

পাক-ভারত সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের নীতি

জেনারেল আয়ুব খাঁ কর্তৃক ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণের পরও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। রাশিয়ার নিকট হইতে কোন কোন ব্যাপারে কারিগরি সাহায্য গ্রহণ, সংযুক্ত-আরব রিপাব্লিকের সহিত সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার, চীনের সহিত সীমান্ত-সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-সম্পর্কের পরিবর্তনের পরিচায়ক হইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মানসিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না। বস্তুত পররাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পাকিস্তানের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে কোন কোন সময়ে পাকিস্তান পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট হইতে নিজ আনুগত্যের অনুপাতে সাহায্যলাভ করিতেছে না এই অভিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পন্থা অনুসরণ করিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অধিকতর সাহায্যলাভই হইল মূল উদ্দেশ্য। কেনেডির প্রেসিডেন্ট-পদ লাভের পর জেনারেল আয়ুব খাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালের উক্তি এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

রাশিয়া, সংযুক্ত-আরব প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-প্রীতি পাকিস্তানের বিদ্বেষ ও ঈর্ষার কারণ

আফগানিস্তানের সহিত পাকতুনীস্তান গঠন সম্পর্কে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শেষ পরিণতি হিসাবে এই দুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ইদানীং (১৯৬১) ছিন্ন হইয়াছে। উপসংহারে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তানের পশ্চিমী সামরিক শক্তি-জোটের সহিত যোগদানের ফলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' ভারত উপমহাদেশেও প্রসারিত হইয়াছে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিরোধ

**ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy)**ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই ভারতের গণপরিষদে জাতীয় পতাকা গ্রহণ-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারত-ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র কি হইবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করেন। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, নবলব্ধ স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে ভারত যেন কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পোষণ না করে। কারণ তাহা

ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ-বিরোধী। তিনি স্পষ্টভাবে এই কথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কোন রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিতে রাজী হইবে না। ভারত নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা যথাসম্ভব শান্তির সহায়করূপেই বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা-লাভের প্রতিযোগিতা হইতে ভারত দূরে থাকিবে; রাজনৈতিক সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে উহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হইতে পারে, তথাপি ভারত এবিষয়ে যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই (মার্চ ২৩ হইতে ২রা এপ্রিল) ভারতে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে আরব, মিশর, চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি মোট ২২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলন, ঔপনিবেশিক সমস্যা, অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমষ্টিগত উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে এই সম্মেলনে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির মৌলিক ঐক্য এবং পৃথিবীর অবিভাজ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা-প্রদর্শন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন।

এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন

**ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ঃ** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া লাভ-লোকসানের খতিয়ানে ক্ষতিগ্রস্ত-ই হয়ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে নৈতিকতায় বিশ্বাসী দেশ ও জাতি মাত্রেই ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আকস্মিকভাবে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করে এবং তথাকার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী হাতাকে গ্রেপ্তার করে। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রধান

মন্ত্রী নেহরু নূতন দিল্লীতে এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন হল্যাণ্ড কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত এইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সমস্যার সমাধানে ভারতের নেতৃত্ব

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নেতৃত্ব ভারত অপরাপর দেশের উপর চাপাইতে চাহে নাই বা চাহিতেছে না, তথাপি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে শ্রীনেহরুর প্রতি যে আস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই ভারতের উপর এই নেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধি-বর্গের প্রতিবাদ ও জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা হল্যাণ্ড স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতের মৈত্রী ক্রমেই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ইন্দোনেশীয় মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

**ভারত ও নেপাল ঃ** ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালের রাণা অর্থাৎ বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রিপরিবারের ষড়যন্ত্রে নেপালরাজ ত্রিভুবন সিংহাসন হইতে অপসারিত হইলে ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। নেপালে ইহাতে এক স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাণা মোহন সাম্শের জঙ্গ রাজা ত্রিভুবনের এক নাবালক পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া-

নেপালের রাজনৈতিক সমস্যা-সমাধানে ভারতের সাহায্য-দান

ছিলেন। স্বৈরাচারী রাণা পরিবারের এই অবৈধ কার্য ভারত সরকার সমর্থন না করায় শেষ পর্যন্ত রাজা ত্রিভুবন নেপালের সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন এবং ইহার পর ক্রমে রাণা পরিবারের বংশানুক্রমিক প্রধান-মন্ত্রিত্বের স্থলে জনগণের প্রতিনিধিবর্গের নেতাকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। নেপালের শাসনব্যবস্থা গণ-তান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইদানীং নেপালের শাসনব্যবস্থা নেপালরাজ মহেন্দ্র স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ফলে গণতান্ত্রিকতা সাময়িকভাবে ব্যাহত হইলেও, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

**ভারত ও তিব্বত ঃ** ভারতের উত্তর-সীমান্তে অবস্থিত তিব্বত আইনত চীনের অধীন হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। ভারতের সহিত তিব্বতের দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিদ্যমান। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের কমিউনিস্ট্ সরকার তিব্বতের উপর অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে তিব্বতের বহুসংখ্যক অধিবাসী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার এই ব্যাপারে চীন সরকারের সহিত আলোপ-আলোচনা চালাইবার ফলে, চীন সরকার তাঁহাদের সামরিক অভিযান স্থগিত রাখেন এবং তিব্বতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তির শর্তানুসারে তিব্বত চীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। চীন সরকারও তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। অবশ্য তিব্বতের সামরিক বাহিনী চীনের সরাসরি অধীন হইবে এবং চীন সরকার তিব্বতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করিবেন এই দুইটি শর্তও ঐ চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমেই তিব্বতের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ কঠোর শাসন ক্ষমতায় পর্যবসিত হইলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। চীন এই বিদ্রোহ দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া তিব্বতকে চীনের অংশে পরিণত করে। সেই সূত্রে ভারত চীনের নিকট প্রতিবাদ জানায় এবং দলাই লামা ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে চীন-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই তিক্ততা চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিবার ফলেই সৃষ্টি হইয়াছিল।

চীন-তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের সাফল্য

**ভারত ও কোরিয়া ঃ** ভারতের নিরপেক্ষতার নীতি বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা যে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার প্রমাণ হিসাবে কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি ব্যাপারেও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধ-বন্দী বিনিময়ে ভারতের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় আত্মঘাতী যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে ভারতবর্ষ-ই ছিল প্রধান উদ্যোগী। ইহা ভিন্ন যুদ্ধবন্দী-বিনিময় ব্যাপারে ভারতের উপর যুদ্ধবন্দী-বিনিময় কমিশনের সভাপতিত্বের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। এই কমিশনের অপরাপর সদস্য দেশ ছিল সুইট্জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও সুইডেন। ভারতের

কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ে ভারতের সাহায্য

পক্ষে জেনারেল থিমায়া এই কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যুদ্ধবন্দী-বিনিময় সম্পন্ন না হওয়ায় যে সকল বন্দী উত্তর বা দক্ষিণ কোরিয়ায় যাইতে রাজী ছিল না, তাহাদিগকে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইয়াছিল। ভারত হইতে কেহ কেহ অপরাপর দেশে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ আবার ভারতেই স্থায়িভাবে রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধবন্দী-বিনিময় কালে কমিউনিস্ট্ ও কমিউনিস্ট্-বিরোধী যুদ্ধবন্দীদের সহিত ধৈর্য সহকারে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে স্থিরভাবে কাজ করিয়া জেনারেল থিমায়া ও ভারতীয় সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

**ভারত ও ইন্দো-চীন ঃ** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান পরাজিত হইলে ফ্রান্স পুনরায় ইন্দো-চীন নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চায় এবং ইন্দো-চীনের ক্যাম্বোডিয়া, লাওস্ ও ভিয়েৎনাম-এর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করে। এই ব্যাপারেও ভারত-সরকার ইন্দো-চীনের সমর্থন করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু অতিথি হিসাবে ফরাসী পার্লামেণ্টে বক্তৃতাদান কালে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সেই অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনা-ই হইল একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি এই বক্তৃতায় ফরাসী পার্লামেণ্ট ও ফরাসী জাতির নিকট বিশেষ আবেদন জানান। যাহা হউক ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই এই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ঘটে। এই বিষয়েও ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের চেষ্টায় যুদ্ধবিরতি-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে মতৈক্যের পথ সহজতর হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনটি কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই তিনটির-ই চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতীয়। জে. এম. দেশাই, ডাঃ জে. এন. খোল্‌সা ও জে. পার্থসারথি এই তিনটি কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব সহকারে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালন ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের উপর সকলের শ্রদ্ধার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতিতে ভারতের অংশগ্রহণ

**ভারত ও চীন ঃ** ভারত যে কোন রাষ্ট্রজোটে-ই যোগদানের পক্ষপাতী নহে এবং সকল দেশের প্রতিই যে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত, তাহা

এক দিকে কমিউনিস্ট্ চীন ও রাশিয়ার সহিত এবং অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী প্রভৃতি দেশের সহিত মৈত্রী চুক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। মহাচীনে কমিউনিস্ট্ শাসন স্থাপিত হইলে মার্কিন-সাহায্যপুষ্ট চিয়াং-কাইশেকের ফরমোজা দ্বীপের প্রতিনিধিকে চীনদেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবার অযৌক্তিকতা সকলের নিকটই সুস্পষ্ট হইল। কিন্তু মার্কিন সরকারের মোহ এযাবৎ ভাঙ্গিল না। যাহা হউক ভারত সরকার, ব্রিটেন প্রভৃতি বহু দেশই কমিউনিস্ট্ চীনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। চীনদেশের সহিত সুদূর অতীত হইতেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত কর্তৃক কমিউনিস্ট্ চীন স্বীকৃত হইলে চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ়তর হইল।

চীন-ভারত মৈত্রী

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই ভারত-পরিদর্শনে আসিলে ভারত-চীন মৈত্রী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নেহরু-চৌ-এন্-লাই-এর যুগ্ম বিবৃতিতে ভারত ও চীনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের আদর্শ বর্ণিত হয়। এই আদর্শ পাঁচটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা পৃথিবীর সর্বত্র 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। 'পঞ্চশীল' হইল ঃ (১) পরস্পর পরস্পরের রাজ্যের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (mutual respect for territorial integrity and sovereignty), (২) অনাক্রমণ (non-aggression), (৩) পরস্পর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে না-হস্তক্ষেপ ( non-intervention ), (৪) পরস্পর সাহায্য-সহায়তাদান ও সমমর্যাদা প্রদর্শন (equality and mutual assistance) ও (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (peaceful co-existence)। চীনদেশ ও ভারতের মৈত্রীর নিদর্শন হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরু চীন-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই চীন ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমায় হানা দিলে এবং ক্রমে ভারতের কয়েক সহস্র বর্গমাইল অধিকার করিয়া লইলে চীন-ভারত সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাস এবং দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দান প্রভৃতির ফলে এই তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এযাবৎ চীন-ভারত সীমান্ত-সংক্রান্ত সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই।

চৌ-এন্-লাই-এর ভারত পরিদর্শন

পঞ্চশীল

**ভারত ও রাশিয়া ঃ** রাশিয়ার সহিত ভারত মিত্রতামূলক নীতি অনুসরণ

করিয়া চলিয়াছে। অপর দেশের শাসনব্যবস্থা কি প্রকৃতির তাহার উপর সেই দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা-না-করা নির্ভরশীল নহে, এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত পৃথিবীর সমক্ষে 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (peaceful co-existence)-এর কার্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রমাণস্বরূপ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন্ ও রুশ কমিউনিস্ট্ দলের সাধারণ সম্পাদক মঃ ক্রুশ্চেভ্ ভারত-পরিদর্শনে আসেন। ভারতের জনসাধারণ রুশ নেতৃ-দ্বয়কে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ভারত-ইতিহাসে, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বৈদেশিক নেতাকে এইরূপ সম্বর্ধনা কোন দেশ করে নাই। রাশিয়ার সহিত ভারতের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। মার্শাল বুলগানিন্ ও ক্রুশ্চেভ্ তাঁহাদের ভারত সফরকালে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ একথা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পোর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান নির্লজ্জের মতো এখনও দখল করিয়া থাকার তীব্র নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যে তাঁহারা খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি রুশ-ভারত সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাশিয়ার সাহায্য এই সৌহার্দ্যের পরিচায়ক। নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের পর (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১) প্রধান মন্ত্রী নেহরুর রাশিয়া সফরকালেও রুশ-ভারত আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রুশনেতা বুলগানিন্ ও ক্রুশ্চেভের ভারত-ভ্রমণ

**ভারত ও মিশর ঃ** পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকিয়া শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারত মিশরের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাসের কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে যে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ ঘটিয়াছিল, উহার বিরোধিতায় ভারত অগ্রণী ছিল। অবশেষে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ মিশর হইতে সৈন্যাপসারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাসের ভারত-পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনেহরু একাধিকবার কায়রোতে গিয়াছেন, ফলে মিশর ও ভারতের মধ্যে এক গভীর মৈত্রী সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারত-মিশর মৈত্রী

**ভারত ও সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল ঃ** ভারতের মৈত্রী-নীতি সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিও পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইতেছে। সউদি আরবের রাজা এবং আফগানিস্তানের শাহ্ ভারত-পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। এই দুই দেশের সহিতও ভারতের মিত্রতা ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে। সিংহলে পূর্ববর্তী সরকারের সহিত সিংহল-প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা লইয়া সিংহল ও ভারতের মধ্যে কিছু মন-কষাকষি হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্রীবান্দ্রেনায়কের প্রধান মন্ত্রিত্বাধীনে ভারত-সিংহল সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সৌহার্দ্য বর্তমানেও বজায় আছে বটে, কিন্তু সিংহলে ভারতীয়দের নাগরিকত্বের সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান এযাবৎ সম্ভব হয় নাই।

সউদি আরব, আফগানিস্তান ও সিংহলের সহিত ভারতের সৌহার্দ্য

**ভারত ও পাকিস্তান ঃ** স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বৎসর ধরিয়া ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তেমন প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। প্রথম হইতেই পাকিস্তান সরকার ভারতকে শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রতি অপমানসূচক মন্তব্য করিতেও পাকিস্তানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই। কাশ্মীর আক্রমণ এবং পুনঃপুনঃ ভারতের সীমা লঙ্ঘন, পাকিস্তানী হানাদারদের ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক কতকটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান সরকার ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের সাহায্য লইয়া ভারতের বিরোধিতা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ভারত কমিউনিস্ট্ পক্ষে যোগদান করিয়াছে, এই কথা প্রায়ই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ, যথা প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন, প্রকাশ্যে বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ইহাতে ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষতঃ মার্কিন সরকারের মনস্তুষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ব্যক্তিকেও এই উক্তির সত্যতা বুঝান সম্ভব হইবে না। যে-কোন অজুহাতে ভারতের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা ভারত সম্পর্কে কটূক্তি করা পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-নীতির মূল সুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন সামরিক সাহায্য লাভের এবং বাগদাদ চুক্তির পর পাকিস্তানের আস্ফালন কিছুদিন একটু মাত্রা

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ

ভারতের বিরোধিতা পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-নীতির মূল সুর

ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ জেহাদ প্রভৃতি উদ্ভট পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না, একথা মনে হয় উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য মার্কিন সরকারের সাহায্যদানে মর্মাহত হইয়া পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বিগত বাগদাদ চুক্তি-সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বৈঠকে উহার বিরোধিতা করিয়া বিফল হইয়াছেন। একই দেশ হইতে উদ্ভূত দুইটি রাজ্যের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত কারণে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এইরূপ তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে : (১) পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত কাশ্মীরের অঞ্চল ত্যাগে অসম্মতি, (২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নীতি, (৩) পাকিস্তান হইতে ভারতের সীমায় হানা, (৪) ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের অপ-প্রচার ও কটূক্তি প্রয়োগ, (৫) পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ও পুনঃপুনঃ জেহাদের উস্কানি এবং (৬) সেচখালের জল-সরবরাহ সম্পর্কে পাকিস্তানে অন্যায্য দাবি। সেচখাল-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ইদানীং সম্ভব হইলেও ভারতের প্রতি পাকিস্তানী নেতৃবর্গের বিদ্বেষভাব ও ঈর্ষাপরায়ণতার অবসান ঘটিয়াছে এ কথা বলা যায় না।

ভারত-পাকিস্তান সমস্যা

**ভারত ও আমেরিকা, ইংলণ্ড :** বিগত দশ বৎসরের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে আশাজনক বলা চলে না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ইঙ্গ-মার্কিন-এর প্রদর্শিত পথেই চলিবে এইরূপ বোধ করি মার্কিন নেতৃবর্গের আশা ছিল। অন্তত মার্কিন ইতিহাসে স্বাধীনতা-লাভের (১৭৭৬) পরবর্তী কিছুকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিপত্তিবৃদ্ধি মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই। তদুপরি ভারতের রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট্ চীনদেশের সহিত মিত্রতা, চীনদেশকে জাতিপুঞ্জের সংস্থায় স্থানদানে ভারতের প্রচেষ্টা প্রভৃতি ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতিকদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। পাছে ভারত কমিউনিস্ট্ রাষ্ট্রজোটের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এজন্য ব্রিটিশ, বিশেষভাবে আমেরিকার উদ্বেগও নেহাৎ কম নহে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-

ইঙ্গ-মার্কিন-ভারত সম্পর্ক

কল্পনায় আমেরিকা কর্তৃক ভারতকে ১৪২ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণদান এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত যাহা আশা করিয়াছিল সেই তুলনায় অতি অল্প হইলেও কতক সাহায্যদানে স্বীকৃতি ভারতকে কমিউনিস্ট্ দেশগুলির সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে না-দেওয়ার মনোবৃত্তি-প্রসূত, একথা অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যও ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান এবং কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রজোটের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ইঙ্গ-মার্কিন-ভারত সৌহার্দ্য কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। রুশ নেতৃবর্গের ভারত-পরিদর্শনের অব্যবহিত পরে মিঃ ড্যালেস কর্তৃক 'গোয়া পোর্তুগালের প্রদেশস্বরূপ' এই ঘোষণা ভারতের উপর পরোক্ষভাবে চাপ দিবার চেষ্টা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বাগদাদ-চুক্তিতে আমেরিকার অংশগ্রহণ ভারত-বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। কেনেডির প্রেসিডেন্ট-পদ লাভ ভারত-মার্কিন সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিবে আশা করা যায়।

মার্কিন মনোভাব

সুয়েজ খাল আক্রমণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতের কার্যকলাপ ব্রিটিশ রক্ষণশীল-দলীয় সরকারের ক্রোধের সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল পরবর্তী নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর-প্রশ্ন আলোচনা কালে। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ-মেনন-এর বক্তব্য শুনিবার পূর্বেই ব্রিটিশ প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শন তথা ভারতের সুয়েজ খাল অর্থাৎ মিশরী-নীতির প্রত্যুত্তর হিসাবে নির্লজ্জভাবে 'উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া…' এইরূপ ভাষা-সম্বলিত একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমনকি তখনও ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা দেওয়াই শুরু হয় নাই। এই সকল ব্যাপারে কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য ব্রিটেনের সহিত সামান্য কিছুদিন পূর্বে ভারতের মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। কমন্ওয়েল্থ-এর সদস্য হিসাবে ভারত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা-সমাধানে নিরপেক্ষতার নীতি আশা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় বর্তমান ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সেইরূপ বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি হারাইয়াছেন।

কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব

ভারতের জনসাধারণের কমন্ওয়েল্থ-ত্যাগ দাবি

ভারতের জনসাধারণ ভারতের কমন্‌ওয়েল্‌থ-ত্যাগের দাবি দীর্ঘকাল হইতেই জানাইতেছে। এই দাবি সর্বকালের জন্যই উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না, একথা প্রধানমন্ত্রী নেহরুও স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলিয়ানের ভারত-পরিদর্শনের পর ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের কোন পরিবর্তন, ঘটে কিনা ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভারতের স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষতার নীতি এবং অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের প্রয়োগ পৃথিবীর শান্তিকামী দেশমাত্রেই গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের প্রতিবেশী সিংহল, ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলি—ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এবং চীন, মিশর, সিরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পঞ্চশীলে বিশ্বাসী হইয়াছেন। পৃথিবীর জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ভারত কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতিই একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অবশ্য এই উদার নীতির সুযোগ লইয়া পোর্তুগাল এখনও ভারতের গোয়া, দমন ও দিউতে আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিতেছে। এই উদার-নীতির সুযোগ লইয়াই পাকিস্তান ভারতের প্রতি উদ্ধত আচরণে দ্বিধাবোধ করিতেছে না, পক্ষান্তরে এই উদার-নীতি অনুসরণ করিয়াই ভারত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতে পূর্বেকার ফরাসী-অধিকৃত স্থানসমূহ ফিরিয়া পাইয়াছে। এই নীতির ফলেই বিশ্বের দরবারে ভারতের তথা ভারতবাসীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরস্পর-অসহিষ্ণু ও স্বার্থপর জগতে সর্বক্ষেত্রেই এই উদার-নীতির সাফল্য আশা করা ভুল হইবে, কিন্তু এই পন্থার বিকল্প পন্থাটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য কিনা সেকথা বিচার না করিয়া বর্তমান নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত হইবে না। পৃথিবীর কোন কোন শক্তি যখন সামরিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোট গঠন করিতে প্রয়াসী—যথা বাগদাদ চুক্তি, সিয়েটো (SEATO), নাটো (NATO) প্রভৃতি—সেই সময়ে নিরপেক্ষ অঞ্চলগুলির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও শান্তির ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক আদান-প্রদান ও উন্নতিসাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বোগোর (১৯৫৪) এবং বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা মহাসম্মেলনে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন সমস্যা তথা পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন সমস্যা লইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোমালিন্য যখন

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির সার্থকতা

পৃথিবীর শান্তিনাশের আশঙ্কার স্বষ্টি করে তখন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের শীর্ষ সম্মেলন যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় ( সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ )। এই সম্মেলনে ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডির মধ্যে সাক্ষাৎকার ও সরাসরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলে এই দুই নেতাকে এক শীর্ষসম্মেলনে মিলিত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে মীমাংসার পন্থা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমাকে ক্রুশ্চভকে অনুরোধ করিবার জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। ফলে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল তাহা কতকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ স্থগিত রাখা সম্পর্কে এবং রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী স্থাপনের পরিবেশ প্রস্তুত ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা শান্তিকামী দেশমাত্রেরই সমর্থ লাভ করিয়াছে। শান্তির পথই হইল বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির পথ, সামরিক জোট ধ্বংসের পথ ইহাই ভারত বিশ্বাস করে।

নিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলন ( সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ )

শান্তি ও মৈত্রীর পথে ভারত

---

# ষোড়শ অধ্যায়

## আফ্রিকার জাগরণ

## ( Resurgence of Africa )

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনাই হইল আফ্রিকার জাগরণ। দীর্ঘ কালের সুষুপ্তি কাটাইয়া আফ্রিকা এক গভীর জাতীয়তা-বোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিবার ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, আফ্রিকাবাসীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে সাম্যবাদের প্রসার আফ্রিকার সমস্যাসমূহকে অত্যধিক জটিল করিয়া তুলিল। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ফলে আফ্রিকাবাসী দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতিতে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব,

জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ আফ্রিকাবাসী

এশিয়ার জাগরণ প্রভৃতি আফ্রিকাবাসীদিগকে শোষণমুক্তভাবে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনের আশায় আন্দোলন শুরু করিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই বণ্টনের ফলে কোনপ্রকার ভৌগোলিক অথবা জাতিগত ঐক্যের কথা সাম্রাজ্যবাদীদের মোটেই স্মরণ ছিল না। আফ্রিকাবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔপনিবেশিক অংশে বিভক্ত রাখিবার ফলে উপদলীয় বা জাতিগত ঐক্যের স্থলে আফ্রিকাবাসীদের এক বৃহত্তর ঐক্যের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। আফ্রিকার যে-কোন অঞ্চলে কোনপ্রকার আন্দোলন স্বভাবতই সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিত্থালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাইজিরিয়ার অধিবাসী ডক্টর নামডি আজিকিউই, ঘানার ডক্টর কোয়ামি নক্রুমা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াটা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া 'প্যান-আফ্রিকান'(Pan-African) আন্দোলন শুরু করিলে আফ্রিকাবাসী এক বৃহত্তর ঐক্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘানার রাজধানী আক্রা (Accra) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণের এক অধিবেশনে আলাপ-আলোচনায় সমগ্র আফ্রিকার অধিবাসিগণের ঐক্যবদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকা ভিন্ন অপর সকল রাষ্ট্রই এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। এই সম্মেলনে African Monroe Doctrine ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহা আফ্রিকার যে কোন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী সর্বপ্রকার অধিকারের অবসান ঘটাইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রয়োজন হইলে আফ্রিকারই কোনও একটি রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার মাধ্যমে উহার মীমাংসা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত

আফ্রিকাবাসীদের ঐক্য আন্দোলন—Pan-African Movement

'আফ্রিকার মনরো ডক্ট্রিন' (African Monroe Doctrine)

আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রবর্গের সৌহার্দ্য ও শান্তি-নীতি এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মূল নীতিতে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আফ্রিকার জাগরণ আফ্রিকার বিভিন্নাংশের স্বাধীনতালাভ এবং স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমগ্র আফ্রিকায় মোট চারিটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু বর্তমানে উহার সংখ্যা আঠার। অপরাপর অংশেও যে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহা হইতে আশা করা যায় যে, অল্পকালের মধ্যেই আফ্রিকায় আরও বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে।

স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি

বর্তমানে কঙ্গো ও আলজেরিয়ায় আফ্রিকার স্বাধীনতা-স্পৃহা এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেলজিয়ামের উপনিবেশ কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভাইল-এ এক ব্যাপক বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন শুরু হইলে বেলজিয়াম সরকার ছয় মাসের মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন। জুন মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্গোর বিভিন্ন উপদলীয় নেতাদের মধ্যে এক তীব্র স্বার্থ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেই সুযোগে কঙ্গোর সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে স্বাধীন কঙ্গোর সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা সেনাবাহিনীর ন্যায্য দাবি মানিয়া লইয়া উহাকে সরকারের বশে আনিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই সময়ে বেলজিয়ামের প্ররোচনা ও সাহায্যে কঙ্গোর অন্যতম প্রদেশ কাতাঙ্গা কঙ্গো সরকার হইতে স্বাধীন হইয়া গেল। বেলজিয়ামের সেনাবাহিনী তখনও কঙ্গো হইতে অপসারিত হয় নাই। সেই সকল সৈন্য কঙ্গো-কাতাঙ্গার গৃহবিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়া কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ড-ভাইল অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে কাতাঙ্গা হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কঙ্গোর অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইলে ইউনাইটেড ন্যাসন্‌স্-এর সেক্রেটারী-জেনারেল কঙ্গো-সমস্যার মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ বেলজিয়াম সরকারকে কঙ্গো হইতে নিজ সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলেন এবং সেক্রেটারি-জেনারেলকে প্রয়োজনবোধে কঙ্গো সরকারকে সামরিক সাহায্য প্রেরণের

কঙ্গো সমস্যা

স্বাধীন কঙ্গোয় অন্তর্যুদ্ধ

কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা

অনুমতিও দান করিলেন। তদানীন্তন সেক্রেটারি-জেনারেল হেমারশিল্ড্ বেলজিয়াম সৈন্য ও কঙ্গো সরকারের সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এবং কঙ্গো সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর পক্ষ হইতে একদল সৈন্য কঙ্গোয় প্রেরণ করিলেন। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতীয় সৈন্যও আছে। কিন্তু কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই অত্যধিক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট কাসাবুবু ও প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে কাসাবুবু লুমুম্বাকে পদচ্যুত করিলেন, লুমুম্বাও প্রত্যুত্তরে কাসাবুবুকে পদচ্যুত করিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে কর্ণেল মোবোটু কঙ্গোর শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গ কঙ্গো পরিস্থিতির এরূপ দ্রুত পরিবর্তনে কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় একবার মোবোটুকে একবার লুমুম্বাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি লুমুম্বার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের ভ্রম উপলব্ধি করিলেন। এদিকে কাতাঙ্গার নেতা শোম্বে কঙ্গোর বিরুদ্ধে যুঝিয়া চলিলেন। ইউনাটটেড ন্যাশন্‌স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল হেমারশিল্ড্-এর ঐকান্তিকতায় কঙ্গো-কাতাঙ্গায় অন্তর্যুদ্ধের অবসানকল্পে এক যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবার জন্য যাইবার কালে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাতাঙ্গার ষড়যন্ত্রের ফলেই এই বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। কাতাঙ্গা-কঙ্গোর অন্তর্যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এযাবৎ কঙ্গো সমস্যার প্রকৃত কার্যকরী কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই।

ইউনাইটেড ন্যাসন্‌স্ ও কঙ্গো-কাতাঙ্গা সমস্যা

লুমুম্বার নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কঙ্গো-কাতাঙ্গা সমস্যা এখনও অমীমাংসিত

রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড লইয়া ব্রিটেন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এক প্রকার সর্বাত্মকই ছিল। উত্তর-রোডেশিয়া, দক্ষিণ-রোডেশিয়া বা নিয়াসাল্যাণ্ড কোনটিই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আস্থাবান নহে। কিন্তু এইসকল অঞ্চলে

শ্বেতকায়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিল। যাহা হউক, এইসকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করিলে ব্রিটেন মঙ্কটন কমিশন (Monkton Commission) নামে একটি কমিশনের উপর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ভার ন্যস্ত করে। মঙ্কটন কমিশন উত্তর-রোডেশিয়া, দক্ষিণ-রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সুপারিশ করিলেন।

রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র

কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র-নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে সেই সুপারিশও করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা রোডেশিয়া কিংবা নিয়াসাল্যাণ্ড-এর নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় নিয়াসাল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ফলে নানাপ্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্য এই অঞ্চলে চলিতেছে।

রোডেশিয়া-নিয়াসাল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-স্পৃহা

ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা (The French North Africa) আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া এই তিনটি অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ফরাসী সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মরক্কো ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইয়াছে।

আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া

মরক্কোর স্বাধীনতালাভ

টিউনিশিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। উহার বাণিজ্য বন্দর বিজার্টা কেবল বন্দর হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নহে, নৌঘাঁটি হিসাবেও উহার গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই ফরাসী সরকার টিউনিশিয়ার উপর অধিকার ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে টিউনিশিয়ায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল উহার চাপে ফ্রান্স ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা লাভ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আলজিরিয়ার এক তীব্র বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলিতেছে। ফরাসী পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উপর আলজিরিয়াবাসীরা পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালাইয়া ফরাসী সরকার তথা আলজিরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই মোট ৬০টি আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আলজিরিয়াস্থ ফরাসী বাহিনীর উপর আলজিরিয়ার বিপ্লবিগণ এযাবৎ আক্রমণ চালাইয়া চলিয়াছে। ফরাসী সরকারের আলজিরিয়া নিজ অধিকারে রাখিবার দৃঢ় সংকল্প পক্ষান্তরে আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আলজিরিয়াকে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা—ফরাসী অধিকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ

আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহ আলজিরিয়ার পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এবং আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বলপূর্বক দমন করিবার জন্য ফরাসী সরকারের অত্যাচারী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানায়। ফরাসী সরকার আলজিরিয়া-সমস্যা, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলিয়া দাবি করিলেন এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর এবিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই—এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দমন-নীতি অপ্রতিহতভাবে চালাইতে লাগিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আলজিরিয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। ইদানীং দ্য গলে আলজিরিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গদের অপসারণের এক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। আলজিরিয়া সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্পর্কে এযাবৎ কোন সুস্পষ্ট কিছু বলা বা করা সম্ভব হয় নাই।

আলজিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি

---

# সপ্তদশ অধ্যায়

## সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

## ( The United Nations )

**সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর উৎপত্তি ( Origin of the United Nations ) ঃ** প্রত্যেক যুদ্ধেরই হত্যালীলা ও বীভৎসতা, ক্লান্তি ও হতাশা মানুষকে অন্তত সাময়িকভাবে শান্তিকামী করিয়া তোলে। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই মানুষ আবার রণমদে মত্ত হইয়া উঠে, এই কারণেই মানবজাতির ইতিহাসের শুরু হইতে এযাবৎ মানুষ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করাই মানবজাতির সর্বাধিক জটিল সমস্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুঝিবার পর ইওরোপীয় দেশগুলি যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অর্থ ও লোকবলহীন হইয়া পড়িয়াছিল তখনও আন্তর্জাতিক শান্তির এক ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার ফলেই ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ( Concert of Europe )-এর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখাই ছিল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি বলিতে অবশ্য ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের শান্তি বুঝাইত। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রায় চল্লিশ বৎসর দমনমূলক নীতির মাধ্যমে ইওরোপকে ব্যাপক যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ ত্যাগের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টধর্মের মূল-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত 'পবিত্রচুক্তি' বা Holy Alliance-এর মাধ্যমে ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি হাস্যাস্পদই হইয়াছিলেন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিবর্গ জার প্রথম

যুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলার ফলে শান্তির স্পৃহা

ইওরোপীয় কন্‌সার্ট

পবিত্রচুক্তি

আলেকজাণ্ডারের মন রক্ষার জন্যই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নহে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলা যেমন পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তির স্পৃহাও তেমনি ব্যাপক-ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই শান্তির স্পৃহা 'লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় রূপলাভ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-ই সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিকতা যে ইওরোপ মহাদেশ ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছিল তাহা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর গঠন-পদ্ধতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে সমর্থ হইল না। ফলে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগকে শান্তির যুগ না বলিয়া যুদ্ধ বিরতির যুগ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক হইবে না। প্রথম যুদ্ধের বীভৎসতার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও মারণ ক্ষমতা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় এবং অগণিত সামরিক ও বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। নিশ্চিত এবং সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও শান্তি এই দুই পন্থার একটি মানবজাতিকে বাছিয়া লইতে হইবে। এই কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর 'আটলান্টিক চার্টার' (Atlantic Charter) নামে একটি সনন্দ প্রচার করেন। পর বৎসর (১৯৪২) জানুয়ারি মাসে এই সনন্দটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা—ব্যাপক শান্তি-স্পৃহা

আটলান্টিক চার্টার

গৃহীত হয়। এই সনন্দের মোট আটটি ধারায় কতকগুলি নীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, যথা: (১) কোন রাষ্ট্র কোনপ্রকার বিস্তারনীতি অনুসরণ করিবে না; (২) পররাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণে আটলান্টিক চার্টার-এ স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের মতামত না লইয়া কিছু করিবে না; (৩) পরাধীন জাতিমাত্রেরই স্বাধীনতালাভের অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের নিজস্ব ইচ্ছামত শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার অধিকার আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রেই স্বীকার করিবে। (৪) ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অপরাপর অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিজিত-বিজেতা সকল রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইবে; (৫) সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর সহযোগিতা ও সমবায়-নীতি অনুসরণ করিবে; (৬) নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের পর প্রত্যেক রাষ্ট্রই যাহাতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয়, অভাব-অনটন প্রভৃতি হইতে মুক্ত থাকিয়া উন্নততর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে সেরূপ পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিতে সকলে সচেষ্ট থাকিবে; (৭) সমুদ্রপথ সকল রাষ্ট্রের নিকটই সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে; (৮) সকল রাষ্ট্রই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, নৌ, বিমান ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইবে।

আটলান্টিক চার্টারের শর্তাদি

আটলান্টিক চার্টার প্রথমে ২৬টি দেশ এবং পরে আরও ২৯টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই মোট ৫৫টি স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম ছিল ভারত। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ লইয়াই ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াল্টা নামক স্থানে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট্, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী স্টালিন এক কন্ফারেন্সে সমবেত হইয়া আমেরিকার সান্ফ্রান্সিস্কো শহরে সম্মিলিত জাতিসমূহ বা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর এক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন

৫৫টি দেশ কর্তৃক আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত

ইয়াল্টা কন্ফারেন্স

পর্যন্ত সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর অধিবেশন চলিল। সেই অধিবেশনে ইউনাইটেড ন্যাশনস্‌-এর চার্টার পঞ্চান্নটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই সনন্দ বা চার্টার স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ প্রকৃত কার্যকরী রূপলাভ করিল। এই চার্টারের শর্তাদি হইতে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। মোট ১১১টি ধারাসম্বলিত এই চার্টার বা সনন্দে চারিটি মৌলিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা: আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান করা ও শান্তি বজায় রাখা; প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপন করা; পৃথিবীর বিভিন্নাংশের মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা স্থাপন করা; এবং মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিয়া পৃথিবীর মানুষমাত্রকেই প্রকৃত মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা দান করা। এই সকল মৌলিক উদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার পন্থা হিসাবে জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিকেই 'জাতির মর্যাদা' দানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, আইন-কানুন মানিয়া চলা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইবার নীতি এবং ইউ-নাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর মূল-নীতি ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌কে সাহায্যদানের কর্তব্য স্বীকৃত হইল। অপর কোন রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘন না-করা অথবা কোন রাষ্ট্রের উপর বলপ্রয়োগ না-করা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা—প্রভৃতি নীতিও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ মানিয়া লইল।

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ চার্টার
United Nations Charter)

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ

উপরে বলা হইয়াছে যে, মোট পঞ্চান্নটি দেশ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই ৫৫টি 'Charter Members' ভিন্ন অপরাপর রাষ্ট্রকেও সদস্যপদভুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের (Security Council) সুপারিশক্রমে

সাধারণ সভার (General Assembly) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সমর্থিত হইলে যে-কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা চলিবে। কিন্তু ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রমাত্রকেই 'শান্তিপ্রিয়' (Peace-loving) হইতে হইবে এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট নীতি মানিয়া চলিতে এবং সেজন্য যথাযথ দায়িত্বপালনে রাজী হইতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যবর্গের প্রধান পাঁচজনের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কুয়োমিংতাং-এর প্রতিনিধিবর্গ) প্রত্যেকেরই 'ভিটো' (Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে অর্থাৎ এই পাঁচজনের যে-কোন কেহ 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া কাউন্সিলের বিবেচনাধীন যে-কোন বিষয়কে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ফলে, এই পাঁচজনের মতৈক্য না থাকিলে কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কমিউনিস্ট চীনের সদস্যপদভুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসম্মতি বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

নূতন সদস্যভুক্তির শর্ত ও পদ্ধতি

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এগুলির অধীনে আবার নানাপ্রকার শাখা, উপ-শাখা আছে। প্রধান ছয়টি সংস্থা হইল: (১) সাধারণ সভা (General Assembly)। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যমাত্রেই এই সভার সদস্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে মোট পাঁচজন সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একাধিক ভোট থাকিবে না। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আহূত হইবে। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট যাবতীয় বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ সভায় করা চলিবে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যে-কোন সদস্য বা সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রতিনিধিও আলোচনা করিতে পারেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council)-এর অস্থায়ী সদস্য এবং অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)-এর

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সংগঠন

(১) সাধারণ সভা (General Assembly)

অধিকার ও ক্ষমতা

সকল সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের ন্যায় ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা একটি পরিদর্শক, সমালোচক ও আলোচনা সভা।* তবে আইনসভার নিম্নকক্ষের মত ক্ষমতা ইহার নাই।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council) ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্যনির্বাহক সমিতিস্বরূপ। পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও কুয়োমিংতাং চীন হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। অপর ছয়টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি করিয়া প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই সকল অস্থায়ী রসদস্য াষ্ট্রের কার্যকাল দুই বৎসর মাত্র। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের কোনটির সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে সেই সম্পর্কে আলোচনায় ভোটদানের অধিকার উহার থাকিবে না। নিরাপত্তা পরি-

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council)

পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রই 'বড় পাঁচজন' (The Big Five) নামে অভিহিত। এই সকল স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। ভিটো প্রয়োগ দ্বারা ইহাদের যে-কোনটি সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে-কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

'The Big Five'

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষাই হইল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব।† আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইতে পারে এরূপ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার এই পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে বর্ণিত উপায়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইবে। এই পরিষদ প্রয়োজনবোধে সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন অপরাপর যে-কোন প্রকার সাহায্য দান করিবে।

নিরাপত্তা পরিষদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

---

* 'a deliberative organ, an overseeing, reviewing and criticizing organ'. Vide Langsam, P. 701.

† 'To the Security Council was entrusted "Primary responsibility for the maintenance of international peace and security." *Ibid*, P. 701.

ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সিকিউরিটি কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারে। এ বিষয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে Military Staff Commitee-র পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টার অনুযায়ী যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠন করিতে পারিবে।

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Organisation)

(৩) সদস্য রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে, পরস্পর সৌহার্দ্য ও সমবায়ের উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবসান, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব-অধিকার' (Human Rights) সমূহ কার্যকরী করিবার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। মোট আঠার জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। খাদ্য ও কৃষি পরিষদ (Food and Agriculture Organizatino : FAO), আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund : IMF), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organization : ILO), ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) প্রভৃতি সংস্থা ও পরিষদ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

(৪) অছি পরিষদ বা Trusteeship Council ম্যাণ্ডেট্ রাজ্যসমূহের এবং যে-সকল অঞ্চল উহার অধীনে স্থাপন করা হইবে সেগুলির শাসন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি, ক্যামেরুন্স্, টোগোল্যাণ্ড, পশ্চিম সেমোয়া প্রভৃতি অঞ্চল অছি পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)-এর উপর আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক অধিকার, বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আইনগত বিবাদ প্রভৃতির বিচারের ভার ন্যস্ত। মোট পনর জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত।

কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্য রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য।

(৬) ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর একটি দপ্তর (Secretariat) আছে। এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারী এই দপ্তরের কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড় ন্যাশন্স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল ইউনাইটেড ন্যাশন্সের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকরী করিয়া থাকেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে জেনারেল এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারি-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এরূপ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারি-জেনারেল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। বৎসরে একবার করিয়া তিনি বাৎসরিক কার্যবিবরণী সাধারণ সভা বা জেনারেল এ্যাসেম্বলীর নিকট পেশ করিয়া থাকেন।

ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর দপ্তর (U.N. Secretariat)

সেক্রেটারি-জেনারেল (Secretary-General)

**ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কার্যাদি (Functions of the United Nations):** ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে গিয়া স্বভাবতই ইউনাইটেড ন্যাশন্স্কে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্যের মধ্যে প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীকে মুক্ত রাখিবার জন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ রাষ্ট্রবর্গের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ কাজ করে। যুদ্ধরত রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটানও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর অন্যতম কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তন যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে করা যাইতে পারে সেজন্য সাহায্য করাও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কর্তব্য। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সেগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রমাত্রেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসাধন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে

ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কর্তব্য কার্যাদি

মানুষমাত্রকেই মানুষের অধিকারে স্থাপন করিবার চেষ্টা, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করাও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কর্তব্য-কার্যের অন্যতম। চতুর্থত, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহ-অবস্থানের মনোভাব জাগাইয়া তোলা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর দায়িত্ব।

এই সকল কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ গত ১৬ বৎসর যাবৎ কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর কার্যকলাপ যদিও পূর্ণমাত্রায় সন্তোষজনক বলা যায় না, তথাপি উহার কার্যাদি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহু বিপদ দূর করিতে এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। (১) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ জানুয়ারি) ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পরস্পর চুক্তি অনুযায়ী রুশ সৈন্য ইরাণে মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানেও সেই সৈন্য অপসারিত না হওয়ায় ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে শেষ পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে এই বিবাদের অবসান ঘটে। ফলে সোভিয়েত সৈন্যও ইরাণ হইতে অপসরণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরাণের অভিযোগ

(২) সিরিয়া ও লেবাননে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। সেই সৈন্য অপসারণের জন্য সিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট আবেদন করিলে ইউ-নাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য শীঘ্রই অপসারিত হউক সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয় নিজ নিজ সৈন্য অপসারণ করিয়া লইলেন।

সিরিয়া ও লেবানন

(৩) রাশিয়া ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের পরোক্ষ পন্থাস্বরূপ। কিন্তু গ্রীক সরকারকর্তৃক আহূত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইলে এবিষয়ে আর কোন কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করা হইল না।

গ্রীস

(৪) চেকোস্লোভাকিয়ার বিপ্লবের ফলে সরকার পরিবর্তিত হইলে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশ কমিউনিস্টগণ নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার প্রতিকারকল্পে চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর নিকট অভিযোগ করে। সিকিউরিটি কাউন্সিল এবিষয়ে তদন্ত করিতে চাহিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাধাদানের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না।

চেকোস্লোভাকিয়া

(৫) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ওলন্দাজ সরকার শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লইয়া এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকরী রহিল না। ওলন্দাজ সরকার সামরিক সাহায্য লইয়া ইন্দোনেশীয়দের দমন করিতে চাহিলেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল উভয়পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু এই আদেশ কোন পক্ষই মানিল না। সিকিউরিটি কাউন্সিল তিনজন সদস্যের এক কমিটির উপর ইন্দোনেশিয়ার গোলযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভার অর্পণ করিল। এই কমিটি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে সম্মত করাইলে কিছু কাল ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু ওলন্দাজবাহিনী আকস্মিকভাবে ইন্দোনেশীয় নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণও বাদ পড়িলেন না। এমতাবস্থায় সিকিউরিটি কাউন্সিল ওলন্দাজ সরকারকে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত করাইলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইল।

ইন্দোনেশিয়া

(৬) কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দান করিয়া শেষপর্যন্ত পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে উহা হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে নাই। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ ন্যায্য-নীতি অনুসরণ করিয়াছে একথা বলা যায় না।

কাশ্মীর

(৭) কোরিয়ার যুদ্ধ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ (Korean War & the U. N.): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক দশক পূর্ব হইতে কোরিয়া জাপানের অধীন ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো কন্‌ফারেন্সে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন স্থির করে যে, কোরিয়াকে জাপানের অধিকারমুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সোভিয়েত রাশিয়া যখন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কায়রো কন্‌ফারেন্স-এর সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সরকারও মানিয়া লইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্থির হইল যে, কোরিয়ার উত্তরাংশ অর্থাৎ ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার উত্তরের অংশ রাশিয়ার নিকট এবং উহার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ফলে, যুদ্ধাবসানে কোরিয়া দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক এই দুই অংশের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা চলিল। কিন্তু সেই বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারার ফলে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর নিকট পেশ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর জেনারেল:এ্যাসেম্বলী একটি কমিশনের তত্ত্বধানে সমগ্র কোরিয়ার এক নির্বাচনের মাধ্যমে কোরিয়ার সরকার গঠন করিবার এবং সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ প্রস্তাব করিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিশনের উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিল। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিশন কেবলমাত্র দক্ষিণ-কোরিয়ারই নির্বাচন সম্পন্ন করিল এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণ-কোরিয়াকে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত করা হইল। নবগঠিত দক্ষিণ-কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন সিঙ্‌ম্যান রী। উহার রাজধানী হইল সিওল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর কোরিয়ার 'গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democratic People's

কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়ার উত্তরাংশের রাশিয়ার এবং দক্ষিণাংশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ

কোরিয়ার ঐক্য সমস্যা

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঐক্যের প্রস্তাব—রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য

কোরিয়ার যুদ্ধ
সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভ্লাডিভস্টক
মা ঞ্চু রি য়া
মুকডেন
টাংহোয়া
সিনুইজু
উঃ কোরিয়া
হাংনাম
সিনানজু
পাইয়োংগাং
জাপান—সাগর
৩৮°
পানমুনজম
ইনচন
সিওল
দঃ কোরিয়া
তেইজন
পোহাং
কুসান
তেইগু
মাসান
চিনজু
পুসান
জা পা ন

Republic) নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করিল। এইভাবে কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যুদ্ধের হুমকি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিল।

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পৃথক শ।সনব্যবস্থা

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ উত্তর-কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশসম্বলিত এক প্রস্তাব পাস করিল এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্য সাহায্য দানের অনুরোধ জানাইল। কিন্তু উত্তর-কোরিয়ার সেনাবাহিনী সহজেই দক্ষিণ-কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ও সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে এবং শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রেরণের নির্দেশ দিলে মোট ষোলটি দেশ কোন-না-কোন প্রকার সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে আগত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু কমিউনিস্ট্ চীন উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। জেনারেল এ্যাসেম্ব্লী চীন দেশকে 'আক্রমণকারী' দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীন দেশে কোনপ্রকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ নিষিদ্ধ করিল। রাশিয়া অবশ্য উত্তর-কোরিয়াকে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করিতে দ্বিধা করিল না। যাহা হউক, দুই বৎসর যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক লোকক্ষয় ও নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা ঘটিলে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চলিল। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিঙ্গ্‌ম্যান রী সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য এবং কমিউনিস্ট্-বিরোধী সরকার গঠনসম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া অস্ত্রত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে

উত্তর-কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়াকে সাহায্য দান

উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীন দেশের যুদ্ধে যোগদান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং কমিউনিস্ট্ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে সিঙ্‌ম্যান রী যুদ্ধত্যাগে রাজী হইলেন।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি

উত্তর-কোরিয়া কমিউনিস্ট্ চীন ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর মধ্যে ৫৭৫টি বৈঠকের পর পানমুন্‌জন নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার লাইন ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজ্যসীমা বিভক্ত হইল। উভয় পক্ষ যুদ্ধ-বন্দীদের ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৬০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে স্থির হইল। ভারতের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দীবিনিময়ের ভার ন্যস্ত হইল। এই কমিশনের সদস্য ছিল পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া। এই কমিশনের কার্যাদি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরস্পর বিবাদের ফলে অত্যধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় এবং অপরাপর প্রতিনিধিবর্গের ধৈর্য এবং উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত বন্দী-বিনিময়ের কঠিন দায়িত্ব পালন সম্ভব হইয়াছিল।

বন্দীবিনিময় সমস্যা

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের কন্‌ফারেন্সে কোরিয়ার সমস্যা সমাধান এবং বিদেশী সৈন্যের অপসারণের প্রশ্নের মীমাংসা হইবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই কন্‌ফারেন্স জেনিভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে কোরিয়ার ঐক্যের প্রশ্নের কোন সমাধান করা সম্ভব হইল না।

জেনিভা কনফারেন্স —কোরিয়ার সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা

**ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্যকারিতা (Usefulness of the U. N.):** আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান জগতে যে খুব বেশি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবী যখন সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা শান্তি ও নিরাপত্তা—এই দুই বিকল্প পন্থার সম্মুখীন তখন ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের হস্তে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা দান করিয়া এবং অপরাপর

বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য

রাষ্ট্রবর্গকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমাত্রেরই সমতার নীতির বিরোধিতা করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রের আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও কুয়োমিংতাং চীন-হস্তে 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া এই কয়েকটি রাষ্ট্রের কোন একটির অমতে কোন সুযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যমাত্রেই সার্বভৌম এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন—এই নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কোন দেশের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইতে পারে না। তদুপরি ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ ত্যাগ করিয়া যাইবার পক্ষেও কোন বাধা নাই। এই সকল কারণে এবং সর্বোপরি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত বিভেদ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ইহাকে দৃঢ়তর করিবার মধ্যেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় নিহিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্যকলাপে ত্রুটি থাকিলেও মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ভিটো ক্ষমতা

সমালোচনা

**লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ (The League of Nations & the U. N.):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর মধ্যে কতক পার্থক্য থাকিলেও এই দুই-ই একই ধরণের পরিস্থিতি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উভয়েরই সংগঠন, দোষ-ত্রুটি প্রভৃতির মধ্যে কতক কতক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এজন্য ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এরই অনুকরণ মাত্র।

সামঞ্জস্য ও পার্থক্য দুই-ই বিদ্যমান

সামঞ্জস্যের দিক দিয়া বিচার করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তেমনি ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তি-

সামঞ্জস্য :

উৎপত্তি

বর্গের প্রাধান্য রহিয়াছে। বস্তুত, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ উভয়ই বিজয়ী শক্তিবর্গের সমিতিস্বরূপ।

সংগঠন

সংগঠনের দিক দিয়াও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ সভা, কাউন্সিল, দপ্তর, আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি মোটামুটি এক ধরণের।

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান ব্যাপারে অনুরোধ-উপরোধ, আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতার গুরুত্ব লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ উভয়ই স্বীকার করিয়াছে।

Trusteeship System and Mandate System

ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর Trusteeship System লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর ম্যাণ্ডেট পদ্ধতিরই অনুরূপ।

মূল আদর্শ

মূল আদর্শ—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-বজায় রাখা লীগ এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ উভয়েরই সমান।

পার্থক্য

উপরি-উক্ত সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মধ্যে নানাবিষয়ে পার্থক্য আছে। এইসকল পার্থক্যের কতকগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, আবার কতক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ হইতে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর অপকর্ষতা সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

(১) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র ( Covenant ) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ফলে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও পবিত্রতা স্বভাবতই বিনষ্ট হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার কোন শান্তি-চুক্তির অংশ নহে। ইহা পৃথকভাবে রচিত ও গৃহীত। ফলে, শান্তি-চুক্তিসমূহের সহিত ইহার স্থায়িত্ব বা অ-স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নহে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ধরণের আন্তর্জাতিক সংস্থার

প্রয়োজনের স্বীকৃতি হিসাবেই ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ গঠিত। (২) ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্যাদি বিভিন্ন সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকায় উহার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার এরূপ অকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হয় নাই। (৩) লীগ-অব-ন্যাশন্স্ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে গঠিত হইলেও কোন একই সময়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ উহার সদস্যপদভুক্ত ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে নাই। রাশিয়াকে উহাতে দীর্ঘকাল স্থান দেওয়া হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ একমাত্র কমিউনিস্ট্ চীন ভিন্ন পৃথিবীর সকল বৃহৎ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হইতেই ইহার সদস্যপদ-ভূক্তি ইউনাটেড ন্যাশন্স্-এর মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। (৪) ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে পৃথিবীর 'মানবগোষ্ঠী'র উন্নতিসাধনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহা অধিকতর গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জন-সাধারণের সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকিলেও লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্রে যেমন বিভিন্ন 'সরকারের' উন্নতিসাধনের কথা উল্লিখিত আছে, সেরূপ কোন উল্লেখ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে না থাকায় উহার প্রতি পৃথিবীর জনসাধারণের শ্রদ্ধা স্বভাবতই জাগিবার সুযোগ রহিয়াছে। (৫) ইউ-নাইটেড ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা ও অপরাপর সভা-সমিতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য দান করিয়া দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নীতি লীগের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল। (৬) লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর যুদ্ধ-নিরোধ-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং সদস্য রাষ্ট্রবর্গের এবিষয়ে দায়িত্ব বহুগুণে বেশি। (৭) সর্বশেষে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে যুগ্ম নিরাপত্তা নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ভীতির সৃষ্টি হইলেই ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ হস্তক্ষেপ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্ কেবলমাত্র আক্রমণের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপের অধিকার-

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর উৎকর্ষতা

প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপরও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন বিষয়ে লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর অপকর্ষতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। (১) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের দায়িত্ব যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত সেরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টারে নাই। (২) আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ তথা উহার সদস্য রাষ্ট্রের কোন কিছু করিবার নাই। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক বা না হউক, অর্থনৈতিক অবরোধ সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবার দায়িত্ব লীগের তথা সদস্য রাষ্ট্রবর্গের ছিল।

লীগের তুলনায় ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর অপকর্ষতা

নীতির দিক দিয়াও লীগ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কতক পার্থক্য আছে। লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর রচয়িতাগণ নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক দুর্বলতার কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। শান্তি-রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের অপরিহার্যতা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ স্বীকৃত নহে।

নীতিগত পার্থক্য

মানুষকে মানুষের অধিকারে স্থাপনের প্রয়াসও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এ ছিল না। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ স্বীকৃত 'মানব-অধিকার' (Human Rights) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত পার্থক্যসত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ মূলত একই ধরণের প্রতিষ্ঠান। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কার্য, ক্ষমতা, আদর্শ, গঠনতন্ত্রের অনেক কিছুতেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

**নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা ( Problem of Disarmament ) :** বিজ্ঞানের অবদানকে যুদ্ধের কাজে খাটাইতে গিয়া আজ সমগ্র পৃথিবী এ্যাটম্‌ ও

হাইড্রোজেন বোমার তেজস্ক্রিয়তার কুফলে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব, পরস্পর অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ আজ সমগ্র পৃথিবীকেই যেন এক বিরাট যুদ্ধ শিবিরে পরিণত করিয়াছে। যে-কোন কারণে যুদ্ধের চাপের ( War tension ) সৃষ্টি হইতেছে। পৃথিবী আজ পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকে বিভক্ত। এই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীকে রক্ষা করিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রয়োজনীয়তা এই কারণেই সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর চুক্তিপত্রে যেমন নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-রক্ষার অপরিহার্য উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছিল সেরূপ কোন নীতি ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বরঞ্চ প্রত্যেক রাষ্ট্রই সামরিক শক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি অর্জনে মনোনিবেশ করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের পরস্পর সন্দেহ, বিবাদ-বিসংবাদ সামরিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীকে সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের ফলে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বীকার করিতেছে। পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবধর্মিগণ আণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণ-ই পৃথিবীর নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ও আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Atomic Energy Commission নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিকভাবে আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এবিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মতানৈক্যের

Atomic Energy Commission

ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Atomic Energy Commission উহার কার্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া কর্তৃক আণবিক বোমা প্রস্তুত পরিস্থিতির জটিলতা আরও বৃদ্ধি হয়। ফলে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক আণবিক শক্তি ব্যবহার

নিয়ন্ত্রণের একটি প্রস্তাব করে ( Acheson Formula )। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ পৃথিবীর যাবতীয় আণবিক শক্তির এবং মোট সংখ্যক আণবিক বোমার হিসাব প্রস্তুত করিবে ; ইউনাইডেট ন্যাশন্‌স্ প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তির পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি না করা হয় এবং প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি কতদূর তাহা নির্ধারণের জন্য ইন্‌স্‌পেক্টর নিয়োগ করিবে ; বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তির আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অতিরিক্ত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাসের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত আছে কিনা দেখিবার অন্য পরিদর্শন-কার্য সর্বদা চালু রাখিবে। সোভিয়েত রাশিয়া এই প্রস্তাবকে হাস্যকর, অবাস্তব প্রস্তাব বলিয়া অভিহিত করিলে স্বভাবতই উহা গৃহীত হইল না। ফলে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা অপ্রতিহতভাবেই চলিতে লাগিল। যাহা হউক ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ Disarmament Commission নামে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন নিয়োগ করিল।

মার্কিন প্রস্তাব —Acheson Formula

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা ( Atom for peace ) আণবিক শক্তিহ্রাসের কোন নূতন পন্থা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইল না, কারণ আণবিক বোমা নিষিদ্ধ-করণের প্রয়োজন এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় নাই। আণবিক বোমা প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা অসম্ভব এবং নিছক প্রচারকার্য বলিয়াই রাশিয়া ধরিয়া লইল। এইভাবে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কোন সমাধান সম্ভব হইল না। যাহা হউক এবিষয়ে উভয়পক্ষ অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা নানা প্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে থাকিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-নীতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। এমন-কি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি হ্রাসের প্রস্তাবও উত্থাপন করিল। কিন্তু রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের ফলে এবিষয়ে কার্যকরী কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এইভাবে কোন পক্ষের প্রস্তাবই যখন অপর পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, তখন রাশিয়া

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা

সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ( nuclear test ) বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিল। ১৯৫৭ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে কিন্তু আণবিক বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনও নিষিদ্ধ করা হউক সেই প্রস্তাব করিল। রাশিয়া এই পাল্টা প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইলে এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় রাশিয়া একক-ভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিতে রাজী হইল না ( ১৯৫৮ )। ফলে রাশিয়া অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিল। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও অনুরূপ ঘোষণা করিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে এই দুই দেশ স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু বার্লিন সমস্যা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপ বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া পুনরায় আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়া মেগাটোন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শুরু করিয়াছে। এই বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং মানুষের স্বাস্থ্যহানি হইবে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, এই ধরণের বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল মানুষের মন এবং দেহ উভয়ই বিষাইয়া তুলিবে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণের একমাত্র জবাব হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ বিস্ফোরণ শুরু করা।

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব

রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সাময়িক বিরতি

রাশিয়া কর্তৃক মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা এক অত্যধিক জটিল সমস্যা। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মানসিক পরিবর্তন না ঘটিলে এবং জগতের জনসাধারণের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ না জন্মিলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ তথা শান্তি সুদূর পরাহত

## APPENDIX A

### COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS

With Amendments

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

In order to promote international cooperation and to achieve international peace and security

by the acceptance of obligations not to resort to war,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

by the firm establishment of the understanding of international law as the actual rule of conduct among Governments, and

by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another,

agree to this Covenant of the League of Nations.

*Article 1*

*Membership and Withdrawal*

1. The original members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annex to this Covenant and also such of those other States named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant. Such accessions shall be effected by a declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to all other Members of the League.

2. Any fully self-governing State, Dominion or Colony not named in the Annex may become a Member of the League if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, as provided that it shall give effective guarantees of its sincere intention to observe its international obligations, and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and air forces and armaments.

3. Any Member of the League may, after two years notice of its intention so to do, withdraw from the League, provided that all its international obligations and all its obligations under this Covenant shall have been fulfilled at the time of its withdrawal.

*Article 2*

*Executive Organs*

The action of the League under this Covenant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, with a permanent Secretariat.

*Article 3*

*Assembly*

1. The Assembly shall consist of representatives of the Members of the League.

2. The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time, as occasion may require, at the Seat of the League or at such other place as may be decided upon.

3. The Assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

4. At meetings of the Assembly each Member of the League shall have one vote and may have not more than three Representatives.

*Article 4*

*Council*

1. The Council shall consist of representatives of the Principal Allied and Associated Powers [the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan], together with Representatives of four other Members of the League. These four Members of the League shall be selected by the Assembly from time to time in its discretion. Until the appointment of the Representatives of the four Members of the League first selected by the Assembly, Representatives of Belgium, Brazil, Greece and Spain shall be Members of the Council.

2. With the approval of the majority of the Assembly, the Council may name additional Members of the League, whose Representatives shall always be Members of the Council; the Council with like approval may increase the number of Members of the League to be selected by the Assembly for representation on the Council.

*2. bis. The Assembly shall fix by a two-thirds' majority the rules dealing with the election of the non-permanent Members of the Council and particularly such regulations as relate to their term of office and the conditions of re-eligibility.*

3. The Council shall meet from time to time as occasion may require, and at least once a year, at the Seat of the League or at such other place as may be decided upon.

4. The Council may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

5. Any Member of the League not represented on the Council shall be invited to send a Representative to sit as a member at any meeting of the Council during the consideration of matters specially affecting the interests of that Member of the League.

6. At meetings of the Council each Member of the League represented on the Council shall have one vote, and may have more than one Representative.

*Article 5*

*Voting and Procedure*

1. Except where otherwise expressly provided in this Covenant or by the terms of the present Treaty, decisions at any meeting of the Assembly or of the Council shall require the agreement of all the Members of the League represented at the meeting.

2. All matters of procedure at meetings of the Assembly or of the Council, including the appointment of Committees to investigate particular matters, shall be regulated by the Assembly or by the Council and may be decided by a majority of the Members of the League represented at the meeting.

3. The first meeting of the Assembly and the first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United States of America.

*Article 6*

*Secretariat and Expenses*

1. The permanent Secretariat shall be established at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such secretaries and staff as may be required.

2. The first Secretary-General shall be the person named in the Annex; thereafter the Secretary-General shall be appointed by the Council with the approval of the majority of the Assembly.

3. The secretaries and the staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary-General with the approval of the Council.

4. The Secretary-General shall act in that capacity at all meetings of the Assembly and of the Council.

5. *The expenses of the League shall be borne by the Members of the proportion decided by the Assembly.*

*Article 7*

*Seat, Qualifications of Officials, Immunities*

1. The Seat of the League is established at Geneva.

2. The Council may at any time decide that the Seat of the League shall be established elsewhere.

3. All positions under or in connection with the League, including the Secretariat, shall be open equally to men and women.

4. Representatives of the Members of the League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

5. The buildings and other property occupied by the League or its official or by Representatives attending its meetings shall be inviolable.

*Article 8*

*Reduction of Armaments*

1. The Members of the League recognize that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations.

2. The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for the consideration and action of the several Governments.

3. Such plans shall be subject to reconsideration and revision at least every 10 years.

4. After these plans shall have been adopted by the several Governments, the limits of armaments therein fixed shall not be exceeded without the concurrence of the Council.

5. The Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of munitions and implements of war is open to grave objections. The Council shall advise how the evil effects attendant upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the necessities of those Members of the League which are not able to manufacture the munitions and implements of war necessary for their safety.

6. The Members of the League undertake to interchange full and frank information as to the scale of their armaments, their military, naval and air programs and the condition of such of their industries as are adaptable to warlike purpose.

*Article 9*

*Permanent Military, Naval and Air Commission*

A permanent Commission shall be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and on military. naval and air questions generally.

*Article 10*

*Guarantees against Aggression*

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

*Article 11*

*Action in Case of War or Threat of War*

1. Any war or threat ot war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In case any such emergency should arise the Secretary-General shall on the request of any Member of the League forthwith summon a meeting of the Council.

2. It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting international relations which threatens to disturb international peace or the good understanding between nations upon which peace depends.

*Article 12*

*Disputes to be Submitted for Settlement*

1. The Members of the League agree that, if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to arbitration *or judicial settlement* or to enquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators *or the judicial decision*, or the report by the Council.

2. In any case under this Article the award of the arbitrators *or the judicial decision* shall be made within a reasonable time and the report of the Council shall be made within six months after the submission of the dispute.

*Article 13*

*Arbitration or Judicial Settlement*

1. The Members of the League agree that, whenever any dispute shall arise between them which they recognize to be suitable for submission to arbitration *or judicial settlement*, and which cannot be satisfactorily settled by diplomacy, they will submit the whole subject-matter to arbitration *or judicial settlement*.

2. Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law, as to the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of any international obligation, or as to the extent and nature of the reparation to be made for any such breach, are declared to be among those which are generally suitable for submission to arbitration *or judicial settlement.*

3. *For the consideration of any such dispute, the court to which the case is referred shall be the Parmanent Court of International Justice, establish in accordance with Article 14, or any tribunal agreed on by the parties to the dispute or stipulated in any convention existing between them.*

4. The Members of the League agree that they will carry out in full good faith any award or *decision* that may be rendered, and that they will not resort to war against a member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award or *decision*, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto.

*Article 14*

*Permanent Court of International Justice*

The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council of or by the Assembly.

*Article 15*

*Disputes Not Submitted to Arbitration or Judicial Settlement*

1. If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration *or judicial settlement* in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit the

matter to the Council. Any party to the dispute may effect such submission by giving notice of the existence of the dispute to the Secratary-General, who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof.

2. For this purpose the parties to the dispute will communicate to the Secretary-General, as promptly as possible statement of their case with all the relevant facts and papers, and the Council may forthwith direct the publication thereof.

3. The Council shall endeavour to effect a settlement of the dispute, and if such efforts are successful, a statement shall be made public giving such facts and explanations regarding the dispute and the terms of settlement thereof as the Council may deem appropriate.

4. If the dispute is not thus settled, the Council either unanimously or by a majority vote shall make and publish a report containing a statement of the facts of the dispute and the recommendations which are deemed just and proper in regard thereto.

5. Any Member of the League represented on the Council may make public a statement of the facts of the dispute and of its conclusions regarding the same.

6. If a report by the Council is unanimously agreed to by the Members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League agree that they will not go to war with any party to the dispute which complies with the recommendations of the report.

7. If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed by the members thereof, other than the Representatives of one more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice.

8. If the dispute between the parties is claimed by one of them, and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law solely within the domestic jurisdiction of the party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its settlement.

9. The Council may in any case under this Article refer the dispute to the Assembly. The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided that such request be made within 14 days after the submission of the dispute to the Council.

10. In any case referred to the Assembly, all the provisions of this Article and of Article 12 relating to the action and powers

of the Council shall apply to the action and powers of the Assembly, provided that a report made by the Assembly, if concurred in by the Representatives of those Members of the League represented on the Council and of a majority of the other Members of the League, exclusive in each case of the Representatives of the parties to the dispute, shall have the same force as a report by the Council concurred in by all the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute.

*Article 16*

*Sanctions of Pacific Settlement*

1. Should any Member of the League resort to war in disregard of the covenants under Articles 12, 13 or 15, it shall *ipso facto* be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the nationals of any other State, whether a Member of the League or not.

2. It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League.

3. The Members of the League agree, further, that they will mutually support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimize the loss and inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resting any special measures, aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through their territory to the forces of any of the Members of the League which are cooperating to protect the covenants of the League.

4. Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League by a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon.

*Article 17*

*Disputes Involving Non-members*

1. In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between the States not Members of the League, the State or States not Members of the League shall be invited to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just. If such invitation is accepted, the provisions of Articles 12 to 16, inclusive, shall be applied with such modifications as may be deemed necessary by the Council.

2. Upon such invitation being given, the Council shall immediately institute an inquiry into the circumstances of the dispute and recommend such action as may seem best and most effectual in the circumstances.

3. If a State so invited shall refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, and shall resort to war against a Member of the League, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such action.

4. If both parties to the dispute when so invited refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, the Council may take such measures and make such recommendations as will prevent hostilities and will result in the settlement of the dispute.

*Article 18*

*Registration and Publication of Treaties*

Every treaty or international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding until so registered.

*Article 19*

*Review of Treaties*

The Assembly may from time to time advise the reconsideration by Members of the League of treaties which have become inapplicable, and the consideration of international conditions whose continuance might endanger the peace of the world.

*Article 20*

*Abrogation of Inconsistent Obligations*

1. The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or under-

standings *inter se* which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hareafter enter into any engagements inconsistent with the terms thereof.

2. In case any Member of the League, shall, before becoming a Member of the League, have undertaken any obligation inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.

*Article 21*

*Engagements that Remain Valid*

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the Mornoe Doctrine, for securing the maintenance of peace.

*Article 22*

*Mandatory System*

1. To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust should be embodied in this Covenant.

2. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

3. The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions and other similar circumstances.

4. Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognized subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

5. Other peoples especially those of Central Africa, are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the prohibition of abuses such as the slave trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of the establishment of fortifications of military and naval bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for the trade and commerce of other Members of the League.

6. There are territories, such as Southwest Africa and certain of the South Pacific islands, which, owing to the sparseness of their population, or their small size, or their remoteness from the centres of civilization, or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances, can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguards above mentioned in the interests of the indigenous population.

7. In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.

8. The degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members of the League, be explicity defined in each case by the Council.

9. A permanent Commission shall be constituted to receive and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating to the observance of the mandates.

*Article 23*

*Social and Other Activities*

Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing or hereafter to be agreed upon the Members of the League :

*a*. will endeavor to secure and maintain fair and humane conditions of labor for men, women and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and industrial relations extend, and for that purpose will establish and maintain the necessary international organizations ;

*b.* undertake to secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control ;

*c.* will entrust the League with the general supervision over the execution of agreements with regard to traffic in women, children, and the traffic in opium and other dangerous drugs ;

*d.* will entrust the League with the general supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which control of this traffic is necessary in the common interest ;

*e.* will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League. In this connection, the special necessities of the regions devastated during the war of 1914-1918 shall be borne in mind ;

*f.* will endeavor to take steps in matters of international concern for the prevention and control of disease.

*Article 24*

*International Bureaus*

1. There shall be placed under the direction of the League all international bureaus already established by general treaties if the parties to such treaties consent. All such international bureaus and all commissions for the regulation of matters of international interest hereafter constituted shall be placed under the direction of the League.

2. In all matters of international interest which are regulated by general conventions but which are not placed under the control of international bureaus or commissions, the Secretariat of the League shall, subject to the consent of the Council and if desired by the parties, collect and distribute all relevant information and shall render any other assistance which may be necessary or desirable.

3. The Council may include as part of the expenses of the Secretariat the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction of the League.

*Article 25*

*Promotion of Red Cross and Health*

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and cooperation of duly authorized voluntary national Red Cross organizations having as purposes the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world.

*Article 26*

*Amendments*

1. Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly.

2. No such amendment shall bind any Member of the League which signifies its dissent therefrom, but in that case it shall cease to be a Member of the League.

## Charter of the United Nations

We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in large freedom,

and for these ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all people,

have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the City of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

## CHAPTER I : PURPOSES AND PRINCIPLES

*Article I*

The purposes of the United Nations are :

1. To maintain international peace and security, and to that end : to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace ;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace ;

3. To achieve international cooperation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, language, or religion ; and

4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

*Article 2*

The Organization and its Members, in pursuit on the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state

against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter ; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII,

## CHAPTER II : MEMBERSHIP

*Article 3*

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

*Article 4*

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter, and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

*Article 5*

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

*Article 6*

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principle contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

## CHAPTER III : ORGANS

*Article 7*

1. There are established as the principal organs of the United Nations : a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.

2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

*Article 8*

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

## CHAPTER IV : THE GENERAL ASSEMBLY

### Composition

*Article 9*

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.

2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

### Functions and Powers

*Article 10*

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter. and, except as provided in Article 12. may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

*Article 11*

1. The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the

Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such questions on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.

3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

*Article 12*

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.

2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the Uuited Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

*Article 13*

1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of :

*a.* promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its condification ;

*b.* promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

2. The further responsibilities, functions, and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (*b*) above are set forth in Chapter IX and X.

*Article 14*

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly

may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

*Article 15*

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council ; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to mantain international peace and security.

2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

*Article 16*

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

*Article 17*

1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.

2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.

3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

**Voting**

*Article 18*

1. Each member of the General Assembly shall have one vote.

2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include : recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of the members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (*c*) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the sus-

pension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

*Article 19*

A member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall not vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribution due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

**Procedure**

*Article 20*

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

*Articles 21*

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

*Article 22*

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V : THE SECURITY COUNCIL

**Composition**

*Article 23*

1. The Securitry Council shall consist of eleven Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect six other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to

the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also two equitable geographical distribution.

2. The non-permanent members of the Security Council, shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members, however, three shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.

3. Each member of the Security Council shall have one representative.

**Functions and Powers**

*Article 24*

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council Primary responsibilityfor the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

*Article 25*

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

*Article 26*

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

**Voting**

*Article 27*

1. Each member of the Security Council shall have one vote.

2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of seven members.

3. Decision of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring vote of the permanent members ; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

**Procedure**

*Article 28*

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.

2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.

3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

*Article 29*

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its fnnctions.

*Article 30*

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

*Article 31*

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

*Article 32*

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of

the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

## CHAPTER VI : PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

*Article 33*

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

*Article 34*

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

*Article 35*

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.

2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.

3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

*Article 36*

1. The Security Council many, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.

3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

*Article 37*

1, Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article they shall refer it to the Security Council.

2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

*Article 38*

Without prejudice to the provisions of Article 33 to 37, the Security Council may, of all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII : ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE AND ACTS OF AGGRESSION

*Article 39*

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

*Article 40*

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

*Article 41*

The Security Council may decide what measures not

involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

*Article 42*

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

*Article 43*

1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

2. Such agreement or agreements shall govern the number and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.

3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

*Article 44*

When the Security Council has decided to use force it shall before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

*Article 45*

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national

air-force contingents for combind international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined, within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

*Article 46*

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

*Article 47*

1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.

2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of Security Council or their representative. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it within the efficient discharge of the Commitee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.

3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.

4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional subcommittees.

*Article 48*

1. The action required to carry out decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.

2. Such decisions shall be carried out by the Members of United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.

*Article 49*

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

*Article 50*

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

*Article 51*

Nothing in the present Charter shall inpair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and seurity. Measures taken by Members in the excercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

## CHAPTER VIII : REGIONAL ARRANGEMENTS

*Article 52*

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencios for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

2. The Members of the United Nations entering into such arrangments or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.

3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.

4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.

*Article 53*

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action

under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arragements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.

2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

*Article 54*

The Security Council shall all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

## CHAPTER IX : INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION

*Article 55*

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and sef-determination of peoples, the United Nations shall promote :

*a*. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development ;

*b*. solutions of international economic, social, health, and related problems ; and international cultural and educational co-operation ; and

*c*. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

*Article 56*

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

*Article 57*

1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsi-

bilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.

2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.

*Article 58*

The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies.

*Article 59*

The Organization shall, where appropriate initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

*Article 60*

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the power set forth in Chapter X.

## CHAPTER X : THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

### Composition

*Article 61*

1. The Economic and Social Council shall consist of eighteen Members of the United Nations elected by the General Assembly.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, six members of the Econmic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

3. At the first election, eighteen members of the Economic and Social Council shall be chosen. The term of office of six members so chosen shall expire at the end of one year, and six other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.

4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

**Functions and Powers**

*Article 62*

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly, to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedoms for all,

3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.

4 It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

*Article 63*

1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by tne General Assembly.

2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

*Article 64*

1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nation and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.

2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

*Article 65*

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

*Article 66*

1. The Economic and Social Council shall perform such functions as felt within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.

2, It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.

3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

**Voting**

*Article 67*

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.

2. Decisions on the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting

**Procedure**

*Article 68*

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rigths, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

*Article 69*

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

*Article 70*

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

*Article 71*

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

*Article 72*

1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure including the method of selecting its President

2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provisions for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

## CHAPTER XI : DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES.

*Article 73*

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end :

*a.* to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political. economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses ;

*b.* to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each terriatory and its peoples and their varying stages of advancement ;

*c.* to further international peace and security ;

*d.* to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article ; and

*e.* to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territorise for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

*Article 74*

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII : INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

*Article 75*

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

*Article 76*

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with lhe purpose of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be :

*a.* to further international peace and security ;

*b.* to promote the political, economic, social and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement ;

*c.* to encourage respect for human right and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the people of the world ; and

*d.* to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

*Article 77*

1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements :

*a* territories now held under mandate ;

*b.* territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War ; and

*c.* territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.

2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

*Article 78*

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

*Article 79*

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

*Article 80*

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Article 77, 79 and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements, have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

*Article 81*

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.

*Article 82*

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part of all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

*Article 83*

1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the Security Council.

2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.

3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social and educational matters in the strategic areas.

*Article 84*

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administerting authority, as well as for local defense and the the maintenance of law and order within the trust territory.

*Article 85*

1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.

2. The Trusteeship Council, operating under the authority of General Assembly, shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

## CHAPTER XIII : THE TRUSTEESHIP COUNCIL

*Article 86*

1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations :

*a.* those Members administering trust territories ;

*b.* such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories ; and

*c.* as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trasteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.

2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

**Functions and Powers**

*Article 87*

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may :

*a.* consider reports submitted by the administering authority ;

*b.* accept petitions and examine them in consultation with the administering authority ;

*c.* provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority ; and

*d.* take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

*Article 88*

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an aunual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

**Voting**

*Article 89*

1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.

2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

**Procedure**

*Article 90*

1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

*Article 91*

The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

## CHAPTER XIV : THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

*Article 92*

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

*Article 93*

1, All Members of the United Nations are *ipso facto* parties to the Statute of the International Court of Justice.

2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

*Article 94*

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.

2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Couucil, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

*Article 95*

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

*Article 96*

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.

2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

## CHAPTER XV : THE SECRETARIAT

*Article 97*

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.

*Article 98*

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council.and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.

*Article 99*

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

*Article 100*

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.

2. Each member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibility of Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

*Article 101*

1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.

2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.

3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be necessary of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

## CHAPTER XVI : MISCELLANEOUS PROVISIONS

*Article 102*

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.

2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

*Article 103*

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

*Article 104*

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

*Article 105*

1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes

2. Representatives of the Members of the United Natious and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.

## CHAPTER XVII : TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

*Article 106*

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, October 30, 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

*Article 107*

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Government having responsibility for such action.

## CHAPTER XVIII : AMENDMENTS

*Article 108*

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective oonstitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

*Article 109*

1. A General Conferenoe of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.

2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.

3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming

into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

### CHAPTER XIX : RATIFICATION AND SIGNATURE

*Article 110*

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

2. The ratification shall be deposited with the Government of the United States of America, which, shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.

3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratification deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.

4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

*Article 111*

The present Charter, of which the Chinese. French, Russian English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Government of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the City of San Francisco the twenty sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

———

## Appendix—B

MODEL QUESTIONS

1. What is the relation between the individual and internationalism ?

2. Discuss the nature of the present International problems.

3. Review the clauses of the Treaty of Versailles. How far will it be true to say that the Treaty of Versailles contained the germs of the Second World War ?

4. What were the deviations of Treaty of Versailles from Wilsonian Principles ?

5. What was the problem of German reparation ? How did Germany try to solve it ?

6. Describe the origin, organisation and the activities of the League of Nations. What part did it play to preserve internal peace and security between the two world wars ?

7. Was the League of Nations a success ? Give concrete example to substantiate your answer (C. U. M. A. Pol. Sc. 1959)

Or

"The League of Nations was the great constructive idea of the Paris Peace Conference, fully international in spirit and capable of becoming a magnificent instrument of peace in the hands of the members determined to use it disinterestedly." Discuss, and explain the causes of the League's failure to live upto the expectations. (C. U. M. A. Pol. Sc. 1950)

Or

'The League of Nations could be a magnificent instrument of peace if only its members were interested in making it so' Elucidate this statement. (C- U. Pol. Sc. 1953)

8. Explain the main social and political factors that led to the establishment of the League of Nations. What in your opinion, were the main causes of the failure of the League ? (C. U. Pol. Sc. 1957)

9. Examine briefly the steps that were taken to guarantee peace and security in the period between the First and the Second World Wars. (C. U. Pol. Sc. 1960)

10. Write notes on :—(a) Geneva Protocol, (b) Locarno Pact.

11. Discuss the problem of disarmament after the First World War.

Or

Discuss the correlation between the notion of security and that of disarmament. Describe briefly the efforts made following the First World War to establish and effect disarmament.
(C. U. Pol. Sc. 1956)

12. What were the attempts made towards regional security and disarmament outside the League of Nations ?

13. Discuss the foreign policy of the Soviet Union between 1917 and 1939.

14. Trace the background of the rise of Nazi Germany and discuss its foreign policy.

15. Trace the rise of Fascism in Italy and discuss the Fascist foreign policy,

16. Give in brief, the history of the British Foreign relations between the Two World Wars.

17. Discuss the problem of French security after the First World War. To what extent did she succeed in solving the problem ?

18. Discuss the foreign policy of the U. S. A. between the two World wars.

19. Write a note on the Arab nationalism.

20. Discuss the nature of the Palestine problem. How was it solved and with what result ?

Or

Discuss briefly the main causes that ultimately led to the disintegration of Palestine. (C. U. Pol. Sc. 1959)

21. Trace the growth of the Japanese imperialism between 1919 and 1939.

22. Describe the policy of appeasement of Germany and Italy by England and France and its contribution to the causes of the Second World War.

23. Discuss the causes of the Second World War.

24. Discuss the problem of Germany after the Second World War.

25. What is *Cold War* ? What are its effects on the present world ?

26. Write notes on : (a) Truman Doctrine, (b) Marshall Plan.

27. Describe some of the regional Security Pacts.

Or

Discuss the organisation, aims and implications of the NATO, SEATO and CENTO.

28. Discuss the present foreign policy of the Soviet Union.

29. Discuss the main features of the Foreign Policy of India.

30. Write a note on the resurgence of Africa.

31. Give the organisation, aims and functions of the United Nations. To what extent has the U.N. been able to solve international problems ?

32. Compare and contrast the League of Nations with the United Nations ? How far does the latter mark an improvement upon the former.

33. Write an essay on the present prospect of World peace and disarmament.

---